লণ্ডন-প্যারিস

লণ্ডন-প্যারিস

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫/২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

এই লেখকের—

অন্য নগর

দূরের মিছিল

সুনন্দা

স্মরণচিহ্ন

অন্দর মহল

সুপ্রিয়ার বন্ধন

দময়ন্তী

অন্তরাল

বিপুল সুদূর

শ্রীমতী

এক জীবন অনেক জন্ম

পূর্বপত্র

কাঞ্চনময়ী

হলুদ শ্যামল

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ

বর্ণালী	সুবোধ ঘোষ	টাকা ৩·০০
জলকমল	ঐ	৩·০০
কনে-চন্দন	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	২·৫০
নাগরী	সরোজ কুমার রায়চৌধুরী	৪·০০
কালোঘোড়া	ঐ	৪·০০
পূর্বপাড়ার মেয়ে	ঐ	৩·৫০
রৌদ্র ছায়ায়	বিমল কর	২·০০
সায়াহ্নের সানাই	প্রভাত দেব সরকার	৩·০০
গ্রন্থি	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	২·০০
[illegible]াল লিপি	সমরেশ বসু	২·৫০
অঙ্গীকার	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২·৫০
গৃহদীপ্তি	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২·০০
বৌ	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২·৫০
পাশাপাশি	ঐ	৩·০০
মা (অনুবাদক অশোক গুহ)	ম্যাকসীম গোর্কী	৬·০০
সুনন্দা	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩·০০
অনেক বসন্ত একটি ভ্রমর	শক্তিপদ রাজগুরু	২·৫০
আকাশের রঙ	ঐ	৩·০০
তারুণ্যের কাল	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২·০০
হংস মিথুন	শৈলেশ দে	২·৫০
নোঙর	শৈলেশ দে	৪·০০
মহাযুদ্ধের অন্তরালে	চিরঞ্জীব সেন	৪·০০
আয়না	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	২·৫০

কয়েক বছর আগে 'মুখর লণ্ডন' ও 'ইভ্‌নিং ইন প্যারিস' নামে আমার দুটি বই সহৃদয় পাঠকসাধারণের প্রশংসা অর্জন করেছিল। 'মুখর লণ্ডনে'র উৎসর্গপত্রে শ্রীমনোজা বসুর নাম লিখেছিলাম এবং 'ইভ্‌নিং ইন প্যারিস' শ্রীমতী আরতি ও শ্রীসাগরময় ঘোষ-কে উৎসর্গ করেছিলাম। কিন্তু প্রকাশ-কালের অনতিবিলম্বেই বই দুটির নামকরণ আমাকে নিরন্তর পীড়া দিত।

সম্প্রতি তরুণ প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস তাঁর রবীন্দ্র লাইব্রেরীর পক্ষে 'মুখর লণ্ডন' ও 'ইভ্‌নিং ইন প্যারিস' একত্রে মুদ্রণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমিও এই একত্রীকরণের নাম 'লণ্ডন-প্যারিস' রেখে তৃপ্ত হলাম।

৩১।৯, গলফ ক্লাব রোড
টালিগঞ্জ
কলিকাতা-৩৩

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মুখর লণ্ডন

ঃ রচনাকাল ঃ

১৯৫১ সালের ৭ই নভেম্বর, বুধবার সকাল

থেকে

১৯৫৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর, বুধবার সকাল

কলিকাতা

মধ্য দিনের গান

কী কথা বলবে তুমি ?

প্রশ্ন করলেও মনে মনে মেয়েটি জানতো কী কথা জানতে চায় তার প্রিয়তম। সেই পুরোনো সমস্যা যা সে শুনেছে বার বার।

একই আপিসে ছেলেটি কেরানী আর মেয়েটি টাইপিস্ট। মন দেয়া-নেয়ার প্রথম পর্ব শেষ হয়ে গেছে। এখন ঘর বাঁধবার ক্ষণ। কিন্তু উপায় নেই। বসন্ত এসে গেলেও এখনও সাজি ভরে ফুল তুলে মালা গাঁথবার সময় আসে নি। আরও অর্থ চাই। সংসারে শান্তি আনন্দ বাঁচিয়ে রাখতে হলে বর্তমান উপার্জন যথেষ্ট নয়।

মুহূর্তের জন্যেও কঠিন বাস্তবের কথা ভোলে না ইংরেজ। প্রেমের উত্তাল তরঙ্গে দেহমন দুলে দুলে উঠলেও দিশা হারায় না। জীবনে উচ্ছ্বাস নেই, আছে নিস্তরঙ্গ গভীরতা। যখনই বোঝে ভালোবাসায় খাদ আছে, মনের গভীরে ফাঁক আছে, কোথাও কোনো ফাঁকি আছে, তখনই সম্পর্ক শেষ করে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

ছেলেটি মৃদুস্বরে বলে, আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে— যদিও মুখ ফুটে বললো, তবু ছেলেটি জানতো, একথা না বললেও ক্ষতি ছিলো না। যাকে বলা হলো সে তো সবই জানে। সে জানে, এবছর দুজনকেই হতাশ হতে হয়েছে। সদাগরী আপিস। লোকসানের তালিকা বেড়েছে বলে কারুরই মাইনে বাড়ে নি। কাজেই চোখ বুজে আরও এক বছর অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। স্বল্প আয়ে উচ্ছ্বাসের মোহে বিয়ে করে কিছুতেই দিনগুলি ম্লান করে তুলবে না ইংরেজ ছেলেমেয়ে। তাই কথা শুনে মেয়েটি দুঃখিত হবে না, অনুযোগ করবে না। উপায় যখন নেই তখন ধৈর্য ধরে হাসিমুখে অপেক্ষা করবে। আর ছেলেটিকে মেয়েটির মনে হবে

নিশ্চিন্ত নির্ভর। যে সব সময় বাস্তবের কথা ভাবে। যৌবনের উত্তাপে মন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলেও লঘু কথা বলে স্থুল বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তোলে না প্রিয়তমার কাছে।

দুপুর বারোটা বেজে গেছে। আপিসের ক্যানটিনে লাঞ্চ খেতে খেতে ওদের কথা হচ্ছিলো। বারোটা থেকে দুটো অবধি মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়। এরই ফাঁকে ফাঁকে যে যার সুবিধামতো সময় করে নেয়। বাড়ি গিয়ে খাবার সময় নেই। বাড়ি অনেক দূর। বাসে কিংবা টিউব ট্রেনে যাওয়া-আসার যা খরচ লাগবে তা দিয়ে আপিসের ক্যানটিনে সুন্দর খাবার পাওয়া যায়। কাছাকাছি বাড়ি হলেও তারা এ সময়ে গৃহে ফিরে আহারের আয়োজন করে সময় নষ্ট করতো না। যদি র‍্যাশনে কুলোতো তাহলে সঙ্গে নিয়ে আসতো মধ্য দিনের আহার। তারপর কাজ করতে করতে সুযোগ বুঝে এক সময় খাওয়া সেরে নিতো।

মেয়েটি বললো, চলো এবার ছুটিতে আমরা অনেক দূরে কোথাও ঘুরে আসি?

কোথায় যাবে? স্কটল্যাণ্ড?

আমার তো খুব ইচ্ছে, তবে পয়সায় কুলোতে পারবো কিনা জানি না—

আমি বোধ হয় পারবো কারণ নতুন বছর থেকে পোস্ট আপিসে সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু কিছু করে জমিয়ে যাচ্ছি।

তুমি বুদ্ধিমান লোক, মেয়েটি হেসে বললো, আমার দ্বারা বোধ হয় কোনদিনও কিছু জমানো হবে না। যাক, তোমার জমাবার কথা জানা রইলো, দরকার হলে ধার নেয়া যাবে।

কাঁটা-চামচ নামিয়ে রেখে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি হেসে বললো, আমার সবকিছুই তো তোমার।

কাস্টার্ডের বাটি সামনে নিয়ে খুব আস্তে আস্তে মেয়েটি বললো, জানি। আর তাই তো মাঝে মাঝে লজ্জায় মরে যাই—

ছেলেটি অবাক হয়ে বাধা দিলো, কেন ?

ভাবতে বড়ো ভালো লাগে যে, তোমার সবকিছু আমার, একটু থেমে মেয়েটি আবার বললো, আমারও সব কিছু যে তোমার। কিন্তু কী আছে আমার ? তুমি তো রাজা। তাই মাঝে মাঝে নিজের কাছে নিজেকে বড়ো ছোটো মনে হয়। আমি তোমার সব নিলাম কিন্তু তোমাকে দিলাম কী ? মেয়েটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

ছেলেটি হেসে বললো, আজ তোমাকে বেশ ভাবপ্রবণ মনে হচ্ছে। হঠাৎ কী হলো তোমার ?

'এপ্রিলের প্রথম দিক। বসন্তের আরম্ভ। ন্যাড়া গাছগুলি পাতায় ফুলে ভরে উঠেছে। মাঝে মাঝে পাখির ডাক ভেসে আসে। হাওয়ায় ঠাণ্ডার স্পর্শ থাকলেও অনেকক্ষণ আলো থাকে। তবু এখনও মাঠে কিংবা পার্কে বসবার সময় হয় নি। ঘাস ভিজে থাকে(আর থেকে থেকে হাওয়ার শাণিত তীর গোপন কথার খেই হারিয়ে দেয় ?

ছেলেটির মুখের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে মেয়েটি ঠিক তেমনি সুরে বললো, কতো কথা তোমাকে বলতে ইচ্ছা করে কিন্তু সময় কবে হবে ! সময় কোথায় !

ওদিকের একটা টেবিল একেবারে খালি। সেখানে বসে আস্তে আস্তে খাচ্ছে শুধু এক বুড়ি। টেবিলটি ছোটো, সেখানে মাত্র আর একজনের জায়গা হয়। বুড়ি খাচ্ছে আর পায়ের শব্দ শুনে বার বার মাথা তুলে তাকাচ্ছে—যদি সে আসে। রোজ এমন সময় আর একজন তার সামনে বসে লাঞ্চ খায়। আজ সে বুড়ো আসে নি !

বুড়োর ঠাণ্ডা লাগলো নাকি ? যা অসাবধান লোক। বুড়ির চোখে-মুখে কেমন হতাশা ফুটে উঠলো। হয়তো আর কতোদিন তারা একসঙ্গে বসে খেতে পারবে না ঠিক নেই। খেতে আর

ইচ্ছে করে না বুড়ির। ছলোছলো চোখে শুধু এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে যেন কার পায়ের শব্দ শোনবার চেষ্টা করে। কিন্তু বুড়ো আর আসে না সেদিন। আবার কবে আসবে? আবার কবে সময় হবে? সময়! বুড়ি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

সেই আপিসের একজন বুড়ো গোছের কর্মচারী এক ভারতীয় বন্ধু নিয়ে খেতে বসেছে। খাওয়া বড়ো নয় ইংরেজের কাছে। খেতে খেতে কথা বলা বেশি আনন্দের। ইংরেজ কর্মচারী অনেক কষ্টে আজ লাঞ্চের সময় ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ করতে পেরেছে। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে তাদের আলাপ হয়েছে। তাই আজ অনেক পুরোনো কথা হচ্ছে দুজনের—যেন ফুরোবে না। আবার কবে দেখা করবার দিন স্থির করতে পারবে তারা জানে না। শিগগির আর সময় হবে না।

সত্যি সময় নেই। শুধু যাদের কথা বলা হলো তাদের নয়, ইংল্যাণ্ডের আপামর জনসাধারণের আলাপে-প্রলাপে কূজনে-বিজনে বেশিক্ষণ কাটাবার সময় নেই। এর জন্যে তারা দুঃখিত নয়, এর জন্যে তারা অনুযোগ করে না। দূর থেকে ইংরেজকে দেখলে তাই অবাক হয়ে যেতে হয়। মনে হয় তারা যেন প্রাণহীন পুতুলের দল। তাদের উচ্ছ্বাস নেই, সমবেদনা নেই, সহানুভূতি নেই। শুধু কাজ আর কাজ। এদের দিকে তাকিয়ে অনেকবার ভেবেছি কেমন করে এদেশ অসংখ্য দরদী কবি-সাহিত্যিক সৃষ্টি করলো। নীরস কঠিন শুষ্ক ইংরেজ শুধু বুঝি নিজের স্বার্থ বোঝে। তাই সর্বপ্রথম এরা ভালো ভাবে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করে।

অনেকদিন আগে ইংরেজের চালচলন কেমন ছিলো সেকথা বর্তমানে বলবার প্রয়োজন নেই। তবে আজকের ইংরেজ অতিমাত্রায় হিসেবী, অতিমাত্রায় আত্ম-সচেতন। যৌবনের যে দুরন্ত আবেগ মানুষকে বেহিসেবী করে তোলে, সে-আবেগের অর্থ ইংরেজের পক্ষে বোঝা কঠিন। আর যদি কেউ বোঝে তাহলে তা প্রকাশ করবে

না কোনোদিন। কেন না, তার মতে তাতে শুধু তার নিজেরই ক্ষতি হবে।

ফ্রান্সে দেখেছি, দুরন্ত যৌবনের প্রাণময় প্রকাশ। "তোহারি কারণ সব সুখ ছাড়িনু"—একথা একজন ফরাসীর মুখে খুব সহজেই উচ্চারিত হতে পারে। কিন্তু যদি কোনো ইংরেজের মুখে একথা শোনা যায় তাহলে তাকে ব্যতিক্রম বলে ধরে নিতে হবে। কেননা, যার যতোটুকু পাওনা তার বেশি সে দেবে না, নিজের যা প্রাপ্য তার বেশি চেয়ে কাঙালপনার পরিচয় কিছুতেই দেবে না। তাই "কাঙাল আমারে কাঙাল করেছো আর কী তোমার চাই—" এমন ভাবনা ইংরেজ কবির মাথায় কখনো আসবে না।

বস্তুত সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ইংরেজের নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। ভোরবেলা ঘুম ভাঙলেই ব্রেকফাস্টের ভাবনা ভাবতে হবে; স্ত্রী মুখের সামনে চা এনে ধরবে না, তাকে সমানে সাহায্য করতে হবে প্রাতরাশ রান্না করবার সময়। শীতের দেশ। ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে সাড়ে সাতটা—আটটা বেজে যায়। সাড়ে নটা থেকে আপিস। কাজেই ঘুম থেকে উঠে কোনদিকে চোখ তুলে তাকাবার সময় নেই। কোনোরকমে অতি দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিতে হয়। যার সুবিধা হলো লাঞ্চের জন্যে সঙ্গে করে গোটা কয়েক স্যাণ্ডউইচ নিয়ে গেলো। যার ওই সামান্য আহারে হবে না, সে শূন্য হাতে বেরুলো। যথাসময়ে বাইরে খাওয়া সেরে নেবে।

আপিস ভাঙতে ভাঙতে সাধারণত সেই বিকেল সাড়ে পাঁচটা। শীতকাল হলে বিকেল আর নেই তখন। ঘন অন্ধকার নেমে গেছে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে উজ্জ্বল আলোর সমারোহ। তবু আলোর দিকে তাকিয়ে যারা সংসারী তাদের কবিত্ব করবার সময় নেই। শুধু বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলে যন্ত্রচালিতের মতো বলে, কী সুন্দর দিন! তারপর আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

বাড়ি তাকে ফিরে যেতেই হবে। আপিসের কাজ শেষ হলো,

এখন বাড়ির কাজ শুরু হবে। স্ত্রীকে রান্নায় সাহায্য করতে হবে, থালাবাসন ধুতে হবে। তারপর হয়তো কোনো ক্লাস করতে ইস্কুলে যেতে হবে।

কথাটি শুনতে অবাক লাগে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত লোক সান্ধ্য ক্লাস করে থাকে। অল্প আয় বলে তারা অনুযোগ-অভিযোগ করে না কি বা চুপচাপ বসে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে হা-হুতাশ করে না। সেই স্বল্প আয়ে সুন্দর করে সংসার সাজিয়ে তোলবার প্রাণপণ চেষ্টা করে।

সন্ধ্যেবেলা ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র প্রায় সব রকম সান্ধ্য ক্লাস বসে। ফরাসী জার্মান—নানা ভাষা শেখানো থেকে আরম্ভ করে ছুতোরের কাজ, খেলনা তৈরি করা, সেলাই, রান্না, বাগান করা সমস্ত কিছুই শেখানো হয়। এইসব ক্লাসে ভিড় হয় প্রচুর।

ইংরেজ স্বামী-স্ত্রী রাত্তিরে খাওয়ার পালা শেষ করে এইরকম একটা ক্লাসে গিয়ে পাঠ নেয়। যার ছেলেমেয়ের খেলনার দরকার অথচ কেনবার সামর্থ্য নেই, সে খেলনা তৈরি করা শেখে। যে মেয়ে রেস্তোরাঁয় চাকরি করতে চায় সে রান্না শেখানোর ক্লাসে ভর্তি হয়। যাঁরা কবি-প্রকৃতির অথচ নানা সরঞ্জাম কিনে ঘর সাজাতে পারে না তারা বাগান করা শিখে বাড়ির ছোটো উঠোন ফলে-ফুলে ভরে তোলে।

এইরকম অনেক কাজে ইংরেজ সব সময় ব্যস্ত। নিজের স্বাচ্ছন্দ্য আর নিজের সংসারের সকলের সুখ-সুবিধার ভাবনা ছাড়া তার যেন আর কোনো ভাবনা নেই। আতিথেয়তার বালাই ইংল্যাণ্ডে একরকম নেই বললেই চলে।

একথা উঠলেই আমাদের দেশের সঙ্গে সে-দেশের তুলনা করতে ইচ্ছে করে। আমাদের আতিথেয়তার কথা পৃথিবী-বিখ্যাত। গত যুদ্ধের সময় যখন বহু বিদেশী ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করতো তখন আমরা তাদের বাড়িতে ডেকে ষোড়শোপচারে

যে আদর-আপ্যায়ন করতাম সেকথা তারা জীবনে ভুলবে না। শুধু বিদেশীদের কথা কেন, কাউকে নেমন্তন্ন করলে আমরা একদিনে যে-পরিমাণ খরচ করি সে-পরিমাণ খরচ করে অতিথি সৎকারের কথা একজন ইংরেজের পক্ষে কল্পনা করাও অসাধ্য।

যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ সম্পর্কে উৎসাহী যে ইংরেজদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিলো এবং যারা আমার বাড়িতে দিনের পর দিন প্রচুর চা-মিষ্টি আর মাছের অজস্র রকম তরকারি খেয়ে গেছে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে বিলেতে আমার আবার দেখা হয়েছিলো। বলা বাহুল্য, আমার পক্ষে আশা করা স্বাভাবিক যে, তারাও আমাকে ঠিক তেমনি করে অন্তত একদিনের জন্য তাদের বিশেষ বিশেষ রান্না খাওয়াবে।

স্বীকার করে নেয়া দরকার যে, আমাকে এবং আমার মতো আরও অনেককে একেবারে হতাশ হতে হয়েছিলো। কিন্তু সেকথা সবিস্তারে বলা বর্তমান আলোচনার সঙ্কীর্ণ পরিসরে অবান্তর। শুধু এইটুকু বলি যে, ইংরেজ সাধ্যের বাইরে কিছু করে না এবং তাদের ধর্ম হলো আগে নিজে আর পরিবারের প্রত্যেকের জন্যে তুলে রেখে তারপর লৌকিকতা করা।

আমাকে সেইসব বিদেশী বন্ধুবান্ধব প্রত্যেকেই নেমন্তন্ন করেছিলো নিশ্চয়ই। কিন্তু তারা প্রত্যেকে যা খায় তাই থেকে শুধু সামান্য ভাগ দিয়েছিলো মাত্র। মাসের শেষে আমার মতো টাকা ধার করে সারাদিন বাড়ির লোকদের বিব্রত করে রান্নার আয়োজন করে নি। কিংবা একজন বিদেশী পাছে আতিথেয়তার কোনো ত্রুটির কথা স্মরণে রাখে এই মনে করে নিজের সমস্ত কাজ বাদ দিয়ে অতিথিকে নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থেকে নিজেকে অকারণে ক্লান্ত করে তোলে নি। আমি যা মনে করি না কেন, আমার কোনো ইংরেজ বন্ধু বাড়ির কাউকে আমার জন্যে বঞ্চিত করে নি। সাত সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশী বন্ধু এসেছে বলে আমার দিকে

দৃষ্টি দেবার জন্যে পরিবারের কারুর বিশ্রামের সামান্য ব্যাঘাত করে নি।

কিন্তু এ নিয়ে কোনো কথা বলে লাভ নেই আর এর জন্যে শুধু শুধু অভিমান করে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেও ফল নেই। আমাদের আতিথেয়তার কথা তারা চিরদিন মনে রাখবে আর তাদের কার্পণ্য ও শুষ্ক লৌকিকতার কথা আমরাও ভুলবো না। তারা আমাদের মতো অতিথি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে প্রচুর ব্যয় করবে না, আমরা তাদের মতো শুকনো লৌকিকতা করে কোনোদিনও অতি-থিকে বিদায় করতে পারবো না। বিলেত থেকে তাদের ঘরের খবর জেনে এলেও আবার যদি আমার বাড়িতে কোনো ইংরেজ অতিথি আসে আমি ঠিক আগের মতোই তাদের যত্ন করবো, তাদের জন্যে ব্যয় করে আবার হয়তো ঠিক তেমনি আনন্দ পাবো। আর মনে মনে বলবো, 'যস্মিন দেশে যদাচার'।

শুধু এই কারণে ভারতবর্ষ থেকে প্রথম ইংল্যাণ্ডে গিয়ে আমাদের খুব বেশি অসুবিধা হয়। যা আশা করি, তা কিছুতেই পাই না। কর্তব্য-কঠোর জাতের মধ্যে এসে আমাদের কোমল প্রাণে বার বার রূঢ় আঘাত লাগে।

সকাল থেকে রাত্তির অবধি একজন মানুষ শুধু কাজের কথা ভাবে, শুধু কাজের কথা বলে, আর কোনোদিকে না তাকিয়ে নিঃশব্দে আপন মনে শুধু কাজ করে যায়। এরা কখন প্রেমে পড়ে, এরা কেমন করে ভালোবাসে, এরা কখন মুহূর্তের জন্যে কাজের কথা ভুলে আপনাকে বিলিয়ে দেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে, সেকথা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছিলো।

অথচ গ্রীষ্মের হালকা রোদ্দুরে পার্কে পার্কে হাজার ছেলেমেয়েকে শুয়ে বসে আধশোয়া অবস্থায় অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতে দেখেছি। তখন তাদের দেখে ভাবতাম, এদের কখন আলাপ হলো, এরা কেমন করে ঘনিষ্ঠ হলো, এরা কি এখন আবোলতাবোল বকে এ

ওর কাছে হৃদয় মেলে ধরছে। কিন্তু এই পার্কে শুয়ে থাকা কতোক্ষণেরই বা ব্যাপার। কয়েক ঘণ্টা মাত্র। হয়তো আবার দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারবে কি না, সেকথাও জানা নেই। আর এমনি আলাপ যে তারা প্রাণ থেকে করে, তা-ও মনে হতো না। প্রিয়জনের জন্য কালেভদ্রে কয়েক ঘণ্টা ব্যয় করা যেন তাদের কর্তব্য। প্রাণের তাগিদে নয়, কর্ত্তব্যের তাগিদে ইংরেজদের প্রতি পদক্ষেপ।

কর্তব্য-কঠোর ইংরেজের অধীনে কোথায় প্রাণের উৎস, কোথায় রসের ফোয়ারা, মনের কোন নিভৃত গহনে ফুটে আছে ফুল—তার সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য। তাই আমাদের বারে বারে তাদের বুঝতে ভুল হয়। মনে হয় এদের শুষ্ক কঠিন জীবনে কোনো কোমলতা নেই, নিজেকে বিলিয়ে দেবার উন্মাদনায় এরা কখনও ব্যাকুল হয়ে ওঠে না। বন্ধুরা যেমন বুঝিয়েছিলো তেমন বুঝেছিলাম, প্রথম ইংল্যাণ্ডে গিয়ে চারপাশে তাকিয়ে মেনে নিতে দ্বিধা করি নি যে, এ জাত ব্যবসা ছাড়া কিছু বোঝে না, এরা কোনোদিন যৌবনের উন্মাদনায় দিশা হারায় না।

একথা মেনে নিতে বাধ্য হলেও মনের কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধেছিলো, আর এদের যান্ত্রিক জীবনযাত্রার কথা ভাবলেই অনন্তর সেটা খচখচ করে উঠতো। ভাবতাম, এ হতেই পারে না। যে দেশের কাব্যে-গদ্যে এতো প্রেম, যে দেশের গানে-ছবিতে এতো বিরহ, যে দেশের জলে-স্থলে প্রেমালাপের এতো জীবন্ত প্রকাশ—সে কি সত্যি শুধু অভিনয়?। সে সব কি শুধুই কঠিন কর্তব্যের তাগিদে! চেহারা দেখে তেমন মনে হতো না, কথা শুনে সে কথা ভাবতে পারতুম না। অথচ দুর্ভাগ্য আমার, বহুদিন কিছুতেই তাদের লৌকিকতা আর কর্তব্যের অন্তরালে রসের বেদনার সহানুভূতির যে নিঃশব্দ প্রবাহ চলেছে, তার সন্ধান পেলাম না। তারপর অনেকদিন ইংরেজের দেশে ইংরেজের ঘরে বাস করবার পর যখন তাদের অন্তরের আসল পরিচয় পেতে শুরু করলাম, তখন নিজের

এতোদিনের এই ধারণার জন্যে মনে মনে লজ্জা পেয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে, শুধু প্রকাশ করবার ভঙ্গি ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো জাতের সঙ্গে ইংরেজের মূলত আর কোনো প্রভেদ নেই।

আমরা প্রায়ই কাজে ফাঁকি দিই। আমাদের কল্পনা-বিলাস বহুবার আমাদের আসল অবস্থা ভুলিয়ে অকারণ অলীক স্বপ্ন দেখায়। কথা বলি বেশি, কাজ করি কম। যৌবনের আশ্চর্য আলোড়নে সকল কিছু বিস্মৃত হয়ে প্রিয়জনকে যতোটুকু বলবার, তার চেয়ে অনেক বেশি বলি, সামর্থ্য যতোখানি তার চেয়ে অনেক বেশি কাজের ভার নিয়ে নিজেকে বিব্রত করে তুলে বার বার দিশা হারাই। তাই দিনে দিনে একদিন উচ্ছ্বাসের ঝড় থেমে যায়, কল্পনা শূন্যে মিলায়, কথা জুড়িয়ে যায়, কথা ফুরিয়ে যায়। শুষ্ক সংসারে বাস্তবের নির্মম আক্রমণে তখন শুধু যন্ত্রের মতো ঘুরে ফিরি। সবকিছুর উপর যেন যবনিকা নেমে এসেছে, ফুরিয়ে গেছে অনর্গল অবান্তর কথা বলার দিন; কোথাও রঙ নেই, রস নেই, যে প্রিয়তমার জন্যে একদিন সবকিছু ছাড়তে প্রস্তুত ছিলাম, তাকে যেন বোঝা বলে মনে হয়। বার বার সময়ে-অসময়ে নিজেকে খোঁজবার চেষ্টা করি। কোথায় গেলো সেই আমি—যার কাছে একদিন এই বসুন্ধরা অতি ক্ষুদ্র মনে হয়েছিলো?

নিজেকে খুঁজে পাই না। নিজেকে যেন চিনি না। তাই শুধু ঝরে অনেক দীর্ঘশ্বাস। কল্পনায় পাই, বাস্তবে হারাই—যা পেলাম তার চেয়ে অনেক বেশি হারালাম। আমি তো ভাবি নি আগে কতোখানি পাবো? কতোটুকু আমার পাওনা? কল্পনায় পেয়েছিলাম অনেক বড়ো অংশ, কিন্তু বাস্তবে যে ঠকে গেলাম। তার জন্যে কার কাছে অনুযোগ করবো? কেউ তো পরিমাণের কোনো শপথ করে নি। সে যে আমারই বিলাসী মনের অলসমন্থর মুহূর্তের ব্যাপক কল্পনা। তাই ঠকে যাই, তাই অকারণে কেঁদে মরি। যা নেই, নির্বোধের মতো পলে পলে তাই খুঁজে খুঁজে

অবশেষে ক্লান্তি আর হতাশা সম্বল করে আত্মার আত্মীয়কে আঘাতের পর আঘাত করি।

ইংরেজের সঙ্গে শুধু সেইখানে আমার প্রভেদ। ইংরেজ আশা করে কম। যেটুকু পায় সেটুকু অতিরিক্ত পাওয়া বলে সযত্নে তুলে রাখে। জীবনকে নেয় সহজভাবে। মনগড়া কল্পনায় প্রাসাদ রচনা করে চোখের সামনে বাস্তবে পর্ণকুটির দেখে হতাশায় ভেঙে পড়ে না। যা স্বাভাবিক তাই তাদের প্রিয়। উচ্ছ্বাসের উত্তাল ছন্দে অস্বাভাবিক মুহূর্ত দিনের পর দিন তাদের মাতাল করে তোলে না।

ইংরেজের নিজের মনে যদি ঝড় বয়ে যায় তাহলে বাইরে হবে তার সংযত প্রকাশ। যৌবনের আলোড়নে কথা বলবার মাত্রা হারিয়ে যাবে না কিংবা কাজে ভাঁটা পড়বে না। নিজেকে কোনো কারণে সহজে বিস্মৃত হয় না ইংরেজ। আগে তার কাজ, পরে তার ব্যক্তিগত জীবন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে আনন্দ খোঁজে, অকরুণ ব্যস্ততার মধ্যে সুযোগ বুঝে হঠাৎ কখন ধরে রাখবার চেষ্টা করে অনেক রঙীন মুহূর্ত, বলে যায় দরদী মনের অনেক ব্যথা-ভরা কথা, কখনও চোখে-মুখে ফুটে ওঠে প্রাণের অন্ধ আবেগ!

সময় নেই। নিজেকে বেঁচে থাকতে হবে। যতো ভালোভাবে মানুষ এই দুঃসময়ে বেঁচে থাকতে পারে তার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। সংসারের সুখ-শান্তি অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। আছে বা আর কতোটুকু? কিন্তু যা আছে তাকে সুদে-আসলে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে তুলতে হবে। অনুযোগ নয়, অভিনয় নয়, কঠিন কাজ আর কর্তব্যের মাঝে নিজেকে উৎসর্গ করে অভাব এড়াতে হবে—যেন কোনোদিন পরের কাছে হাত পাততে না হয়।

প্রেমের ব্যাপারে তাই। বন্ধুত্বের বেলাও তাই। চেয়ে পায় ভিখিরী, কেড়ে পায় নিষ্ঠুর, ছেড়ে পায় অতি-মানুষ। ইংরেজ চায় না, কাড়ে না, ছাড়ে না, যা আপনি আসে তা ভক্তি দিয়ে রাখবার চেষ্টা করে, যা স্বতঃস্ফূর্ত তা অবশ্যম্ভাবী বলে গ্রহণ করে। যা থাকবে না

তা ধরে রাখবার চেষ্টা করে নিজেকে ছোটো করে না। যা রইলো না তার শোকে বিহ্বল হয়ে নিজের দৈন্য প্রকাশ করে না। শোকে দুঃখে ঝড়ে অন্ধকারে ইংরেজ ধীর স্থির নম্র বিনয়ী। তারা এতো সাধারণ যে যন্ত্র বলে মনে হয়। প্রতি মুহূর্তে এক রকম। জোরে হাসে না, চেঁচিয়ে কথা বলে না, বুক চাপড়ে কাঁদে না। সহজভাবে যে জীবনকে গ্রহণ করতে পারে নিঃসন্দেহে তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। ইংরেজকে যতোই গালমন্দ করি না কেন, একথা অকপটে স্বীকার করতে হবে যে ইংরেজ বুদ্ধিমান।

একটা কথা মনে পড়ে গেলো। একবার ঘটনাচক্রে একটি সুন্দরী অতি বুদ্ধিমতী ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। সেইদিন বিদায় নেবার আগে সে জিজ্ঞেস করেছিলো, তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে?

গভীর সুরে উত্তর দিয়েছিলাম, যেদিন তুমি দেখা পেতে চাইবে।

চোখ বড়ো করে নিঃশব্দে মেয়েটি অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়েছিলো। তারপর করুণ সুরে বলেছিলো, সে কি, তোমার কাজকর্ম কিছু নেই?

আমি বলেছিলাম, আছে। কিন্তু তোমার আহ্বানে আমি সবকিছু তুচ্ছ করে সাড়া দেবো।

বুঝেছিলাম মেয়েটি অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়েছিলো এবং আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আর উৎসাহ প্রকাশ করে নি। তখন অবশ্য কারণ বুঝতে না পেরে অবাক হয়েছিলাম। যথাসময়ে বুঝেছিলাম কেন মেয়েটি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করে নি। আমি সবকিছু তুচ্ছ করে তার আহ্বানে সাড়া দিতে পারি— একথা শুনে সে হতাশ হয়েছিলো। ভেবেছিলো আমার বুদ্ধি অপরিণত। কারণ ইংল্যাণ্ডের কোনো মানুষ এমন অসংযত কথা বলে না। তারা ডাইরি খুলে ভাবে। তারপর অনেক ভেবেচিন্তে একটা দিন ঠিক করবার চেষ্টা করে।

সময় কম। সময় নেই। সময় চলে যায়। তবু হাজার কাজের মাঝে থাকলেও মানুষের মন ক্ষণকালের জন্যেও বিশ্রাম খোঁজে ! কী যেন চায়। মুক্তির মন্ত্র শোনে। কাজ করতে করতে ক্ষণকালের জন্যে হিসেবী মন পাখা মেলে, কাজের মধ্যে ফুল ফুটে ওঠে, ক্লান্তির বদলে ইংরেজের মনে বেজে ওঠে গান—মধ্য দিনের গান।

দুপুর বারোটা থেকে দুটো। ব্যস্ততার মাঝে হঠাৎ যেন ভাঁটা পড়ে। পদক্ষেপের গতি হ্রাস পায়। আপিসগুলির দিকে তাকালে মনে হয় যেন ছুটি হয়ে গেলো। এর মধ্যেই মধ্যবিত্ত রেস্তোরাঁর সামনে লম্বা 'কিউ' হয়ে গেছে, আপিসের ক্যানটিনে আর জায়গা নেই, কাফেগুলিতে কোলাহল জেগেছে আর বড়ো বড়ো হোটেলের সামনে একটির পর একটি গাড়ি দাঁড়াচ্ছে—কেউ এনেছে প্রিয়জনকে, কেউ এনেছে বন্ধুকে, আর কেউ বা হয়তো এনেছে আর এক ব্যবসায়ীকে—খেতে খেতে তার কাছ থেকে সৎপরামর্শ নিয়ে নেবে।

'কিউ'-এ কেউই একা দাঁড়িয়ে নেই। সঙ্গে রয়েছে বান্ধবী কিংবা দূর থেকে এসে-পড়া কোনো আত্মীয় আর নয়তো আপিসের যে কোনো কেউ। দিনের মধ্যে হাজার কাজের মাঝে হয় বারোটা থেকে একটা নয় একটা থেকে দুটো—এই এক ঘণ্টার জন্যে ইংরেজ যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়। বেশি কথা বলে, খাওয়া যেন আর ফুরোয় না। শুধু তো এক ঘণ্টার ব্যাপার কিন্তু ইংরেজের তখনকার চেহারা দেখলে মনে হয় তার যেন সারা জীবন অবসর। খুব আস্তে স্যুপে চুমুক দেয়, আরও আস্তে কাঁটা-চামচ মুখের সামনে তোলে। ধীরে সুস্থে এড়িয়ে-গড়িয়ে খাওয়া শেষ করে। কোনো তাড়া নেই, কোনো কাজ নেই, শরীরে কোথাও ব্যস্ততার ইঙ্গিত নেই। কে বলবে মাত্র এক ঘণ্টার ছুটি—কে বলবে আর একটু পরেই ফুরিয়ে

যাবে এই অবসরক্ষণ! কাজের চাপে আবার দম বন্ধ হবার উপক্রম হবে।

অবসরের হালকা রোদ্দুর লেগেছে, হোক ক্ষণিকের আলো—তারই টুকরো ঝরে পড়ুক ব্যস্ত মনের আনাচে-কানাচে, নিয়ে যাক অন্য জগতে, জ্বালিয়ে তুলুক প্রাণের প্রদীপ আর মধ্য দিনে চারপাশে বেজে উঠুক ঘর বাঁধবার অনেক নতুন গান।

লণ্ডনে ভারতীয় লেখক

আপনি যদি ভারতীয় হন আর সামান্য একটু ভালো ইংরেজী লেখেন তাহলে আপনি যেই হন না কেন, কোনো রকমে একবার লণ্ডনে গিয়ে পড়তে পারলে অনায়াসে রাতারাতি ইংরেজ পাঠক-সাধারণের কাছে 'Famous Indian Writer' বলে পরিচিত হতে পারেন। প্রকাশকের অভাব আপনার হবে না, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এখন ইংরেজের কৌতূহল বেড়েছে, নিজের দেশ নিয়ে আপনি যা লিখবেন তাই 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য' হয়ে উঠবে।

আমার অনেক বন্ধুবান্ধব পরিচিত-অপরিচিত এই খ্যাতি লাভ করে লণ্ডনে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। তিনশো-চারশো পাউণ্ড করে একটি মাত্র বই-এর জন্যে বিদেশী প্রকাশকের কাছ থেকে পারিশ্রমিক পেয়ে দিব্যি আরামে আছেন—সভা-সমিতিতে নিয়মিত নেমন্তন্ন পেয়ে দেশের কথা যা খুশি তাই বলছেন। দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ পাঠক-সাধারণের কাছে এঁদের গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের চরম নিদর্শন। এঁরা বহুদিন বিলাত-বাস করেছেন, ইংরেজী শিখেছেন, ঝালিয়েছেন। কেউ কেউ ইংরেজী সাহিত্যে ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়ে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারি করছেন, আর কেউ কেউ কেরানী কিংবা লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের স্কুলের সাধারণ মাস্টার।

ফএল্‌স থেকে আরম্ভ করে ওয়েস্ট এণ্ডের অলিতে-গলিতে যে কোনো ছোটো-খাটো বই-এর দোকানে নানা দেশের সাজানো অসংখ্য বই দেখতে দেখতে হঠাৎ একটি বিশেষ বই-এর উপর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে। লেখকের নাম ধরুন—অমর ঘোষ, কিংবা এস. এম. মারাথ্ অথবা নোয়েল সরকার। এঁরা আমাদের দেশের লোক। অনেক নোবেল প্রাইজ পাওয়া দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ লেখকদের

নানা বই-এর পাশে হঠাৎ এঁদের বই দেখে আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক। মনের ভাব বুঝে দোকানদার তখুনি কাছে এগিয়ে আসে —

'অদ্ভুত বই হয়েছে স্যার, দেবো নাকি ?'

'তুমি পড়েছো বুঝি ?'

'হ্যাঁ স্যার, এই লেখকের আরও একটা বই বেরুবে শিগগির— ভারতবর্ষের এতো রকম সুন্দর কথা বলেছেন তিনি—যা আমরা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতাম না।'

'তাই নাকি ?' নেড়েচেড়ে বারো কি পনেরো শিলিং খরচ করে শেষ অবধি বইখানা কিনেই ফেলি।

একটি নয়, দুটি নয়, এমন অনেক বই আমি কিনেছি, ধৈর্য ধরে পড়েছি আর দিনের পর দিন অসহ্য জ্বালায় জ্বলেছি। দু-এক পাতা পড়লেই বোঝা যায় এঁরা কেউই লেখক নন—দেশের কোন ভদ্র কাগজে এদের লেখা কোনোদিনও প্রকাশিত হতো না, একথা জোর দিয়েই বলা যায়। দুর্বল কষ্টকল্পিত অত্যন্ত কাঁচা লেখা। ভারতীয় সাহিত্যিকদের অগ্রণী সেজে লেখক যা বলতে চেয়েছেন তা একান্ত হাস্যকর—বন্দেমাতরম্—গান্ধীজী কি জয় বলে কেউ কেউ অক্ষম কলমে জাতীয় রাজনৈতিক চেতনার রূপ দেখাবার চেষ্টা করেছেন—গ্রামের ছবি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কেউ কেউ কিছুই বলতে পারেন নি কিংবা বাংলাদেশ অথবা ভারতবর্ষের অন্য কোনো জায়গার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মূর্ত করতে গিয়ে পাতার পর পাতা সরস সাবলীল ইংরেজীতে প্রলাপ বকেছেন। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই অজ্ঞ বিদেশী পাঠকের কাছে প্রচুর বাহবা পেয়েছেন। আর আপনি যদি সত্যি ক্ষমতাশালী লেখক হন এবং দেশে আপনার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বলে খ্যাতি থাকে, তা হলেও এদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে গেলে কেউ শুনবে না, কারণ, আপনি ইংল্যাণ্ডের হাল-চাল তেমন জানেন না, আর সেই লেখকদের চোদ্দ-পনেরো কি তার চেয়েও বেশি বছরের ঝালানো ভাষার মতো ইংরেজীও লিখতে

পারেন না! তাই মুখ বুজে ভারতীয়, বিশেষ করে বাংলা আধুনিক সাহিত্যের সম্বন্ধে বুদ্ধিমান ইংরেজ পাঠক কি ধারণা পোষণ করছে —এই ভেবে দারুণ অস্বস্তিতে আপনার দিন কাটবে।

ভাবলাম, আর ক বছরই বা এদেশে আছি। সেই অল্পসময়ের মধ্যে যদি এদেশের লোককে আমাদের দেশের বর্তমান সাহিত্য কোন পর্যায়ে পৌঁচেছে সে বিষয়ে সামান্য সচেতন করে দিতে পারি, তাহলে আর কিছু না পাই, আমার শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকবৃন্দের আশীর্বাদ তো পাবোই। আর তাই তো আমার সবচেয়ে বড়ো সম্বল। আমি ক্লাবে ক্লাবে ঘুরতে লাগলাম। খুব অল্পদিনের মধ্যেই সাহিত্যে উৎসাহী বন্ধু-বান্ধবীর সংখ্যা বাড়িয়ে ফেললাম। এমন কি, একদিন বিনা দ্বিধায় লণ্ডনের অধুনালুপ্ত উন্নতনাসা মাসিক-পত্র "Horizon"এর সম্পাদক সিরিল কনোলির সঙ্গে আলাপ অবধি করে এলাম।

সুখের বিষয়, সেই সব তথাকথিত লেখকদের লেখা কাগজপত্রের সম্পাদকরা পছন্দ করেন না—তাই তাঁদের রচনা একেবারে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য, এই সব কাগজপত্রের অনুকূল সমালোচনা তাঁরা পেয়ে থাকেন। এঁরা ভারতীয় লেখক বলে নাকি সম্পাদকদের এই পক্ষপাত, আর দুই দেশের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের কথাও সমালোচনা প্রকাশ করবার আগে তাঁরা একবার ভেবে দেখেন।

যা হোক, অনেক ঘোরাঘুরি করে সন্ধান নিয়ে জানলাম, নিজের প্রদেশে মাতৃভাষায় লিখে প্রসিদ্ধ এমন কোনো আধুনিক ভারতীয় লেখকের নাম লণ্ডনের পাঠক-সমাজ জানে না—খবরও রাখে না। ব্রিটিশ পাঠকের মত—রবীন্দ্রনাথের পরই শ্রেষ্ঠ ভারতীয় লেখক হলেন ডাঃ মুল্‌করাজ আনন্দ, আর তার পর সেই সব অখ্যাত, অজ্ঞাত তথাকথিত লেখকের দল।

বলা বাহুল্য, ব্যাপার দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

কোথায় গেলো সেই সব ইংরেজ-নন্দনরা—যুদ্ধের সময়ে যারা অনেক প্রগতিশীল বাংলা কবি-সাহিত্যিকদের অঙ্গনে আনাগোনা করে প্রচুর চা আর ইণ্ডিয়ান স্যুইটের সদ্ব্যবহার করতো ? তারা কি প্রাণ দিলো যুদ্ধে ? কেন তারা তাদের দেশবাসীর চোখ খুলে ভারত-সাহিত্যের ছবি দেখাবার সামান্য চেষ্টাও করলো না ? কে জানে, হয়তো করেছে ! কিংবা কে তারা ? হয়তো গ্রামে মাস্টারি করছে কিংবা দারা-পুত্র-পরিবার নিয়ে সংসারের চরকি-কলে ঘুরছে। বাংলার সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে এসে অসাহিত্যিক বিদেশী যোদ্ধাও সাহিত্যে রস পেয়েছিলো—কেউ কেউ কলমও ধরেছিলো কিন্তু নিজের দেশে সুবিধা পায় নি—পেতে পারে নি। তাই সাত-সমুদ্র তেরো নদী পারের কথা নিঃশেষে মন থেকে মুছে গেছে।

তবু "Horizon"-সম্পাদক সিরিল কলোনির কথা শুনে অনেকখানি আশ্বস্ত হলাম।

তিনি নিজেই সাহিত্যের প্রসঙ্গ তুলে বললেন, মাঝে মাঝে তোমাদের দেশ থেকে আমার কাছে রচনা আসে—বিশেষ করে তোমার দেশ থেকে, I mean Bengal. আমি প্রায়ই অনেক গল্প কবিতা পাই—

কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না, প্রশ্ন করলাম, বাংলাদেশের যে সব লেখকদের কাছ থেকে আপনি লেখা পেয়েছেন তাঁদের কারুর নাম আপনার মনে আছে কি ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, সিগারেটে টান মেরে মিঃ কনোলি বাংলার কয়েকজন অতি প্রসিদ্ধ আধুনিক কবি ও লেখকের নাম করলেন।

আমি প্রচুর আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁদের লেখা আপনার কেমন লেগেছে ?

খুব ভালো। মিঃ অমুকের কবিতায় আমি গভীর জিনিস পেয়েছি আর মিঃ তমুকের গল্পে কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত জীবনের আশ্চর্য ছবি ফুটে উঠেছে—এঁরা নিঃসন্দেহে ক্ষমতাশালী লেখক।
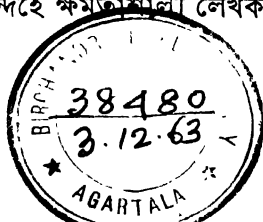
এদের লেখা 'Horizon'-এ প্রকাশিত হয়েছে?

না, একটু থেমে মিঃ কনোলি বললেন, আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলছি এঁদের ইংরেজী আমার ভালো লাগে নি—এই রকম অনুবাদ প্রকাশ করলে আমাদের পাঠক লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাবে না আর তাঁদের ইংরেজী ভাষাও একেবারে অন্য রকম। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এই লেখকরা যদি কিছুদিন এখানে ঘুরে যান তাহলে তাঁদের পক্ষে এদেশে খ্যাতিলাভ করা একেবারেই কঠিন হবে না—আমাদের দেশের পাঠক তাঁদের লেখা আগ্রহের সঙ্গে পড়বে। আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তিনি বললেন, মিঃ জওহরলাল নেহরুর ইংরেজী পড়তে পড়তে আমরা অবাক হয়ে যাই!

আমি আস্তে আস্তে তাঁকে বোঝালাম, অনেক সমুদ্রের ব্যবধান মিঃ কনোলি—সব শক্তিশালী লেখকদের পক্ষে দুম করে এদেশে আসা তো সম্ভব নয়, আর অন্য ভাষায় একজন লেখক সমান দক্ষতার পরিচয় না দিতেও পারেন—

খুব ঠিক কথা, মিঃ কনোলি হেসে কড়া সিগারেটের একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, কিন্তু সে ভাবনা আমার নয়, তোমার।

সিরিল কনোলির সঙ্গে এই আলাপ-আলোচনা হবার কয়েকদিন পর Victor Gollancz থেকে প্রকাশিত হলো শ্রীভবানী ভট্টাচার্যের "So Many Hungers"। বাংলার দুর্ভিক্ষ-বৎসরের পটভূমিকায় লেখা ছোটো উপন্যাস। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখক শিক্ষালাভ করেছিলেন, সে-সময়ে শরৎচন্দ্রের কিছু কিছু অনুবাদও নাকি প্রকাশিত করেছিলেন সেখানকার সাময়িক পত্রিকায়। মোটকথা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বলে বাংলাদেশে ভবানীবাবুর খ্যাতি না থাকলেও নানা ইংরেজী রচনায় তাঁর সাহিত্যিক ও মার্জিত মনের পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছিলাম। তাঁর ভাষার গাঁথুনি ও প্রকাশভঙ্গি বিদেশী পাঠককে মুগ্ধ করলো। ভবানীবাবুর নাম প্রশংসিত হলো, ভালো বিক্রি হলো বই, বাসে-টিউবে-ক্লাবে

অনেকের হাতে দেখতাম, "So Many Hungers"। এ বইখানির নাম উল্লেখ করে এতো কথা বললাম এই জন্যে, কারণ এই "So Many Hungers"-এর উপর ভর করে আমি অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। এর মধ্যে আমার পরিচিতের সংখ্যা আরও বেড়েছে। তারা এ বই পড়ে নানারকম কৌতূহল প্রকাশ করলো—বাংলা সাহিত্যের আরও অনেক লেখকের কথা জানতে চাইলো। আর জিজ্ঞেস করলো, ভবানী ভট্টাচার্যের আর কোনো বই আছে কি-না?

আমি বললাম, আমার জানা নেই, তবে আমাদের দেশে আরও অনেক ব্যানার্জী, মিত্র, ঘোষ, বোস আছেন আর তাঁদের অনেক বইও আছে। "So Many Hungers" তোমাদের ভালো লেগে থাকলে তাঁদের লেখাও খারাপ লাগবে না, বরং আরো বেশি ভালো লাগবে—

আমাকে বাধা দিয়ে ওরা বললো, পড়াও তাঁদের বই। আমি বললাম, দুঃখের বিষয় তাঁদের লেখা আজও ইংরেজীতে অনূদিত হয় নি—যে দু-একটি ছোটো গল্পের অনুবাদ হয়েছে সেগুলিও ঠিক তোমাদের ইংরেজী হয় নি—

তবু তাই পড়াও।

না। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, আমার কাছে যে বাংলা বইগুলি আছে আমি একে একে তাই তোমাদের ইংরেজী করে শোনাবো—আমার ইংরেজী খারাপ হলেও লেখকদের চিন্তাধারার পরিচয় তোমরা পাবে—

প্রত্যেক রবিবার বিকেল পাঁচটা থেকে রাত্তির নটা অবধি আমি নিয়ম করে তাদের পড়ে শোনাতাম। ফরাসী সাংবাদিক, জার্মান ও ইংরেজ লেখক-লেখিকা, লণ্ডন-অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও দুজন শিল্পী ছিলো আমার নিয়মিত শ্রোতা।

আমি পড়ে শুনিয়েছিলাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রদানী' ও 'মতিলাল', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুতুল ও প্রতিমা'র সব কটি গল্প,

মনোজ বসুর ‘ভুলি নাই’ আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ উপন্যাস ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’। আরও অনেক পড়বার ইচ্ছে ছিলো কিন্তু বই ছিলো না। দেশে বার বার চিঠি লিখেও পাই নি।

তারপর এই বইগুলি পড়বার আশ্চর্য প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবলে আজও শিহরণ জাগে।

আশ্চর্য—অদ্ভুত! এইসব লেখক তোমাদের বাংলাদেশের? এঁরা সকলেই জীবিত? কেন এঁরা এখানে আসেন না? কেন এতোদিন এঁদের লেখা অনুবাদ করা হয় নি? আমাদের বাংলা শেখাও—

দিনের পর দিন তাদের উত্তেজনাময় কৌতূহল দেখে আমার শরীরে শুধু রোমাঞ্চ জেগেছিলো। ভালো করে কোনো কথা বুঝিয়ে বলতে পারি নি—ভয় ছিলো পাছে নিজেদের কলঙ্কের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। কেমন করে তাদের বলবো, যে বাঙালী ভালো ইংরেজী জানে. ভালো ইংরেজী লেখে সে, নিজে লেখক না হলেও নিজের কাঁচা লেখাই ইংরেজীতে প্রকাশ করে। একবারও ভেবে দেখে না বাংলা সাহিত্যকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরবার ক্ষমতা একমাত্র তারই আছে—সে গৌরব শুধু তার একার নয়, লেখক বিশেষেরও নয়—তার সমগ্র দেশের।

ইংল্যাণ্ডের গ্রাম

সহসা এক সময় চোখ মেলে দেখি এপ্রিলের গন্ধহীন রঙ-বেরঙের অজস্র ফুল ভরে উঠেছে চারপাশে। তবু আজও থেকে থেকে ঝরে পড়ে হিম, আর ঠাণ্ডা হাওয়ায় পাতায় ফুলে কাঁপে মৃদু শিশির। এতো দীর্ঘদিন কঠিন শীতের ভারি আবরণ যেন পিষে রেখেছিলো প্রকৃতির এই সৌন্দর্য-বিন্যাস, আর আজ মুহূর্তে সরে গেলো সে পাথর। তাই ঋতুর এই পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে—খেয়াল না থাকলেও বাহির-বিশ্ব বলে যায় বসন্ত এসেছে আর অকারণে মনের নিভৃতে শুনি কিসের অনুরণন। পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াই, রবিন পাখিকে দেখি আর গন্ধহীন ফুলগুলি কিসের যেন গন্ধ ছড়ায়।

তারপর গ্রীষ্ম আসে। প্রকৃতি যতো তুষার ঝরায়, ততো রোদ্দুর বিলোয় না কোনোদিন। হোক স্তিমিত ক্ষণিকের রোদ—তাই সবাই প্রাণ ভরে লুটে নেয়। এমনি সোনা-ঝলা হালকা রোদ্দুরে দেখেছি গ্রাম,—লণ্ডনের আশেপাশে ইংল্যাণ্ডের অনেক ছোটো ছোটো গ্রাম।

সেই এপ্রিলের ফোটা ফুলগুলি অজস্র আলো পেয়ে হঠাৎ যেন আনন্দে দুলে-দুলে উঠছে। পথের ধারে ধারে পুরোনো এক ধরনের একতলা বাড়ি—সামনে ফল-ফুলের বাগান। মুখে পাইপ, মাথায় গরম কাপড়ের টুপি—,বাড়ির কর্তাকে চিনতে ভুল হয় না। ছুটির দিনে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে বাগানের কাজ করছে। আর একটু এগিয়ে পথের আর-একধারে অন্য বাড়ির উঠোনের দিকে তাকালে দেখা যায়, এইমাত্র অনেক কাপড় কেচে গিন্নী বালতি ভরে নিয়ে এসেছে,—এইবার একে একে শুকোতে দেবে। ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে কিংবা খালি গায়ে মাঠে গড়াগড়ি যেতে যেতে ভোগ করছে কচি

রোদ্দুর। নির্জন টানা পথে ঠুকঠুক করে চলেছে বুড়ো সবজিওলা আর থেকে থেকে এক সুরে হেঁকে উঠছে, কলিফ্লাওয়ার—গ্রীন পী—জ।

ডাক শুনে বাড়ির গিন্নী গেটের কাছে এগিয়ে এসে হেসে বলছে, গুডমর্নিং, কী আছে তোমার গাড়িতে?

কী চাই তোমার ম্যাডাম? গাড়ি থামিয়ে সবজিওলা টাটকা তরিতরকারী গিন্নীকে দেখায়, কপি দেবো? ভালো মটরশুঁটি? শস্তা ক্যারট? গিন্নী এটা-ওটা ঘেঁটে সামান্য দরাদরি করে ঝুড়ি ভরে কিনে রাখছে নানারকম তরিতরকারি আর হিসেব করে মৃদু হেসে মিটিয়ে দিচ্ছে সবজিওলার পাওনা দাম। আরও এগিয়ে দেখা যায়, দলে দলে—বুড়ো-বুড়ী, ছেলেমেয়ে হয় ফাঁকা জায়গায় ছুটোছুটি করছে নয় টেনিস র‍্যাকেট হাতে নিয়ে খেলতে চলেছে কিংবা সুইমিং কস্ট্যুম পরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

তারপর আর বাড়ি চোখে পড়ে না। মাঠ আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে সুদূর নির্জন পথ। সাপের ভয় নেই, তাই নিশ্চিন্তে এই ঝোপঝাড়ে বসা যায়। নরম মাটিতে গা এলিয়ে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাতার মর্মর আর হাওয়ার অলস মৃদু স্পর্শ, মনের আশ্চর্য শৈথিল্য উপভোগ করা যায়। সামনে বিরাট জলাশয়, মাথার উপর খোলা আকাশ, চারপাশে সবুজ ঝোপঝাড় গাছপালা। কিন্তু সে সবুজ মনকে তো তেমন করে স্পর্শ করতে পারলো না। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবু মন বলছে, এই সবুজের ফাঁকে ফাঁকে কুয়াশা লুকিয়ে আছে, আর যেন বয়ে গেছে ধোঁয়ার ঝড়। তার চিরকালের চিহ্ন পড়েছে সবুজের উপর। তাই মনে হয়, সবুজ নয়—এ যেন ধূসর। ততো পাখি ডাকে না, ততো মাটির গন্ধ পাওয়া যায় না, বাতাস বহন করে আনে না দিশাহারা সৌরভ। প্রকৃতির কোথায় যেন ভয় লুকিয়ে আছে।

কী সুন্দর দিন! পথিকের সম্ভাষণে হঠাৎ কখন চমক লাগে।

সুন্দর!

তোমাকে তো এ গ্রামে আগে দেখি নি মেট?

আমি বেড়াতে এসেছি।

মাঝবয়সী পথিক একচোট হেসে বলে, বেড়াতে? এই পাড়াগাঁয়ে? কী দেখবে বলো এখানে?

তোমাকে আর তোমার মতো আরও অনেককে।

বাঃ, সুন্দর কথা বলতে পারো তো তুমি, বাড়ি কোথায় তোমার—স্পেইন?

না।

তবে?

তুমিই বলো না, কোথায় হতে পারে?

আবার হেসে বলে পথিক, এইবার ঠিক বুঝেছি, ফ্রান্সের লোকেরা এমনি রসিক হয় বটে।

আমিও হেসে বলি, হলো না, হলো না—আমার বাড়ি ইণ্ডিয়া—নাম শুনেছো?

আরে তাই নাকি? আমার হাতে ঝাঁকানি দিয়ে পথিক বলে, গান্ধী—গান্ধী—গান্ধী—তোমাদের দেশের কথা খুব শুনেছি—লণ্ডনে পড়াশুনো করছো বুঝি?

হ্যাঁ।

বাঃ, আমি পোস্টম্যান, ওই যে আমার বাড়ি, একদিন এসে চা খাবে? খুব খুশি হবো—

নিশ্চয়ই।

তুমি তো শহুরে লোক, জুতোয় পাইপ ঠুকে পথিক আবার বলে, আচ্ছা বলো তো কী আছে তোমাদের শহরে? শুধু ধোঁয়া আর যক্ষ্মা।—না বাপু তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আর শহরেব নিন্দে করবো না। কদিন থাকবে?

দিন সাতেক।

এসো পরশু চা খেতে।

নিশ্চয়ই আসবো, অনেক ধন্যবাদ।

কেউ রেলের গার্ড. কেউ পোস্টম্যান, কেউ চাষা, কেউ গয়লা আর কেউ সামান্য ইস্কুল মাস্টার। এদেরই বাড়িতে রেডিও, পিয়ানো আর ভালো জাতের কুকুর দেখে প্রথমে অবাক লাগে আমাদের। কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেই কথায় কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ে এদের অসন্তোষ।

যাদের কথা বললাম, আমাদের দেশের তুলনায় তাদের অবস্থা অনেক ভালো হলেও নিজেদের দেশের আয়-ব্যয়ের হিসেবে এদের অবস্থা খারাপই বলা যায়। রেডিও, পিয়ানো, কার্পেট আর শীতের দেশ বলে জানালায় পুরু পর্দা প্রায় সব বাড়িতেই থাকে। সপ্তাহে খুব অল্প টাকার কিস্তিতে ওগুলো কেনা যায়। কিন্তু টান পড়ে দৈনন্দিন সংসার খরচের বেলায়। খাওয়া-দাওয়া আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের তুলনায় একজন সাধারণ পিওন বা ইস্কুল-মাস্টারের আয় কমই বলা যায়। একজন পোস্টম্যানের মাইনে সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড। তার বাড়িভাড়া, র‍্যাশন, লণ্ড্রি, জামাকাপড় শীতের দেশের আরও টুকিটাকি জিনিস খুব সতর্ক হয়ে কিনলেও ওই মাইনেতে স্বচ্ছল অবস্থায় সংসার চলতে পারে না তার। কোনো রকমে চলে। আমাদের মতো খাওয়া-দাওয়া নিয়ে মাথা ঘামায় না তারা। ভোজন-বিলাসে তাদের উৎসাহ নেই,—রন্ধনশিল্পের বিভিন্ন নৈপুণ্য ইংরেজের একেবারে অজ্ঞাত। সেই আলুসেদ্ধ, কপিসেদ্ধ, আর রোস্ট আর একঘেয়ে মাছসেদ্ধ কিংবা ভাজা। গ্যাসের উনুনে ঘণ্টাখানেকের বেশি রান্না করতে লাগে না। ইংরেজ-গৃহিণী তার বেশি সময় কাটায় না রান্নাঘরে। আয়েস করে তাদের খেতে দেখেছি, তা সে যাই হোক—মন্দ হোক ভালো হোক—ক্ষতি কিছু নেই। যা খাওয়ানো যায়, খুশি হয়ে খেয়ে বলে, সুন্দর! সকালে ব্রেকফাস্টের পর একটায় লাঞ্চ খেলো, তারপর বিকেলে সামান্য

একটু চা, সাড়ে ছটা সাতটায় গোটা কয়েক স্যাণ্ডউইচ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লো।

হয়তো রেডিও কেনবার ইচ্ছে হলো কারুর,—ওদিকে কিস্তিতে সামান্য টাকা নিলেও সংসার-খরচে টান পড়ে। তখন নিয়ম করে হয় লাঞ্চ একেবারে বাদ দিয়ে নয় ব্রেকফাষ্ট কমিয়ে দিয়ে ওরা দুই দিক বজায় রাখে। ধার করতে হলো না, সংসার খরচের অকুলান হলো না, অথচ ইচ্ছেমতো জিনিসও কেনা হলো। গ্রামে হোক, শহরে হোক ধৈর্যশীল হিসেবী ইংরেজদের সেই এক রীতি।

আমাদের গ্রামে পিপাসা চেপে চলতে চলতে সুন্দর করে সাজানো কচি ডাবের দোকান দেখলে যেমন আনন্দ হয়, ঠিক তেমনি আনন্দ হয় ইংল্যাণ্ডের গ্রামে 'পাবলিক হাউস' (পাব্‌) দেখলে। গ্রীষ্মের দুপুরে দল বেঁধে সাইকেলে কিংবা পায়ে হেঁটে এলো ছাত্র-ছাত্রী—তারা এসে বিশ্রাম করলো 'পাবে',—ঠাণ্ডা বিয়ার কিংবা লেমন-স্কোয়াশ খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়লো।

সন্ধ্যেবেলা 'পাব্‌' ভরে যায়। আর চলে বুড়োদের মনের কথা, বুড়ীদের সুখ-দুঃখের কাহিনী, কতো তরুণ-তরুণীর মনজানাজানি।

কি হে, ফেস্টিভ্যাল অব ব্রিটেন কেমন দেখলে? শহরে গিয়েছিলে বুঝি?

যাই বলো, এমন উৎসব কখনও দেখি নি হে—

আরে দূর, উৎসব—টিকিটের দাম বড়ো বেশি।

তা হবে না, খরচটা কি কম হয়েছে নাকি?

দেশের এই দুঃসময়ে এতো খরচ করবার কি দরকার ছিলো?

ছিলো বৈকি, দুঃসময়ে হলেও, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের অবস্থা অনেক ভালো, সেটা বাইরের লোকের জানা দরকার—

থামো, থামো, যাদের জানবার তারা আমাদের আসল অবস্থার কথা জানে।

যতোই জানুক, এটাও তাদের জানা দরকার, আমাদের অবস্থা আশেপাশের অনেক দেশের চেয়ে অনেক ভালো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেকথা এখন খুব খরচ-পত্তর করে জাহির না করে আর উপায় কি।

আঃ, ছেড়ে দাও ওসব কথা, বলি ব্যালে-ট্যালে দেখলে নাকি ফেষ্টিভ্যাল হল-এ?

না বাপু, ঢুকতে পাঁচ শিলিং, তারপর খরচ করে ব্যালে দেখা গ্রামের লোকের পোষায় না।

'হল্'টা করতে বেশ খরচ পড়েছে, কিন্তু বানিয়েছে চমৎকার, আর ওটা তো থাকবে চিরকাল।

তা থাক। কিন্তু পাঁচ শিলিং খরচ করেও ভেতরে ঢুকে যে দুটো ভালো-মন্দ খাবো, তার উপায় নেই—রেস্টুরেণ্টগুলোর খাবারের যা দাম!

যাই বলো বাপু, বড়ো বাড়াবাড়ি রকম বেশি করা হয়েছে ওখানকার সব জিনিসের!

কি মিসেস টার্নবুল, 'পাব্' কেমন চলছে তোমার?

ধন্যবাদ, এই মন্দ নয়—

মেয়ের কি খবর?

লণ্ডনে ইস্কুল-মাস্টারি করছে, দিনকয়েক হলো পুরোনো ইস্কুলটা বদলেছে।

নাকি? আরও ভালো ইস্কুলে গেছে বুঝি?

কে জানে ছাই সেকথা। আমার স্বামীর হাতে গড়া 'পাব্', ভেবেছিলাম মেয়েটাই এটা বাঁচিয়ে রাখবে, কিন্তু গ্রামে বসে 'পাব্' চালানোয় তার এতোটুকুও উৎসাহ নেই, মুখ বেঁকিয়ে আমাকে শুনিয়ে গেলো সেদিন, এই নোংরা ব্যবসা চালাতে বয়ে গেছে আমার—

বটে?

মরুক গে, যার যা খুশি করবে, আমি যে কদিন বাঁচি এটা চালিয়ে যাবো, তারপর যা হয় হবে। আমি যখন থাকবো না, তখনকার ভাবনা ভেবে আমার লাভ কি বলো ?

ঠিক কথা মিসেস টার্নবুল।

ওহে, ওই আবার এসেছে—

কে আবার এলো হে ?

ওই দেখো না তাকিয়ে—

ও, সেই শাশুড়ী বউ আর ছোকরাটা। ওরে বাপরে—

আচ্ছা, ওরা কারা হে ?

কে জানে, ওই পাদ্রীর বাড়িটা কিনেছে, পাদ্রী বাছাধন প্রেমে হতাশ হয়ে চাকরি নিয়ে গেলো ক্যানাডায়, আর ওরা দখল করলো ওর বাড়ি। ওই মেয়ে আর শাশুড়ী থাকে, শাশুড়ী বিধবা, মেয়েটির স্বামী নাকি ফিলিম করতে গেছে আমেরিকা, হিরো হবে হে, কান কাটবে ওয়ালটার পিজনের—সে আর এসেছে বউএর কাছে—

তাই বুঝি আমেরিকা থেকে এই ছোকরাটা এসে জুটেছে !

দূর—নেশা ধরেছে তোমার দেখছি, ইংরেজ হয়ে ইংরেজ চিনতে পারো না—ও ছোঁড়া আবার আমেরিকান হলো কবে—ও তো আমাদের হেড-মাস্টারের ভাই—

আচ্ছা, আজ উঠি তাহলে—

আরে বসো বসো—খাও আরেকটা বিয়ার।

অল্‌রাইট।

কখনও কখনও মোটরের হর্ন শুনে চমক লেগেছে। পিছন ফিরে দেখি দামী বিলিতি গাড়ি চালিয়ে লণ্ডনে চলেছে ইংরেজ ব্যবসায়ী। হয়তো শহরে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তার, তাই লণ্ডনের কাছাকাছি গ্রামে উঠেছে তার বিরাট বাড়ি। সামনে পিছনে অনেক জমি—সদর দরজা খুলে ঘরের কাজ করছে জার্মান কিংবা সুইস্ মেইড। অনেক ছোটো ছোটো বাড়ির কাছে এমনি বিরাট বাড়ি বড়ো

বেশি বেমানান মনে হয়—এ যেন জোর করে অনধিকার প্রবেশ করে নিদারুণ ছন্দপতন করে দেয়া।

পরমুহূর্তেই চোখ জুড়িয়ে যায়—খোলা মাঠে চরছে গোরুর পাল। আহা, কতোদিন দেখি নি যে! লণ্ডনের রাস্তায় তো আর গোরু দেখা যায় না। বড়ো-বড়ো তাজা অস্ট্রেলিয়ান গোরু। এদেরই দুধ খেয়ে বড়ো হচ্ছে, সুন্দর হচ্ছে অসংখ্য ব্রিটিশ শিশুর দল। ভেজাল নেই—এক ফোঁটা জল নেই—ইংল্যাণ্ডের খাঁটি গোরুর দুধ। এ গ্রামেই রয়েছে কোনো ডেয়ারি ফার্ম। দীর্ঘকালস্থায়ী গোধূলি শেষ হবে না, গগনে উঠবে না গো-ক্ষুররেণু, 'চাঁদমুখে বেণু দিয়া ধেনু-নাম লইয়া'ও ডাকবে না কেউ, পাঁচটা বাজবার আগেই চোদ্দ-পনেরো বছরের কয়েকটি ছেলে এসে নিঃশব্দে ডেয়ারির গোয়ালে নিয়ে যাবে গোরুর পাল। কাল খুব ভোরে—হাতের স্পর্শ নয়—বৈদ্যুতিক প্লাগ লাগিয়ে শুরু হবে দোহন তারপর বিদ্যুৎ দিয়ে শোধন! কতো অসংখ্য ছোটো-বড়ো বোতল ভরে উঠবে। তারপর বিরাট ঘোড়ায় টানা গাড়ি হাঁকিয়ে দলে দলে বেরিয়ে পড়বে গয়লার দল। গ্রামে, শহরে আর লণ্ডনের অলিতে-গলিতে শোনা যাবে দোরগোড়ায় বোতলের ঠুনঠুন শব্দ।

* * *

যতো দেখেছি, ততো দেখাতে পারলাম না। যতো কথা বলবো বলে মনে মনে সাজিয়ে তুলেছিলাম, ততো কথা বলা হলো না। সময় আর সমুদ্রের ব্যবধান নিঃশব্দে কখন দিয়ে গেছে বিস্মরণ। স্মরণের সরোবরে ফুলের মতো শুধু ফুটে রইলো সিন্ধুপারের সুদূর পল্লী-অঞ্চলের হালকা রোদ্দুর-ঝলমল-করা কয়েকটি উজ্জ্বল দিন। তাই হোক সঞ্চয়।

লণ্ডন রঙ্গমঞ্চ

সমস্ত লণ্ডন শহরে রঙ্গালয়ের সংখ্যা কতো, সেকথা মনে মনে হিসেব করে সহজে বলা হয়তো সম্ভব নয়। তবে ওয়েস্ট এণ্ডে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে রাস্তার এপাশে-ওপাশে অলিতে-গলিতে এতো রঙ্গালয় চোখে পড়ে যে, বিদেশীর পক্ষে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ লম্বা 'কিউ'-এর দিকে তাকিয়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া অন্য পাড়ায় ছোটোখাটো থিয়েটার তো আছেই। নতুন লেখকের ভালো নাটক কিংবা পুরোনো লেখকের নতুন বই প্রথমে ওয়েস্ট এণ্ডের থিয়েটারেই দেখা যায়। সে-পাড়ায় অভিনয় দেখার আগ্রহ লণ্ডনের জনসাধারণের খুব বেশি। লোকে 'কিউ'-এ দাঁড়ায় দু শিলিংএর টিকিটের জন্য—সবচেয়ে কমদামী টিকিট। রোদ বৃষ্টি কুয়াশা তুষার—কিছুতেই উৎসাহ হারায় না তারা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে এতোটুকু বিরক্তির চিহ্নমাত্র নেই। এই দু শিলিংএর 'কিউ'-এ যারা দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা খুব ভালো নয়, সেকথা বললে ভুল হবে। ইচ্ছে করলে এদের অনেকেই পনেরো-কুড়ি টাকার টিকিট দুমাস আগে কিনে রাখতে পারতো। কিন্তু তা করে নি, কেন না, 'কিউ'-এ দাঁড়াতে এদের ভালো লাগে আর যেখানে কম পয়সায় কাজ সারা যায় সেখানে বেশি পয়সা ইংরেজ সহজে খরচ করে না। আজ ইচ্ছে করলেও ফল হবে না, কারণ অন্য টিকিট সব শেষ হয়ে গেছে। তাই যারা বিদেশী কিংবা যাদের বয়স খুব বেশি অথবা খুব বড়োলোক, তারা আগে থেকে দামী চেয়ারের বন্দোবস্ত করে রাখে।

যারা অশিক্ষিত, নাটকের ভালোমন্দ বিচার করবার ক্ষমতা যাদের নেই, যারা চায় শুধু বিশেষ পোশাকে বিশেষ নাচ আর আনন্দ, সেই 'পাবলিকে'র দোহাই দিয়ে ওয়েস্ট এণ্ড রঙ্গালয়ের

কর্তারা বিশেষ নাটকের বন্দোবস্ত করবে না ; কিংবা কোনো নাট্যকার তাদের খুশি করবার জন্যে নিজের অক্ষমতা অস্বীকার করে কখনো বলবে না, 'পাবলিক' এই চায়। ইংজের নাট্যকারের কাজ হলো দেশের রুচিকে উন্নত করা—নাট্য-সাহিত্যে নতুন আলো ফেলে নানারকম পরীক্ষা করা। হীন রুচিকে সমর্থন করে শুধু পেটের দায়ে নাটক লেখা নয়। তাই লণ্ডনের রঙ্গালয়ে শিক্ষিত দর্শকের ভিড়—ছাত্রদের ঠেলাঠেলি। অভিনয় কেমন হলো, কোন অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় করলো, সেকথা দর্শক আলোচনা করে পরে—সাধারণত থিয়েটার দেখতে দেখতে কিংবা বাইরে বেরিয়ে প্রথম কথা হয়, নাট্যকারের দোষগুণ নিয়ে, নাটকের বিষয়বস্তু আর কলা-কৌশল নিয়ে। তবু বিশেষ দর্শকের জন্য বিশেষ নাচ-গানের রঙ্গালয় আছে এবং ওয়েস্ট এণ্ডেই। আমি সেগুলির কথাই প্রথমে বলবো। সে-[illegible]তারা হালকা ভাবে হালকা রস পরিবেশন করে। ওয়েস্ট এণ্ডের [illegible] প্রধান রঙ্গালয়—উইণ্ডমিল, ক্যাসিনো, হিপোড্রোম্। ভদ্র-সমাজে যদি হঠাৎ কোনো-দিন আপনি এই রঙ্গালয়গুলির নাম উল্লেখ করেন, তাহলে শিক্ষিত শ্রোতা তখুনি বুঝে নেবে, আপনার রুচি কেমন এবং আপনি কোন শ্রেণীর লোক। এই রঙ্গালয়গুলিতে আনন্দ উপভোগ করতে যায় সকলেই, কিন্তু চুপে-চুপে, এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে খুব সাবধানে—চেনাশোনা কেউ দেখে ফেললেই মুশকিল। মনে করবে, কী জঘন্য রুচি, উইণ্ডমিলে এসেছে।

এই জাতের থিয়েটারগুলির বড়ো বেশি মিল। একটি দেখলেই চলে—অন্যগুলিতে সেই একই ব্যাপার। কিন্তু ব্যাপারটা কি? যত কাপড় না হলেই চলে না, ঠিক ততোটুকু কাপড় পরে মেয়েরা নাচ আর গানের মধ্য দিয়ে আপনাকে আনন্দ দেয়। কিন্তু নাচের ভঙ্গি দেখে আর গানের ভাষা শুনে শিক্ষিতেরা ভুরু কোঁচকায়, অনেকে [illegible] উঠে যায়, আর যে সৎ বৃদ্ধেরা লোভ সামলাতে না পেরে এসে পড়েছে, তারা বিরক্তির রেখা মুখে ফুটিয়ে শেষ অবধি বসে

থাকে। মেয়েরা এসব থিয়েটারে বড়ো একটা আসে না, আর দু-একজন কৌতূহল দমন করবার জন্যে এলেও দ্বিতীয়বার ভুলেও আসে না।

ইংরেজ বন্ধু-বান্ধবের মুখে এই সব থিয়েটারের যতোখানি নিন্দে শুনেছিলাম—এগুলি বার বার দেখার পর আমি তাদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। ইংরেজ কনজারভেটিভ—একটু এদিক-ওদিক হলে লজ্জায় তাদের কান লাল হয়ে ওঠে। সামান্য অশোভন হলে অশ্লীল মনে করে অস্বস্তি বোধ করে। উল্লিখিত রঙ্গালয়ে বসে আমার একবারও মনে হয় নি যে, এতোটুকুও বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আর মঞ্চের মেয়েদের পোশাক দেখে আমি অবাক হই নি, কারণ এমন সাজ যে কোনো ব্যালেতে দেখা গেছে। তারপর তাদের গান ও রসিকতা। হয়তো এই নিয়ে শিক্ষিত ও মার্জিত দর্শকের আপত্তি। কিন্তু আমি বিদেশী, তাই ওদের রসিকতা ও হাস্যরসের জাতিবিচার করবার ক্ষমতা আমার নেই। আলোর বন্যা, মঞ্চের কলাকৌশল, মেয়েদের সমাবেশ, আর তাদের দ্রুত পদক্ষেপ এবং বিভিন্ন বাজনার আশ্চর্য সঙ্গতি আমাকে বিস্মিত করেছে। একথা বললে বেশি বলা হবে না যে, বেরিয়ে আমার মনে হয়েছিলো, কী দেখলাম! সুরুচি-কুরুচি, শোভন-অশোভন এসব কথা ভাববার আমার অবসর হয় নি, কারণ মঞ্চের বিচিত্র শিল্প-প্রকাশ আমাকে অন্য জগতে নিয়ে গিয়েছিলো।

এই সঙ্গে এই জাতের ফরাসী দলের নাম উল্লেখ করতে হয়, অর্থাৎ 'ফলিবেরজা'। সম্প্রতি লণ্ডনে তাদের শাখা খোলা হয়েছে এবং এই দল লণ্ডনের অন্য তিনটি থিয়েটারকে কানা করে দিয়েছে। ফ্রান্সের রূপসীরা ম্লান করে দিয়েছে ইংরেজ সুন্দরীদের। আর ফরাসী স্টেজ-টেকনিক দেখে মনে হয়, ইংল্যাণ্ড কতো পেছিয়ে আছে। এককথায় বলতে গেলে বলতে হয়, অপূর্ব!

অল্প অল্প আলো, যেন ম্লান জ্যোৎস্না উঠেছে, মঞ্চের উপর জমেছে

মেঘ, মৃদু মৃদু বাজনা বাজছে, আর সেই মেঘে মেঘে কতো রূপসীর ভিড়—কতো রকমের রূপ-প্রকাশ। তারপর অন্য বাজনা বাজলো, আলোর প্লাবনে ভরে গেলো মঞ্চ, আকাশ থেকে কেমন করে নেমে এলো হাজার সুন্দরী। কখনও সমুদ্রের গভীরে জলপরীদের নাচ, কখনও আকাশের রূপে, কখনও মঞ্চের উপর রেলগাড়ি আপনাকে অবাক করে দেবে। এই ধরনের মঞ্চগুলির মধ্যে বর্তমান লণ্ডনে ফরাসী 'ফলিবেরজা' সর্বশ্রেষ্ঠ, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

যাদের রুচি উন্নত, যারা নাচ-গান ভালোবাসে, অথচ যারা এই সব রঙ্গালয়ে গিয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট হয় না, তাদের জন্যে রয়েছে কভেণ্ট গার্ডেন অপেরা কিংবা শ্যাডলারস ওয়েলস ব্যালে। পুরাণ কিংবা ইতিহাস নিয়ে এরা করে গানের নাটক কিংবা নাচের অভিনয়। তাছাড়া ইওরোপ থেকে আসে নানা দল। স্পেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন—এই সব অনেক দেশের ব্যালে লণ্ডন-রঙ্গমঞ্চ আচ্ছন্ন করে রাখে বহুদিন। কেনসিংটনের বিশ্ববিখ্যাত রয়েল অ্যালবার্ট হলে নানা দেশের কনসার্ট চলে রাতের পর রাত। নাচ নয়, গান নয় অভিনয় নয়, শুধু কনসার্ট—সেই বাজনা শুনতে সহস্র শ্রোতার ভিড়।

এবার লণ্ডন-রঙ্গমঞ্চের আধুনিক নাটক ও নাট্যকারের কথা বলা যাক। বর্তমান ইংল্যাণ্ডের তরুণতম শক্তিশালী নাট্যকার ক্রিস্টফার ফ্রাই। ফ্রাই-এর বয়স বেশি নয়, চল্লিশের নিচে। তাঁর নামে দর্শক টেনে আনে। তাঁর চেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার বর্তমান ইংল্যাণ্ডে নেই। অনেক ইংরেজ সমালোচক ক্রিস্টফার ফ্রাইকে বলে আধুনিক শেক্সপীয়র। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, দি লেডী ইজ নট ফর বার্নিং। এই নাট্যকারের প্রত্যেকটি নাটক রাতের পর রাত লণ্ডন-রঙ্গমঞ্চে চলেছে এবং দর্শক-সাধারণের মন জয় করে নিয়েছে। তাঁর আরও কয়েকটি নাটকের নাম, দি ফার্স্ট বর্ন্ ভিনাস্ অবজারভ্ড্ এবং এ ফিনিক্স টু ফ্রিকোয়েন্ট।

ক্রিস্টফার ফ্রাই-এর নাটক শুধু দর্শকের মন মাতায় না,

পাঠককেও গভীর তৃপ্তি দেয়। তাঁর ভাষা যেমন ভারি, তেমন অভিনব। ফ্রাই-এর লেখা পড়ে মনে হয়, তার প্রেরণা ইতিহাস আর বাইবেল থেকে। ছন্দের ঝঙ্কারে, উপমার নতুনত্বে, দৃষ্টির ব্যাপকতায় তাঁর নাট্য-সাহিত্য শিল্পের সর্বোচ্চ সোপানে পৌঁচেছে। তাই আজ অনেক সমালোচকের মতে তরুণ ক্রিস্টফার ফ্রাই আধুনিক ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত নাট্যকার।

কবি টি-এস এলিয়টের নাটক 'ককটেল পার্টি' লেস্টার স্কোয়ারের নিউ থিয়েটারে আরম্ভ হয়। কবি এ-নাটক শেষ করবার আগেই অনেকে এর কথা জানতো এবং কবে এটি শেষ হবে, একথা ভেবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। নাটক লেখা শেষ হলো, কিন্তু লণ্ডনে অভিনীত হলো না—এডিনবরা উৎসবে হলো এ নাটকের প্রথম অভিনয়, তারপর ব্রাইটনে এবং অবশেষে লণ্ডনে। অনেকের ককটেল পার্টি ভালো লাগে নি। তারা বলেছে, এ নাটকে কিছু নেই। আর কারুর কারুর মতে, অদ্ভুত নাটক। ককটেল পার্টি চললো অনেক-দিন—এলিয়টের ভাব আর ভাষা আবার লোককে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিলো তাঁর ক্ষমতার কথা। এ নাটকে অভিনেতা ও অভিনয়ের কথা কেউ উল্লেখ করলো না। ককটেল পার্টি সম্পর্কে একমাত্র আলোচনা হলো, এলিয়ট।

ফ্রাই ও এলিয়ট ছাড়া আলডুস হাক্সলি, জে. বি. প্রিস্টলি—এঁরাও রঙ্গমঞ্চের জন্যে কয়েক বছরের মধ্যে নতুন নাটক লিখে নানা রকম পরীক্ষা করেছেন এবং তাঁদের নাটক হলেই দর্শক-সাধারণ বিনা দ্বিধায় টিকিট কাটে। কিন্তু এঁদের নাটক দেখে বাইরে এসে লোকে আগে অভিনয়ের আলোচনা করে—পরে নাটকের বিষয়বস্তুর কথা। বার্নার্ড শর মৃত্যুর পর তাঁর বহু নাটক আবার নতুন করে লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে দেখানো হচ্ছে। ভিড় হচ্ছে খুব বেশি, টিকিট পাওয়া শক্ত। লোকে হাততালি দিয়ে ম্যান অ্যাণ্ড সুপারম্যানের মতো দীর্ঘ নাটক পাঁচ ঘণ্টা ধরে ঠায় চেয়ারে বসে উপভোগ করছে।

আর ঘরে-বাইরে শেক্সপীয়র। সারা বছরের যে কোনো সময় লণ্ডনের কোনো না কোনো রঙ্গমঞ্চে আপনি শেক্সপীয়রের নাটক দেখতে পাবেন। ওল্ড ভিক্ কোম্পানি ছাড়াও সাধাবণ রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটক নানাভাবে অভিনীত হয়। স্ট্র্যাটফোর্ড অন্ এভনের কথা না হয় নাই উল্লেখ করলাম।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো খোলা মাঠে শেক্সপীয়র। প্রত্যেক বছর গ্রীষ্মকালে রিজেন্টস পার্কে শেক্সপীয়রের নানা নাটক অভিনয় করা হয়। ওপেন এয়ার থিয়েটারের অভিনয় প্রত্যেকের ভালো লাগে—সকলে বার বার দেখেন। বছরে শুধু দুমাসের জন্যে তাদের আবির্ভাব, তাই দর্শকের সংখ্যা বাড়ে বই কমে না।

'যাত্রা' কথাটা শুনলে আজকাল আমরা সকলেই মনে মনে হাসি। আমাদের দেশে রঙ্গমঞ্চে ও ছায়াছবির যুগে যাত্রা বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা দেশবাসী করলো না, করতে পারলো না। ইংল্যাণ্ড পারলো। যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে হয়তো কিছু কিছু রীতিনীতি বদলাতে হলো ; কিন্তু অভিনয়-মালঞ্চের প্রথম ফুল তারা বাঁচিয়ে রাখলো সযত্নে। আমার এ উক্তিতে হয়তো পাঠক-সাধারণ অবাক হবেন। কিন্তু ওপেন এয়ার থিয়েটার আমাকে এবং আরও অনেককে নিয়ে যায় শেক্সপীয়রের যুগে। যেমনি অভিনয় তেমনি প্রকাশের ধারা। আর আশ্চর্য, যে কোনো আধুনিক থিয়েটারের চেয়ে ওপেন এয়ারে ভিড় হয় অনেক বেশি।

আজও শেক্সপীয়রকে সাধারণের কাছে নানারূপে তুলে ধরবার জন্যে ইংল্যাণ্ড যতখানি চেষ্টা করছে আমার মনে হয় না পৃথিবীর আর কোনো দেশে তাদের জাতীয় কবিকে নিয়ে ততো মাতামাতি হয়।

কিন্তু সার্থক এ মাতামাতি। 'জুলিয়াস সিজার' স্ট্র্যাটফোর্ড অন্ এভনে দেখলাম একরকম, লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে দেখলাম আর একরকম, সেই একই নাটক ওপেন এয়ারে দেখলাম একেবারে অন্যরকম।

বন্ধু-বান্ধবরা ঠাট্টা করে বলে, শুনছি ইংরেজের মুখে শেক্সপীয়র ছাড়া নাকি কথা নেই, তাই ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আমাদের দেশের লোকেরাও শেক্সপীয়র-শেক্সপীয়র করে ইংরেজ সাজে।

কথাটা খুব মিথ্যা নয়। ইংরেজ সাজে কিনা জানি না, তবে একথা ঠিক আমাদের দেশের লোকের ইংল্যাণ্ডে শেক্সপীয়র সম্বন্ধে হয় নতুন উপলব্ধি। আর এই মহাকবিকে এমন করে বিদেশীর মনে মেলে ধরবার কৃতিত্ব বোধ হয় অভিনেতা অভিনেত্রী আর রঙ্গ-জগতের অন্যান্য লোকের প্রাপ্য। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিলো।

শুধু ইংরেজী নাটক নয়, লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে ইংরেজীতে ইওরোপের আরও নানা দেশের নাটক প্রায়ই অভিনীত হয়। আর তা ছাড়া আমেরিকার নাটক তো থাকবেই। সব দেশের সব নাটক দেখবার সুযোগ আমার হয় নি, আমি শুধু ফ্রান্স ও আমেরিকার নাটকের কথাই বলবো, কেননা এই দুই দেশের নাটকের মূলে আশ্চর্য প্রভেদ—অভিনয়েও।

ফরাসী নাট্যকার জঁা পল সার্ত্রের (Jean Paul Sartre) নাম ইংল্যাণ্ডে শুধু সুপরিচিত নয়, প্রশংসিত। তাঁর লেখা 'মেন উইদাউট শ্যাডোজ', 'এ রেসপেকটেবল প্রস্টিটিউট' এবং আরও অনেক নাটক লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে সগৌরবে চলেছে এবং তাঁর নতুন রচনার আশায় জনসাধারণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। সার্ত্রের দর্শন একজিস্টেন্সিয়েলিজম্ (অস্তিত্ববাদ)। সার্ত্রের নাটক এই 'বাদে'র ওপর ভিত্তি করে লেখা। গতি, কৌতূহল, রস—সবই আছে তার নাটকে এবং শক্তিশালী নাট্যকারের যে গুণগুলি থাকা দরকার জঁা পল সার্ত্রে সেগুলি থেকে বঞ্চিত নন, তবু কোথায় যেন এঁকে প্রশংসা করতে বেধে যায় আর মনে হয় প্রতিক্রিয়াশীল। আর একজন ফরাসী নাট্যকার জঁা অ্যানুই ইংল্যাণ্ডে সার্ত্রের মতো পরিচিত না হলেও তাঁর চেয়ে বেশি শক্তিশালী বলে স্বীকৃত।

অ্যান্নুই-এর অনুভূতি ও সমবেদনা সার্ত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ আর গভীর। জনসাধারণ তাঁকে নিয়ে উন্মত্ত না হলেও ফরাসী ও ইংল্যাণ্ডের শিক্ষিত মহল সার্ত্রের চেয়ে অ্যান্নুই-এর প্রতিভা বেশি সেকথা স্বীকার করে।

কিছুদিন আগে অ্যান্নুই-এর 'অ্যান্টিগোনে' ডাচেস থিয়েটারে হয়েছিলো। ফ্রান্সে এই অসামান্য নাটক ঝড় বইয়ে দিয়েছিলো; কিন্তু লণ্ডনে চললো না। ক্রিস্টফার ফ্রাই-এর অনুবাদ করা অ্যান্নুই-এর নাটক 'রিং রাউণ্ড দি মুন' গ্লোব থিয়েটারে খুব ভালো চলেছিলো। নাটকের শেষের দিকে নাট্যকারের মতামত, সম্পদের অসারতা ইত্যাদি জোর করে উপদেশ শোনাবার মতো মনে হলেও নাটকের গঠন ও সুঅভিনয়ের জন্যে এসব কথা লোকের মনে হয়তো ওঠে নি। 'রিং রাউণ্ড দি মুন' সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই অভিনেত্রী মারগারেট রাদারফোর্ডের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। অ্যান্নুই-এর আর-একটি প্রশংসিত নাটকের নাম 'পয়েণ্ট অফ্ ডিপারচার'। লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে তিনখানি উচ্চ-প্রশংসিত আমেরিকান নাটক—'হার্ভি' 'ডেথ অফ এ সেল্স্ম্যান' আর 'স্ট্রীটকার নেম্ড্ ডিজায়ার'।

'ডেথ অফ এ সেল্স্ম্যান' প্রসিদ্ধ হয়েছে পল মুনির অভিনয়ের জন্যে। এ নাটকের বিষয়বস্তু হলো সেল্স্ম্যানের জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা। 'হার্ভি' মনস্তত্ত্বমূলক। 'স্ট্রীটকার্ নেম্ড্ ডিজায়ার'-এর লেখক বর্তমান আমেরিকার জনপ্রিয় নাট্যকার টেনেসি উইলিয়াম্স। যে তিনখানি আমেরিকান নাটকের নাম করলাম তার প্রত্যেকটি লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে বহুদিন চলেছে এবং অনেক ইংরেজ দর্শক এগুলি নিয়ে মেতে উঠলেও স্বীকার করেছেন যে তাঁদের মনে নাটকের বিষয়বস্তু ফরাসী নাটকের মতো গভীরভাবে রেখাপাত করে নি। 'স্ট্রীটকারে' ভিভিয়েন্ লি-র অভিনয় খুবই ভালো; কিন্তু টেনেসি উইলিয়াম্স-এর রচনা তাদের ভালো লাগে নি।

'ডেথ অফ এ সেল্‌স্‌ম্যান' তবু কিছু রেখাপাত করেছে। পল মুনির অভিনয়-নৈপুণ্য না থাকলে এ নাটকের কি পরিণাম হতো বলা কঠিন। কেউ কেউ অবশ্য বলতে ছাড়ে নি, পল মুনি মাঝে মাঝে বড়ো মেলোড্রামাটিক অভিনয় করেছেন, আমেরিকান অভিনেতা হলে যা হয়। আর কেউ কেউ (বিদেশী দর্শক) মরবিড্‌ বলতে ছাড়ে নি। 'হার্ভি' একটি খরগোসের নাম। নাটকের নায়ক অভিনেতা জো ব্রাউন সব সময় মনে করতো একটি খরগোস তার পাশে পাশে রয়েছে। অবশেষে নানা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নায়কের মনের এ অবস্থা দূর করা হলো। সাধারণের মতে এ নাটক গভীর কিছু না হলেও নাট্যকারের প্রচেষ্টা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করা যায়। এমন কি অভিনয়ের শেষে জো ব্রাউন দর্শক-সাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলো, আমেরিকায় হাজার হাজার রাত আমি এ নাটকে অভিনয় করেছি ; কিন্তু লণ্ডনের দর্শকদের মতো এমন প্রাণময় অভ্যর্থনা সেখানে পাই নি।

ইংল্যাণ্ডে আমেরিকান নাটকের চেয়ে ফরাসী নাটক বেশি প্রিয়। যা স্বাভাবিক যা সঙ্গত তাই নিয়ে ফরাসী নাটক এবং সেই কারণে অভিনয়ও সংযত। ফরাসী নাটকে দেখি সাধারণ মানুষের ভিড়, তারা আমাদের যেন একান্ত আপনার। তারা কথা বলে সাধারণ মানুষের মতো, তাদের সব কিছুই আমাদের বড়ো চেনা। আর আমেরিকান নাটকে যে সব চরিত্র দেখি তাদের যেন ঠিক চিনতে পারি না। অনেক সময় রক্তমাংসে গড়া মানুষ বলে তাদের মনে হয় না—তাদের চলা-বলা যেন যন্ত্রের মতো। তাই অভিনয়ও হয় মেলোড্রামাটিক। যে কটি আধুনিক আমেরিকান নাটক দেখেছি তার মধ্যে কখনও কখনও জীবনের স্পন্দন শুনতে পেলেও গোটা জীবনকে পাই নি। তাই মঞ্চের কলাকৌশল মনে রাখবার মতো হলেও বর্তমান আমেরিকান নাটকের চরিত্রগুলি হৃদয়ের খুব কাছে আসে না। ছেলেবেলা থেকে শুনি ফরাসীরা ভাবপ্রবণ, তাদের

উচ্ছ্বাস বেশি, গতি-চঞ্চল জীবনকে ঠিক পথে নিয়ে যেতে তারা অনভ্যস্ত। কিন্তু আধুনিক ফরাসী নাট্যকাররা রঙ্গমঞ্চের জন্যে বিশেষভাবে লেখা সাধারণ নাটকেও যে সংযমের পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা নেই। তাই মঞ্চের কলা-কৌশল সাধারণ হলেও ফরাসী নাটক মনের গভীরে ফুল ফোটায়।

ইংরেজী ফরাসী কিংবা আমেরিকান নাটকে যে অভিনেতা ও অভিনেত্রী লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে সমান অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, তাঁদের মধ্যে ইডিথ এভান্স, সিবিল থর্নডাইক, ময়রা লিস্টার, টৈইণ্ডি হিলার, বেটি অ্যান ডেভিস, ভিভিয়েন লি এবং স্যার লরেন্স অলিভিয়ার, মাইকেল রেডগ্রেভ, হার্বার্ট মারশ্যাল অন্যতম।

ইডিথ এভান্স, সিবিল থর্নডাইক, স্যার লরেন্স ও মাইকেল রেডগ্রেভ—এদের জন্যে আধুনিক লণ্ডন রঙ্গমঞ্চ দিনে দিনে উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। শুধু অভিনয় নয়, জনসাধারণের সুপ্ত সুরুচিকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে তারা নানাভাবে চেষ্টা করে এবং একথা বারবার সংরক্ষণশীল ইংরেজকে বোঝায় যে সমস্ত পৃথিবীর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত না হলে আজ শুধু পিছিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই।

কয়েক বছর আগে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে সিবিল থর্নডাইক তাঁর অভিনেত্রী আত্মীয়া এলিজাবেথ ও হার্বার্ট মারশ্যালের আশ্চর্য উদ্যম মনে রাখবার মতো।

হবোর্নে কনওয়ে হলে এ সভার আয়োজন করেছিলো ইণ্ডিয়া লীগ। সিবিল থর্নডাইক, এলিজাবেথ ও হার্বার্ট মারশ্যাল রবীন্দ্রনাথের নানা রচনার ইংরেজী অনুবাদ থেকে অনেক আবৃত্তি করে আমাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছিলেন এবং তাঁদের উৎসাহ দেখে মনে হয়েছিলো অদূর ভবিষ্যতে লণ্ডন রঙ্গমঞ্চ হয়তো সমস্ত পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠবে।

রাজার দেশের ঝি

সেই ঘটনা থেকেই আরম্ভ করা যাক। কয়েক বছর আগে লণ্ডনের এক নামকরা হোটেলে কোনো ধনী ভারতীয় উঠেছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর নিজের দম্ভ, মানে দেশে কর্মচারী আর ঝি চাকর মোসায়েবের ওপর হুমকি দাপট ফরমায়েশের কথা সেই ভদ্রলোকের পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। এবং বিলেতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোটেলে বসে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করলেন।

একদিন সকালবেলা যথারীতি দরজায় টুকটুক শব্দ করে হোটেলের মেইড ঘর পরিষ্কার করতে এলো। তাকে গুড মর্নিং জানানো দূরের কথা, শুধু একবার মেয়েটির দিকে কটমট করে তাকিয়ে ভারতবর্ষ থেকে আনা সিল্কের দামী স্লিপিংস্যুট পরে ভদ্রলোক সিগারেট টানতে টানতে 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকা পড়তে লাগলেন।

মেইড দু-এক মিনিট তাঁর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বেরিয়ে যাবে কিনা ভাবছিলো, কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎ কি মনে করে উঠে দাঁড়ালেন। ড্রয়ার থেকে একটা পায়রার পালক বের করে ভদ্রলোক আবার নিশ্চিন্ত হয়ে চেয়ারে বসে পড়ে কুকুর ডাকার মতো করে সিস্‌ দিয়ে মেইডকে ডাকলেন, এই শোনো শোনো—

হাঁ করে তাঁর কাছে এগিয়ে এসে মেইড বললো, ইয়েস? তখন ভদ্রলোক সেই পায়রার পালক তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও, এটা দিয়ে আমার কান দুটো এমনি করে বেশ কিছুক্ষণ খুঁচিয়ে দাও দেখি—

ইংল্যাণ্ডের ঝি তার চোদ্দ পুরুষের ইতিহাসে বোধ হয় এমন ব্যাপার কল্পনা করতে পারে নি। আর মনে মনে নিশ্চয়ই সে ভারতীয়দের মুণ্ডুপাত করেছিলো।

কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ না করে পালকটি ফিরিয়ে দিয়ে বিনীত ভাবে বললো, আমাকে মাপ করো, এসব কাজ করার অভ্যাস আমাদের নেই—

কি! বাধা দিয়ে ভদ্রলোক প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, একটা ঝিয়ের এতো বড়ো স্পর্ধা! আমার হুকুম তুমি মানবে না?

কিন্তু ঝি আর তখন সেখানে নেই। ঘাবড়ে গিয়ে সরে পড়েছে। ভদ্রলোক রাগে কাঁপতে কাঁপতে ভাবছিলেন কি করে বেটিকে বোঝানো যায় যে তিনি কে! তিনি ঠিক করলেন আর দেরি নয়, ম্যানেজারকে ব্যাপারটা জানিয়ে তাকে শিক্ষা দিতে হবে।

আবার দরজায় টুকটুক শব্দ। এবার মুখে বিরক্তির সুস্পষ্ট ছাপ নিয়ে ভদ্রলোক গটগট উঠে দরজা খুলে দেখলেন স্বয়ং হোটেলের ম্যানেজার তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

জানো, ভদ্রলোক রীতিমত গলা ছেড়ে বলতে আরম্ভ করলেন, তোমাদের এক অসভ্য ঝি আমাকে অপমান করেছে—

বাধা দিয়ে ম্যানেজার আস্তে আস্তে বললো, আমি সমস্ত শুনেছি। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের নিয়ম-কানুন আলাদা, তাই এক ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে এই হোটেল ছেড়ে দিতে হবে।

কেন? চালাকি পেয়েছো? আমাকে কি অমনি থাকতে দিয়েছো? ম্যানেজার আর একবার বললো, তোমাকে যা বলবার বলে দিয়েছি! আমার হোটেলের লোকেরা যদি স্ট্রাইক করে তাহলে সব দিক দিয়ে মুশকিল হবে—তোমার আর কোনো কাজ এ হোটেলের কোনো চাকর-বাকর করবে না: আর তুমি যদি এক ঘণ্টার মধ্যে না যাও তাহলে আমি হাই-কমিশনারের অফিসে ব্যাপারটা জানিয়ে তাদের সাহায্য নিতে বাধ্য হবো।

ঘটনাটা এখানেই শেষ করা যাক। লঘু পাপে গুরু দণ্ড সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপর ভদ্রলোকের কি হলো, তিনি সত্যি এক ঘণ্টার মধ্যে হোটেল ছেড়েছিলেন কিনা সে কথায় আমাদের আর

দরকার নেই। এতো কথা বলবার উদ্দেশ্য হলো ইংল্যাণ্ডের ঝি-চাকররা আমাদের চোখে ছোটো তুচ্ছ কাজ করলেও সব সময় যে তাদের আত্মসম্মান বজায় রাখবার সুযোগ পায়, তারই সামান্য বর্ণনা দেয়া।

শুধু ভারতীয় ভদ্রলোকের কথা নয়। যে কেউ যদি ঝি-চাকরের ওপর মেজাজ দেখায় তাহলে হয় তাকে ক্ষমা চাইতে হয়, নয় ঝি হারাতে হয়। কিন্তু এমন ঘটনা অবশ্য বর্তমান ইংল্যাণ্ডে বিরল। কারণ, সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়িতে ঝি রাখার প্রশ্নই ওঠে না। যাদের বড় সংসার তাদের ঘর মোছা বাসন মাজা ইত্যাদি কাজের জন্য ঘণ্টা হিসাবে ঝি রাখতে হয়। ঘণ্টায় প্রায় এক টাকা বারো আনা দেওয়ার রীতি। রোজ এতো খরচ করা সম্ভব নয়। তাই অনেকে—যাদের বাড়িতে না রাখলেই নয় অথচ খরচে কুলোয় না তারা সপ্তাহে মাত্র একদিন ঘর বাথরুম ইত্যাদি পরিষ্কার করবার জন্য ঝিয়ের খরচ যোগায়।

অন্য কিছু বলবার আগে সে-দেশের ঝিয়েদের একটু গুণগান করে নেয়া যাক। ভারতীয় ভদ্রলোকের উগ্র স্বভাবের কথা প্রথমেই বলেছি। সেটা হয়তো আমাদের দেশের জলহাওয়ার দোষ। এখানে চাকর-বাকরদের সঙ্গে তম্বি না করলে কাজ করানো কঠিন। একই কাজের কথা অনেকবার বলতে হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একথার প্রমাণ আমরা বার বার পেয়ে থাকি। ও দেশেও এমন হবে—এমনি একটা ধারণা আমাদের মনে থাকা স্বাভাবিক। তাই প্রথম-প্রথম ও দেশে গিয়ে আমরা যখন ঝি-চাকরকে ফরমায়েশ করবার সুযোগ পাই তখন সাধারণত ধরে নি যে ওরাও ফাঁকি দেবে, ঠিকমতো কাজ করবে না, এক কাজের জন্যে বার বার কৈফিয়ত চাইতে হবে।

কিন্তু ভুল ভাঙে সহজেই। সত্যি, ইংল্যাণ্ডের ঝিয়ের কাজের নমুনা দেখে অবাক হতে হয়। কোথাও ফাঁকি দেবার লেশমাত্র

চেষ্টা নেই। এক কাজ দুবার করতে বলবার কথাই ওঠে না। ঘরে টাকাপয়সা দামী জিনিসপত্র ছড়িয়ে বেরিয়ে যান, ফিরে এসে দেখবেন ঝকঝকে তকতকে ঘর, একটি জিনিসও হারায় নি, টাকা-পয়সা যেমনকার তেমনি আছে, ঝি সব সুন্দর সাজিয়ে রেখে ঘর পরিষ্কার করে গেছে। আর কোনো সংসারে যখন ঝি কাজ করতে আসে তখন তার খাতিরের বহর দেখে ঘাবড়ে যেতে হয়। হ্যালো মিস অমুক কি মিসেস তমুক, গুড মর্নিং! কেমন আছো? অ্যাঁ! একটু রোগা হয়ে গেছো যেন। 'ফ্লু' হয়েছিলো! এসো, আমাদের সঙ্গে বসে এক কাপ চা খাও।

তখন হয়তো ব্রেকফাস্টের সময়। ঝিও বসে গেল গোল টেবিলে। বলা বাহুল্য চা ছাড়া অন্য কিছু সে খাবে না, কেউ খেতে বলবেও না। কারণ তাকে তো নেমন্তন্ন করা হয় নি, আর সে জানে যে সে অন্য কিছু খেলে এদের কম পড়ে যাবে। কিন্তু সংসারের আর পাঁচজনের সঙ্গে বসে ঝি যখন চা খায় তখন কে বলবে সে ঝি, ঘণ্টায় এক টাকা বারো আনা নিয়ে দু ঘণ্টার জন্যে কাজ করতে এসেছে। তার মনুষ্যত্ব, তার আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে ইংল্যাণ্ডের আপামর জনসাধারণ সব সময় সতর্ক এবং সচেষ্ট।

কিন্তু আগে যা বলছিলাম। দেশের ঝি-চাকরের ওপর মেজাজ খারাপ করার প্রশ্নই উঠে না। আর যেহেতু স্বাধীন দেশ তাই তাদের মনুষ্যত্বের মূল্যও কড়ায়গণ্ডায় (শিলিং-পেন্সে বলাই ভালো) চুকিয়ে দেওয়া হয়। এতো বেশি দেয়া হয় যে আমাদের চোখে একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় যেন।

যেটুকু বললাম সেইটুকুই বোধ হয় যথেষ্ট। এখন দূর থেকে পাঠক সাধারণ হয়তো মনে করবেন, কী সুখেই আছে ওখানকার ঝি-চাকর। ঘণ্টায় এক টাকা বারো আনা—হোটেলে কিংবা রেস্তোরাঁয় কাজ করলে সপ্তাহে তিন পাউণ্ড থেকে পাঁচ পাউণ্ড যে দেশে ঝি চাকরের উপার্জন, সে-দেশে ঘর ঝাঁট দিয়েও লাভ।

তাছাড়া কথায় কথায় টিপ্‌স্‌ মানে বকশিশের ব্যাপার তো আছেই। ছোটো কাজ করলেও যে দেশে সমাজের চোখে আমি ছোটো নই আর আমার সামাজিক মর্যাদা অন্য যে কোনো লোকের চেয়ে কম নয় তাহলে বলা বাহুল্য কোনো কিছু নিয়ে সহসা আমার আপত্তি তোলার কথাই উঠতে পারে না।

মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজে। মুখ মিষ্টি আর সৌজন্যের বড়াই বোধ হয় ধনী ইংরেজের মতো আর কোনো জাত করতে পারে না। বস্তুত, কারুর কাছ থেকে মধুর ব্যবহার পেলে তার জন্যে আমরা নিজের অজ্ঞাতে চরম ক্ষতি হয়তো স্বীকার করে নিতে পারি। এমনকি অমায়িক ব্যবহারের বাড়াবাড়িতে আর মনুষ্যত্বকে সম্মান করবার অলীক অভিনয়ে মানুষের এতো বেশি বিভোর হয়ে থাকা স্বাভাবিক যে সে তার জন্মগত দাবির কথাও ভুলে থাকতে পারে।

বিদেশীর কাছে ঝি-চাকরের ওপর ইংরেজের ব্যবহার বিস্ময়ের কথা বৈকি! সত্যি কথা বলতে গেলে জীবনে তাদের চাইবার আর কি থাকতে পারে! আমাদের দেশের তুলনায় তাদের আয় প্রচুর, যে কোনো হোটেলে যে কোনো লোকের পাশে বসে তারা খুশিমতো খেতে পারে। সর্বত্র তাদের অবারিত দ্বার। ঝি-চাকর বলে কেউ তাদের এতোটুকু অবহেলা করবে না।

বিদেশী এই দেখেই তাজ্জব বনে যায়। শুধু বিদেশী কেন, ইংল্যাণ্ডের ঝি-চাকররা তাদের পাওনা নিয়ে কখনও প্রতিবাদ জানিয়েছে বলে আমার জানা নেই। এমনকি, মনে হয়, তারা নিজেদের অবস্থায় খুশি আছে।

কিন্তু মধুর ব্যবহারে মন খুশি থাকলেও পেট ভরে না। মন খুশি আছে বলে এরা তেমন করে প্রতিবাদ জানাবার সুযোগ পায় না বটে, কিন্তু হয়তো নিজেদের অজ্ঞাতে ধাপে ধাপে অন্য দিক দিয়ে অনেকখানি নেমে যায়।

এবার সে কথা আরম্ভ করি। সত্যিই তো আমাদের দিক

থেকেও কোনো আপত্তি উঠতে পারে না। একজন ঝি যদি মাসে দুশো ষাট-পঁয়ষট্টি টাকা মাইনে পায় তাহলে বলবার আর কি থাকতে পারে। সে তো আমাদের দেশের খরচের তুলনায় রীতিমতো বড়লোক।

কিন্তু দেশের নাম ভারতবর্ষ নয় ইংল্যাণ্ড। আর একথা আমাদের অজানা নেই যে আমাদের দেশের তুলনায় সে-দেশের আয় অনেক বেশি হলেও ব্যয়ের মাত্রাও বেশি। কাজেই আমাদের দেশের ঝিয়ের কাছে ঘণ্টায় এক টাকা বারো আনা কিংবা মাসে দুশো ষাট টাকা প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো সংখ্যা হলেও সে-দেশের খরচের মানদণ্ডে সে-সংখ্যা ততোখানি নয়।

আরও একটি কথা। এদেশের ঝিয়েদের জাত আলাদা। তারা আধপেটা খেয়েও দিন কাটায়, মাদুর বিছিয়ে শোয়, ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপে। এতে তারা অভ্যস্ত। তারা এতোদিন জানতো এই তাদের পাওনা, এমনি করেই জীবনের শেষ দিন অবধি তাদের কাটাতে হবে। তারা গরিবের পর্যায়ে পড়ে, এতোদিন সমাজ তাদের কোনো স্বীকৃতি দেয় নি। ছোটোলোক বলে এক কোণায় ঠেলে রেখেছিলো। আজ দেশের হাওয়া বদলেছে, তারাও বুঝেছে মানুষের মতো বেঁচে থাকবার তাদেরও পূর্ণ অধিকার আছে; আর খুব আস্তে আস্তে হলেও নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে তারা সচেতন হচ্ছে। এমনকি মাঝে মাঝে তাদের সবল প্রতিবাদে অনেক গৃহস্থের পিলে চমকে উঠছে।

কিন্তু ভেবে দেখুন বাড়ির ঝি-চাকরের সবল প্রতিবাদ কতো সহজ উপায়ে বন্ধ করা যায়! আর মনে হয় তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো তাদের আর্থিক অনটনের কথা তুলে কোনোদিনও তারা মাইনে বাড়াতে বলে আপনাকে আর বিব্রত করবে না। অন্য যে কোনো উপায়ে তারা তাদের অভাব পূরণ করে নিতেও দ্বিধা করবে না।

অর্থাৎ, আপনি যদি তাদের সঙ্গে ধনী ইংরেজের মতো ব্যবহার

করেন। হেসে কথা বলেন—আপনার সঙ্গে চা খেতে বলেন; মানে তানানা এটা ওটা করে কোনো রকমে তাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন আপনি আর সে দুজনেই মানুষ এবং পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের দাবি দুজনেরই সমান। ব্যস্ বাজিমাত। অথচ অন্যদিকে আপনি কিন্তু খুব হুঁশিয়ার। নিজে ঝিয়ের সঙ্গে প্রেম করবার কথা ভাবতেও পারবেন না, ছেলে ঝি কিংবা তার মেয়েকে বিয়ে করলে মারমুখো হবেন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কোনো বোকা মেয়ের প্রসঙ্গ উঠলে তাকে ব্যঙ্গ করে বলবেন, ওর বিদ্যে-বুদ্ধি একটা ওয়েট্রেসের মতো। অথচ আশ্চর্য তবু ঝি-চাকরেরা বুঝতে পারে না, তারা বছরের পর বছর যুগের পর যুগ কী ভাবে ঠকে আসছে!

ইংল্যাণ্ডের ঝি-চাকরের সঙ্গে সে দেশের লোকের ব্যবহার দেখে প্রথমে শুধু বিস্মিতই হই নি—দেশবাসীকে মনে মনে অজস্র প্রশংসা করেছিলাম এবং বলতে সংকোচ নেই, মানুষকে আরও বেশি করে সম্মান করতে শিখেছিলাম।

কিন্তু আস্তে আস্তে চোখের সামনে থেকে যখন বিস্ময়ের পর্দা সরে গেলো এবং ইংল্যাণ্ডের হালচাল বুঝে সেখানকার ঝি-চাকরদের অবস্থার আসল রূপ যখন দেখতে শিখলাম তখন মনে হলো বঞ্চিতকে কৌশলে আত্মবিস্মৃত করে রাখা হয়েছে।

প্রথম কথা, খরচ সেখানে উপার্জনের তুলনায় বেশি। দ্বিতীয়ত, ঝি-চাকর রীতিমতো সম্মান পায় এবং বলা বাহুল্য এ ফাঁকা সম্মান মারাত্মক কারণ তা তাদের আয় বাড়ায় না কিন্তু ব্যয় বাড়ায়। যেমন তাকে অন্য আর একজন মধ্যবিত্তের মতো বাঁচতে হয়, তাদের মতো ব্যালে অপেরা দেখবার সাধ জাগে আর ভদ্রসমাজে যার সমান সম্মান তার জামা-কাপড়ও ভালো হওয়ার দরকার। ফল হয় এই যে, তার চালচলন হয় মধ্যবিত্তের মতো এবং ঠাট বজায় রাখতে ঘটের দরে মনসা বিকিয়ে যায়। তবু সে খুশি, কারণ সম্মান তো পাচ্ছে! অর্থাৎ উপায় নেই, কারণ তার মন বেশ কায়দা করেই

মাতিয়ে রাখা হয়েছে। নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে সহজে সে ব্যগ্র হতে পারবে না।

অথচ লোভ তার দিনে দিনে বেড়েই যাচ্ছে। সে আরও ভালো খেতে চায়, আরও ভালো পরতে চায়, আরও ঘন ঘন সিনেমা-থিয়েটারে যেতে চায়।

কিন্তু সব সাধ তার পক্ষে একা মেটানো সম্ভব নয়, তাই তাকে নির্ভর করতে হয় বন্ধুবান্ধবের ওপর। সেদিকেও হয় মুশকিল, কারণ একজন ঝিয়ের বন্ধুর আয় প্রায় তারই মতো। ফলে মধ্যবিত্ত অভ্যাসের জন্য তাকেও হিমসিম খেতে হয় এবং এক বন্ধুকে নিয়ে ঝিও সন্তুষ্ট থাকে না। তার পাঁচ বন্ধুর দরকার হয়।

এমনি করেই মন পুড়ে যায়, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস শিথিল হয় এবং সংসারে অশান্তি আসে। তাই দেখা যায় অর্থের জন্যে ইংল্যাণ্ডের এই সমাজে পারিবারিক অশান্তি প্রবল এবং কথায় কথায় সংসার ভেঙে যায়। আর ইংরেজ মুখ বাঁকিয়ে বলে আমাদের সমাজে ডির্ভোস ছোটোলোকদের মধ্যেই বেশি হয়।

ওপর ওপর ঝি-চাকরদের যথেষ্ট খাতির করা হলেও ইংল্যাণ্ড-বাসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে বুঝতে পেরেছি মনে মনে প্রভেদের বিরাট প্রাচীর তোলা রয়েছে। বিয়ে-বন্ধুত্বের ব্যাপারে এই শ্রেণীর লোকদের ওপরতলার লোকেরা সযত্নে এড়িয়ে যায়। অর্থাৎ একেবারে পরিষ্কার ভাবে না বললেও সুবিধাবাদীর সমাজ কৌশলে বুঝিয়ে দেয় যে কার কোথায় স্থান।

তবু আশার কথা আজ আস্তে আস্তে একটা আলোর রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পৃথিবীর হাওয়া বর্তমানে এমনি যে শুধু ধাপ্পা দিয়ে কাজ গুছিয়ে নেয়া অত্যন্ত কঠিন।

প্রথম কথা জীবনে আরও বেশি আনন্দ পাবার জন্যে বন্ধু বাছাই করবার সময় ইংল্যাণ্ডের এই সমাজ খুব একটা বাছবিচার করবার

অবসর পায় না। বরং যে ঝিয়ের জন্য বেশি ব্যয় করতে পারে সে নির্বিচারে তাকেই বন্ধুত্বে বরণ করে নেয়।

বলা বাহুল্য ওই সমাজের একজন লোকের চেয়ে প্রবাসী ভারতীয়ের ব্যয় করবার ক্ষমতা অনেক বেশি এবং রাজার দেশের ঝিয়ের জন্যে সে তাই করেও থাকে।

বিলিতি ঝিয়ের সঙ্গে ভারতীয় ভদ্র সন্তানের মাখামাখির কথা নিয়ে হাসাহাসি করি। কিন্তু অন্য আর একদিক দিয়ে ভেবে দেখলে এতে এক ঢিলে দুই পাখি মরে এবং দুইজনেরই মনের পরিবর্তন তাদের ঘুণ-ধরা সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে দেয়।

শিক্ষিত ইংরেজের সঙ্গ পাওয়া ইংরেজ ঝির পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু অন্য দেশের লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের সঙ্গে তার মন-জানাজানির সুযোগ প্রায়ই হয়। কারণ বিশেষ করে নিগ্রো ও ভারতীয়—যত বড়ো ঘরের ছেলে হোক না কেন, বিলেতে তাদের কালো রঙের জন্য সেখানকার সমাজে প্রচণ্ড ধাক্কা খায় এবং নানা অপমানও সহ্য করে। কিন্তু তাদের অর্থের প্রাচুর্যের জন্যে তারা দরিদ্রের সংসারে সহজেই প্রবেশ করতে পারে।

বিলিতি তথাকথিত উচ্চসমাজে বর্ণের জন্যে আঘাত পাবার পর ধনী বিদেশীর চোখে তার নিজের সমাজেরই একটা স্বার্থপরতার রূপ প্রকট হয়ে ওঠে এবং সে অন্য জায়গায় সমবেদনার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।

তারপর এক সময় ঝিয়ের দেখা মেলে। কেননা অন্য কেউ তার রঙের গর্বের জন্যে বিদেশীর সঙ্গে মনের আদানপ্রদানের পথ সহজে সুগম করবে না। কিন্তু এই দেখা হবার ফলে লাভ হয় দুই পক্ষের। এতোদিন পর বিলিতি ঝি সত্য শিক্ষিত লোকের কাছ থেকে পৃথিবীর অনেক তথ্য জানতে পারে এবং বিদেশীটি গভীর সমবেদনায় সেই ঝির দুঃখ-বেদনার আশা-আনন্দের ভাগ নেবার চেষ্টা করে। আর সমাজের এই লাভ হয় যে অজস্র বঞ্চনার মাঝখানেও আস্তে আস্তে আন্তর্জাতিক একতা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়।

লণ্ডনে প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে কয়েকটি দিন

সেদিনও অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ লণ্ডনে পৌঁছলেন না। ১৯৪৮ সালের মহাষ্টমী। ঠিক ছিলো, এ বছর বাংলা সাহিত্য সম্মিলনীর বিজয়া উৎসবে অধ্যাপক মহলানবীশ হবেন প্রধান অতিথি। যদি তিনি যথাসময়ে লণ্ডনে উপস্থিত না থাকেন, তাহলে ভারতের হাই-কমিশনার কৃষ্ণ মেননকে তাঁর আসনে বসাবার আয়োজন করা হবে কি না, সে সম্বন্ধে আজ ইণ্ডিয়া লীগে আলোচনা হবার কথা। কৃষ্ণ মেনন বাংলা জানেন না, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ বাংলা সমিতির অসংখ্য অবাঙালী সভ্য বলে প্রধান অতিথির অভিভাষণ সাধারণত ইংরেজীতেই হয়ে থাকে।

স্ট্র্যাণ্ডে ইণ্ডিয়া লীগ অফিসে পৌঁছতে আমার অনেক দেরি হয়ে গেলো। এই অক্টোবরে ভারি ঠাণ্ডা পড়েছে—কুয়াশাও হয়েছে গভীর। হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে লোকের ঘাড়ে পড়ে কতবার যে 'সরি' বলতে হয়েছে, তার ঠিক নেই। ইণ্ডিয়া লীগের জীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে শুনতে পেলুম বিজয়া-উৎসবের মহড়া এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে—

"যদি মাতে মহাকাল উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত ঢেউ ওঠে উত্তাল
হয়ো নাকো শঙ্কিত তালে তার দিও তাল
জয় জয় জয় গান গাইও—"

এ সময় ঘরের দরজা খুলে তাল কেটে দিতে ইচ্ছে হলো না। তাই পাশের নির্জন অফিস ঘরে গিয়ে আলো জ্বাললুম। আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে উঠলো, অন্ধকারে গান শুনতে ভালো লাগে না?

চমকে পেছনে ফিরে মিঃ বড়ুয়াকে দেখে খুশি হলুম। চুপ করে গালে হাত দিয়ে বসে মৃদু মৃদু হাসছেন।

একি, আপনি ওঘরে যান নি যে? কতোক্ষণ এসেছেন?

অনেকক্ষণ—

যমুনা দেবী?

দু-এক মিনিট কান পেতে শোনবার ভান করে মিঃ বড়ুয়া উত্তর দিলেন, ওই শুনতে পাচ্ছেন না? মহাকালের তালে তাল মেলাচ্ছেন—

কিন্তু আপনি এখানে একা বসে আছেন কেন?

ভয়ে, কারণ ওরা আমাকেও কোরাসে টানতে চেয়েছিলো।

রেহাই পেলেন কেমন করে?

শরীরের দোহাই দিয়েছি, কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন বসুন। সেই পরিচিত হাসি হেসে মিঃ বড়ুয়া খালি চেয়ারের দিকে হাত দেখালেন।

আপনার শরীরের অবস্থা এখন কেমন?

ভালোই, তবে মাঝে মাঝে বড়ো দুর্বল লাগে। কিছুদিন আগে একবার টিউবে একা বেরিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাই—কিন্তু অসুখের কথা আর নয়—কথা শেষ না করে মিঃ বড়ুয়া মুখ ভরিয়ে দিলেন সরল হাসিতে।

এখন কি থাকবেন এদেশে কিছুদিন?

না, এমাসের শেষে ফিরবো—আপনি?

নিয়ে চলুন না আপনাদের সঙ্গে—

কথার উত্তর না দিয়ে হেসে তিনি বললেন, সিগ্রেট খান। তারপর চেয়ারে দেহ আরও শিথিল করে ওপরে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়ার রিং করবার চেষ্টা করে বলে গেলেন, আবার আসতে হবে এদেশে—

আপনি তো প্রায়ই আসেন।

হ্যাঁ, কিন্তু যে কাজগুলো করতে চাই, সেগুলো পাকাপাকি করবার জন্যে বোধ হয় আরও অনেকবার আসা-যাওয়া করতে হবে, ভাবছি আসছে বছরে আসবো আবার—

দেশে থাকতে শুনেছিলাম, ছবি থেকে খাবারের কিংবা আরও নানা গন্ধ যেন দর্শক পায়, আপনি সেই বিষয় নিয়ে নতুন একটা আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন—

খুব জোরে হেসে তিনি বললেন, না না, আমার ছুটো প্ল্যান আছে—এদেশে আমাদের ছবি নিয়ম করে দেখাবার ব্যবস্থা করা আর এই লণ্ডনেই স্যুটিং করে বাংলা আর হিন্দীতে একটা ছবি তোলা—

তাহলে ত অদ্ভুত কাণ্ড হয়। এখানে ইণ্ডিয়ানদের জীবন নিয়ে গল্প হবে নাকি ?

না না, মাথা দোলালেন মিঃ বড়ুয়া, আমার সঙ্গে এ বিষয়ে এদেশের কয়েকজন ডাইরেক্টরের আলোচনা হয়ে গেছে—হিস্‌টোরিক্যাল ছবিই ঠিক করেছি।

বই ঠিক করেছেন নাকি ?

না, অতোদূর কাজ এগোয় নি তো এখনও, একটু ভেবে তিনি বললেন, আমাদের দেশ থেকে কাউকেই আনবো না, প্রত্যেককে এখান থেকে ধরবো—

কিন্তু অ্যাক্টর-অ্যাকট্রেস্ ?

সব এখান থেকেই হবে।

বলেন কি ? এখানে অভিনয় করবার মতো ইণ্ডিয়ান কজন আছেন ?

মিঃ বড়ুয়া হেসে বললেন, আপনারা সকলেই আছেন—রাজী ?

এক্ষুনি, কিন্তু আমরা অভিনয় করলে দেখবে কে ?

রাজা-উজীর সাজতে পারলে সকলেই দেখে বৈকি। সেই জন্যেই তো হিস্‌টোরিক্যাল বই করা ঠিক করেছি, এতো গম্ভীর হয়ে মিঃ বড়ুয়া কথাগুলি বললেন যে, আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না, তিনি ঠাট্টা করছেন কি—না।

এক সময় বুঝতে পারলুম পাশের ঘরের দরজা খোলা হলো।

আমাদের অনেক বন্ধু-বান্ধবেব সঙ্গে যমুনা দেবীও এ ঘরে এলেন। আজকের মতো রিহার্স্যাল শেষ হলো।

মেয়েদের দেখে তাড়াতাড়ি মিঃ বড়ুয়া উঠে দাঁড়ালেন। কেউ বলবার আগেই আমাদের সকলের দিকে তিনি বললেন, এখন কি প্রোগ্রাম আপনাদের ?

আমাদের প্রোগ্রাম তো এইমাত্র শেষ হলো, এবার বলুন আপনার কি প্রোগ্রাম ?

এই সবাই মিলে একটু একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে চাই, কারণ—

বলুন বলুন।

না থাক—

আরে কি আশ্চর্য, মিঃ বড়ুয়া আপনি যেন লজ্জা পাচ্ছেন মনে হচ্ছে—

সলজ্জ হাসি হেসে এবার তিনি বলে ফেললেন, আজ আমার জন্মদিন।

বলেন কি ? এই কথাটা বলতে আপনি সঙ্কোচ করছিলেন, অনেকে এক সঙ্গে বলে উঠলো, চলুন আমরাই আজ খাওয়াবো আপনাকে, আসুন যমুনা দেবী—প্রচণ্ড হট্টগোল করতে করতে আমরা ইণ্ডিয়া লীগ থেকে বেরোলাম।

সেই শীতের রাত্তিরে কুয়াশা-থমথম করা রাস্তায় একদল ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে সারা ভারতের অতিপ্রিয় নট প্রমথেশ বড়ুয়াকে দেখলে কারুরই মনে হতো না যে তিনি ছাত্রদের একজন নন।

মিঃ বড়ুয়া জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবেন ?

আপনার কি খেতে ইচ্ছে করছে ? দিশি না বিলিতি ?

না না বিলিতি নয়, দিশি অনেক ভালো।

যমুনা দেবী হাসলেন, ডাক্তার যা করতে বারণ করেন, উনি তাই করেন, ঝালঝোল খাওয়া ওঁর উচিত নয়—

বাধা দিয়ে মিঃ বড়ুয়া উদাসভাবে শুধু বললেন, উচিত ? এই কুয়াশায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁপা কি উচিত ? আজ যে আমার জন্মদিন—

আমরা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম, Many happy returns.

গোটা তিন-চার ট্যাক্সি ভাড়া করে স্ট্র্যাণ্ড থেকে কেম্ব্রিজ সার্কাসের 'রাজা' রেস্টুরেন্টে পৌঁছতে আমাদের মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগলো। দুটো বড়ো বড়ো টেবিল জোড়া দিয়ে আমরা একসঙ্গে বসলাম—মাঝখানে পাশাপাশি মিঃ বড়ুয়া ও যমুনা দেবী।

মিঃ বড়ুয়া বললেন, বাঃ দিশি খাবারের গন্ধ বেশ লাগছে তো— ,তা

শোক চট্টোদেশে আমাদের সাহেব সাজতে বড়ো ভালো লাগে, পর যখন শেষ ্যাপারে সাহেব সাজা বড়ো কঠিন।

অর্থাৎ সকলে , একটু উসখুস করে তিনি বললেন, কই, খাবার আনতে কিছুতেই রা দেরি করছে যে—

যমুনা দেবী হেসে বললেন, তুমি কতো খাবে আমরা জানি।

সত্যি, তিনি খুবই কম খেলেন! বলতে গেলে কিছুই খেলেন না।

যমুনা দেবী জানালেন, বাড়িতেও তিনি নাকি অমনি পাখির মতো আহার করেন, ভোজনে তাঁর রুচি একেবারেই নেই।

কিছু বলুন মিঃ বড়ুয়া ?

কি বলবো ?

জন্মদিনের বাণী ?

নির্ভয়ে বলবো ?

নিশ্চয়ই !

এবার তিনি প্রত্যেকের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, বাংলা সাহিত্যে কিচ্ছু হচ্ছে না—একেবারে রাবিশ—

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আর বাংলা ছবি ?

খুব জোরে হেসে তিনি বললেন, বোকা বনে গেলেন তো—সাহিত্য যদি রাবিশ হয়, তাহলে ছবি তো মানে—বুঝলেন ? তাই ছবি খারাপ হলে সব সময় সাহিত্যিককে দায়ী করবেন—ডাইরেক্টারকে নয়।

কিন্তু ভালো লেখকের ভালো বই যখন—

যমুনা দেবী বাধা দিয়ে বললেন, আহা, আজ ওঁর জন্মদিন।

তাই ভাবছি একটা কবিতা লিখবো।

সে কি মিঃ বড়ুয়া, আপনি কবিতা লেখেন নাকি ?

হঠাৎ উদাস হবার ভান করে তিনি বললেন, ওটাই জীবনে বাকি আছে—তাই আজ লিখবো ভাবছি।

সবাই বলে উঠলো, কি লিখবেন, বলুন না শুনি ? জ্ঞা পাচ্ছেন

বলবো ?

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ন, আজ আমার

ভয়ে না নির্ভয়ে ?

নির্ভয়ে।

রিয়েলি ? কিন্তু একটা বিপদের কথা আছে যে—মানে আমাদের মধ্যে এখানে দু-একজন কবি-টবি আছেন কিনা—

কেউ নেই মিঃ বড়ুয়া, আমি আরও পাঁচ-ছ চামচ পোলাউ প্লেটে তুলে নিয়ে বললাম, এখানে সব গদ্য-লেখক !

চলুন, সকলে একদিন পিকনিক করতে যাই—

আগে কবিতা বলুন।

মিঃ বড়ুয়া আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কবির অভিনয় করে বললেন, হোটেলে কবিতা হয় না, যেদিন পিকনিক করতে যাবো, সেদিন হবে—গাছের ছায়ায় খোলা আকাশের নিচে—বলুন কবে পিকনিকে যাওয়া হবে ?

সেই রাত্তিরেই পিকনিকে যাবার দিন ঠিক হয়ে গেল।

অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ ঠিক দিনই লণ্ডনে এসে পড়লেন। কাজেই প্রধান অতিথির ভাবনা আর কাউকে ভাবতে হলো না। মনের মতো লোককে পেয়ে আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হলাম।

হর্বোন হলে বাংলা সাহিত্য সম্মিলনীর উৎসব শুরু হয়ে গেছে। গল্প, কবিতা, গান একের পর এক শোনা যেতে লাগলো। একেবারে সামনে বসে আছেন অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ, অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং প্রমথেশ বড়ুয়া। তাঁকে আজ বড়ো ছেলেমানুষের মতো দেখাচ্ছে, আর তাই মনে হচ্ছে তিনি যেন অন্যান্য দিনের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। শুধু ভারতীয়দের নয়, অনেক ইউরোপীয় অতিথির কৌতূহলী চোখ তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছে।

অশোক চট্টোপাধ্যায় ও প্রশান্ত মহলানবীশের সারগর্ভ বক্তৃতার পর যখন শেষ কোরাস গাওয়া হবে, তখন কোলাহল জাগলো, অর্থাৎ সকলে মিঃ বড়ুয়ার কথা শুনতে চান। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। জেদী ছাত্রদের ঠেকাবে কে? তাই অবশেষে মিঃ বড়ুয়াকে উঠতেই হলো। তিনি মুখে সেই হাসি নিয়ে একেবারে স্টেজের সামনে এগিয়ে এলেন। তারপর অনেক বিদেশীর ভিড় হয়েছে বলে অন্যান্য বক্তাদের মতো ইংরেজীতে বলতে আরম্ভ করলেন, আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহলানবীশের সামনে কিছু বলতে হবে ভেবে আমি বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছি, আর আপনাদের সকলকে সামনে দেখে কেমন করে আরম্ভ করবো, তাও ভেবে পাচ্ছি না। কথা তৈরি করা তো আমাব কাজ নয়— আমার যা কাজ তাতে এতো লোকও সামনে থাকে না। আশা করি, প্রথমেই আমার এই মুহূর্তের অসহায় অবস্থার কথা দয়া করে বুঝে নেবেন। আজ বাংলা সাহিত্য সম্মিলনীর এই বিজয়া উৎসবে আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে পেরেছি বলে নিজেকে সত্যিই সৌভাগ্যবান মনে করছি। সাত হাজার মাইল দূরে আমাদের

জাতীয় উৎসব এমন করে যাঁরা সার্থক করে তুললেন, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই ছাত্র-ছাত্রী বন্ধুদের আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জীবনে অনেক লোকের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু আপনাদের কাছে একথা বলতে পেরে ভালো লাগছে যে, ছাত্রদের সঙ্গে থাকলে আমি যেন নতুন শক্তি পাই, কারণ আপনারা সব সময় আমাকে যৌবনের গান শোনান—

কয়েকদিন পর এক হালকা রোদ্দুর-ওঠা সকালবেলা ওয়েস্ট বোর্ন পার্ক রোড (মিঃ বড়ুয়ার বাড়ি) থেকে আমরা হ্যাম্পস্টেড হীথে পিকনিক করতে বেরিয়ে পড়লাম। খাবার-দাবার যে যার সঙ্গে নিয়েছিলো, তা ছাড়া যমুনা দেবীও অনেক আয়োজন করেছিলেন।

ওয়েস্ট বোর্ন পার্ক রোড থেকে হ্যাম্পস্টেড হীথ বেশি দূর নয়, আমাদের পৌঁছতে দেরি হলো না। পিকনিক করবার জায়গা বটে—সুদূরবিস্তৃত মাঠ, এপাশে ওপাশে অসংখ্য গাছের সারি, কতো রকম ঢিবি আর মাঝে মাঝে পুকুর। এই হ্যাম্পস্টেড হীথের ভেতরেই কয়েকটা বাড়ি আছে—রাত্তিরে তার আলো লাইটহাউসের মতো জ্বলে। দোকান-বাজার বেশ দূরে বলে যারা হ্যাম্পস্টেড হীথের ভেতর বাস করে, তাদের সব সময় কেনাকাটার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়।

প্রথমে খেলা আরম্ভ হলো। গাছের ভাঙা ডাল দিয়ে তৈরি হলো ব্যাট আর রবারের একটা বল আমরা সঙ্গে করে এনেছিলাম। বড়ুয়া সাহেব ভাঙা ডালের ব্যাট নিয়ে কেবলই এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছেন। খেলতে গেলে যে একটা বলের দরকার, সেকথা তাঁর খেয়াল নেই।

যমুনা দেবী থেকে থেকে হাঁ হাঁ করে উঠছেন, আঃ তুমি অতো লাফালাফি কোরো না—শরীর খারাপ হবে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা।

মিঃ বড়ুয়া, আপনার যে আজ কবিতা লেখার কথা।

My goodness, আমার এখন মুড নেই—

ছাত্রদের সব ব্যাপারেই মিঃ বড়ুয়ার উৎসাহ ছিলো সবচেয়ে বেশি। এমনভাবে কতোবার তিনি আমাদের সঙ্গে হৈ হৈ করেছেন তার ঠিক নেই। নিজে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে লণ্ডনের সেই প্রচণ্ড শীতেও তিনি যেন আমাদের মাতিয়ে রাখতেন।

শুধু তাঁর উৎসাহ ছিলো না মাত্র একটি ব্যাপারে, নিয়ম করে রোজ রোজ কিছুতেই তিনি ডাক্তারের বাড়ি যেতে চাইতেন না। ও ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ ছিলো যমুনা দেবীর। আমাদের সামনেই কথা হতো।

কাল তাহলে, মিঃ বড়ুয়া বললেন, স্কেটিং দেখতে যাওয়া যাক—

যমুনা দেবী বাধা দিলেন, না ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

সে তো আজ গেলাম।

কালও যেতে হবে।

ও বাবা, সে হয় না।

খুব হয়।

কিন্তু আমি তো বেশ ভালো আছি।

তবু তোমাকে রোজ এখন নিয়ম করে ডাক্তারের বাড়ি যেতে হবে।

নিয়ম কি আমি মানি?

যমুনা দেবী কথা না বলে মুচকি হাসলেন। কথা তিনি খুবই কম বলতেন।

আমি হেসে বললাম, যমুনা দেবী আপনার খুব মুশকিল হয়েছে বলুন?

না না, মুশকিল আর কি—

মিঃ বড়ুয়া কথা শেষ করে দিলেন, ওঁর বড়ো ভাবনা হয়।

যমুনা দেবী স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, তা হয়।

ডাক্তার কি বললেন ?

চিকিৎসা তো চলেছে।

কিছুদিন হাসপাতালে থাকলে ভালো হয় না ?

শিউরে উঠে মিঃ বড়ুয়া বললেন, অসম্ভব, আমি কিছুতেই হাসপাতালে যেতে পারবো না—গেলে সেখান থেকে পালিয়ে যাবো—

শুনলেন তো ? উনি ওই রকম।

সে-বছর নয়। গত বছর মিঃ বড়ুয়া আবার লণ্ডনে গিয়েছিলেন। যমুনা দেবী সঙ্গে ছিলেন না। এবার মিঃ বড়ুয়া তাঁর দিদি শ্রীমতী নীলিমা দেবীর সঙ্গে থাকতেন।

হঠাৎ একদিন ইণ্ডিয়া হাউসে সাড়া জাগলো শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া সত্যি হাসপাতাল থেকে পালিয়েছেন। ইংল্যাণ্ডের হাসপাতালের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটে নি। সে-দেশের লোক রীতিমতো অবাক হয়ে গেলো। বিনা খরচে প্রচুর আরামে থাকা যায় বলে রোগ সেরে গেলেও হাসপাতাল থেকে ইংল্যাণ্ডের লোক সহজে বেরিয়ে আসতে চায় না। তারা বলাবলি করলো, ইণ্ডিয়ান প্রিন্সের কাণ্ডই আলাদা, ওদের মেজাজ বোঝা সহজ নয়, বুঝলে হে নার্স ?

নার্স মাথা নেড়ে জানালো, বুঝেছে।

মিঃ বড়ুয়াকে কোথাও পাওয়া গেলো না। নীলিমা দেবী আর তাঁর ছেলে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ছাত্রমহলে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেলো।

সন্ধ্যেবেলা বড়ুয়া সাহেব হাসতে হাসতে ফিরে এলেন। তিনি নাকি ব্রাইটনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তার হঠাৎ সমুদ্রের হাওয়া খাবার সাধ হয়েছিলো।

যমুনা দেবী নেই বলেই আপনি এতো বাড়াবাড়ি করছেন ?

বাড়াবাড়ি ? যাঃ—

চলুন আবার হাসপাতালে—

শান্ত ছেলের মতো তিনি বললেন, চলুন।

তাঁকে দেখলেই আমাদের যমুনা দেবীর কথা মনে পড়তো।

লণ্ডনে দিনকয়েকের আলাপে আমরা মিঃ বড়ুয়াকে যতো ভালোবেসেছি ঠিক ততো শ্রদ্ধা করেছি যমুনা দেবীকে। মিঃ বড়ুয়ার অসুখ অনেকদিনের—শুনেছি এক মুহূর্তের জন্যেও যমুনা দেবীর সেবায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটে নি। তাঁর মঙ্গলকামনায় তিনি সবকিছুই তুচ্ছ করেছেন। আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি তাঁর ভালোবাসায় এতটুকুও ফাঁকি ছিলো না। কথা তিনি বেশি বলতেন না কিন্তু মিঃ বড়ুয়ার আরোগ্যের জন্য তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠতো নীরব ব্যাকুলতা। স্বামীর সুখ-দুঃখ যার কাছে সমান, যে শুধু আনন্দদিনের সঙ্গিনী নয়, স্বামীর কল্যাণ-কামনায় যার চোখে রাত্রিদিন জ্বলে মঙ্গলের আলো—তাকে বাংলাদেশ চিরকাল কী চোখে দেখে এসেছে ?

সেকথা আর নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই।

আমরা অবাক হয়ে বলবো, কী আশ্চর্য। আর যাঁদের কল্পনাশক্তি প্রবল তাঁরা গালে হাত দিয়ে ভাববেন, হায়, লেখার রোগই যখন ধরলো তখন একজন ইংরেজ লেখক হয়ে জন্মাতে পারলাম না কেন।

যেদেশে একটি কবিতা লিখে দশ পাউণ্ড—প্রায় একশো চল্লিশ টাকা—একটি ছোটো গল্প লিখে পঁচিশ পাউণ্ড—মানে প্রায় তিনশো চল্লিশ টাকা আর একটি গোটা উপন্যাস লিখে কম করে দুশো পাউণ্ড পাওয়া যায়—সে দেশের কথা শুনে আমাদের দেশের দারিদ্র্য-দীর্ণ লেখকদের বিলক্ষণ ব্যাকুল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক বৈকি।

আমি সাধারণ ইংরেজ লেখকের পারিশ্রমিকের একটা মোটামুটি নমুনা দেবার চেষ্টা করছিলাম। বস্তুত, ছেলেবেলা থেকে নানা লোকের মুখে আর অনেক লেখকের রচনায় ইংরেজ লেখকের সৌভাগ্যের বর্ণনা পেয়েছি। তাই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, অন্তত তাহলে পৃথিবীতে এমন দেশও আছে যেখানে লেখকেরা বলতে পারেন, আমি শুধু লিখি—সেখানে সংসারের অনিবার্য দাবির জন্যে লেখকদের মাথার শিরা দপদপ করে না আর আরও নানা কারণে আর্থিক দুশ্চিন্তায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের অকাজ-কুকাজ করতে হয় না—মানে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক হয়ে, শুধু পেটের দায়ে তাঁদের লেখক ও চিত্রনাট্যকার কিংবা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বলে নিজেদের ঘোষণা করবার প্রয়োজন হয় না।

তাই প্রথমে খুব অবাক হতে হলো যখন দেখলাম অনেক স্বনামখ্যাত লেখক প্রত্যহ কোন সদাগরী আপিসে সাড়ে-নটা পাঁচটা করেন কিংবা কোনো প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী হয়ে বসেন আর বি-বি-সি'তে প্রযোজকদের আপ্যায়িত করবার জন্যে রীতিমতো ধরনা দেন। এর মধ্যে চিত্র-পরিচালকদের সঙ্গে যোগাযোগ

হলে তো কথাই নেই—ঠিক আমাদের দেশের লেখকদের মতোই প্রকাশকদের দূর-ছাই করে হৈ হৈ করে সিনারিও রচনা করেন আর কল্পনা করেন, আমিও একদিন গাড়ি-বাড়ি করবো আর সময়ে-অসময়ে কন্টিনেণ্টে ঘুরে আসবো।

এই সব দেখে শুনে বলা বাহুল্য, আমার পক্ষে হতাশ হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। আমি যথাসময়ে বুঝতে পারলাম ইংরেজ লেখকদের ঘরের অবস্থা আমাদের চেয়ে খুব একটা ভালো নয়। বরং ও দেশের সাধারণ লোকের বসবাসের ধরন-ধারন তুলনা করলে ইংরেজ লেখকদের দরিদ্র না বলে উপায় নেই।

কথা উঠবে, কেন, এ আবার কি? অত টাকা পেয়েও তাঁদের অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণ কি? কারণ আছে বৈকি আর তা এত স্পষ্ট যে না উল্লেখ করলেও চলে। অর্থাৎ ইংরেজের জীবনধারণের রীতিনীতি আমাদের চোখে আশ্চর্য রকম ব্যয়বহুল। তাদের যে-পরিমাণ আয়, ব্যয় তার চেয়ে বেশি তো কম নয়। তাই শুধু লেখার ওপর নির্ভর করা চলে না, কারণ লেখকের মেজাজ অনিশ্চিত —কখন তোড় বন্ধ হয়ে যায় ঠিক কি। তাছাড়া সাহিত্য-পত্রিকার সংখ্যা লণ্ডনে বর্তমানে খুব বেশি নয় আর নিয়মিত প্রতি মাসে একটি করে ছোটো গল্প লিখে তিনশো টাকা পাওয়াও সম্ভব নয়, কারণ লেখকের সংখ্যাও তো কম নয়—সকলকেই টিকে থাকতে হবে। আর বছরে কটাই বা উপন্যাস লেখা যায়!

বস্তুত, পৃথিবীর সর্বত্র লেখকদের অবস্থা বোধহয় এক। এদেশের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কারণ আমাদের প্রয়োজন খুব বেশি নয়। আমরা অল্পে সন্তুষ্ট। আমাদের দেশের লেখকসাধারণ সপরিবারে হাওয়া-বদল করতে যাবার কথা না ভেবে কালকে র‍্যাশন কেমন করে যোগাড় হবে সেকথা ভাবেন—প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত আনন্দ-উৎসবে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ধরা-বাঁধা মাইনের একটা নির্দিষ্ট চাকরি তো আছেই। লেখকদের এই নিয়ে অস্বস্তি, অনুযোগ,

অভিযোগ আছে কিন্তু উপায় নেই। এই নিয়ম হয়ে গেছে। আর প্রপিতামহের আমল থেকে আমাদের প্রয়োজন সামান্য—আমাদের জীবনধারণ মানে কোনরকমে টিকে থেকে দিন কাটানো। তাই একটি গল্প লিখে পঁচিশ টাকা মানে দু পাউণ্ডের কম পেয়ে আমরা খুশি হয়ে ভাবি, খুব পেয়েছি। আর ইংরেজ পঁচিশ পাউণ্ড পেয়েও ভাবে একটা গোটা গল্প লেখার পরিশ্রম করে কিই বা এমন পেলাম! কারণ তাঁর দৈনন্দিন প্রয়োজন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি—তাঁর জীবনধারণের আয়োজন আমাদের কল্পনার বাইরে।

ইংরেজ লেখক যদি অবিবাহিত হন তাহলে সাধারণত আশ্রয় নেন কোন প্রাইভেট বোর্ডিং হাউসে—সেখানে তাঁর থাকার খরচ শুধু ব্রেকফাস্ট নিয়ে সপ্তাহে চার-পাঁচ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি টাকা। তাছাড়া আরও দুটো খাওয়া, মানে লাঞ্চ আর ডিনার—সে বন্দোবস্ত আলাদা করতে হয়—হয় নিজেই ঘরে তৈরি করে নেন না হয় বাইরে খান—খরচ, খুব কম করে সপ্তাহে প্রায় আরও দু তিন পাউণ্ড। অবশ্য একটু উঁচু দরের অবিবাহিত লেখক ঠিক এভাবে বোর্ডিং হাউসে থাকবেন না। তিনি নিজের আলাদা ফ্ল্যাট খুঁজে নেন এবং লেখকজনোচিত ঠাট-ঠমক যথাসাধ্য বজায় রাখেন। মানে মনের মতো করে ঘর সাজান, ভদ্রগোছের কার্পেট কেনেন—অতিথি অভ্যাগতদের নিজের বিশেষ রুচির পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন। ফ্ল্যাটের ভাড়া সপ্তাহে একশো-দেড়শো টাকা। তাছাড়া এটা ওটা সংসারের আরও নানা খরচ তো আছেই। তাঁর নিশ্চয়ই বান্ধবী আছে, তাকে নিয়ে নাচে বায়স্কোপে থিয়েটারে যেতে হয়; গ্রীষ্মকালে দেশভ্রমণে না গিয়ে উপায় নেই। আর যাঁরা বিবাহিত, তাঁদের বান্ধবীর বালাই নেই বটে কিন্তু স্ত্রী তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গিনী অর্থাৎ আনন্দ-উৎসবে, মেলায়, পার্কে, গ্রীষ্ম-উৎসবে, সমুদ্র-তীরে তাকে ছেড়ে যাওয়া যায় না। যস্মিন দেশে যদাচার।

এটা ঠিক, দূর থেকে ইংরেজ লেখকের চেহারা দেখলে তাঁর

সংসারের অভাব আমাদের চোখে একেবারেই পড়ে না, কারণ তাঁর জামাকাপড় আর বাস করার দেশোপযোগী কৌশল আমাদের বরং চোখ ধাঁধিয়ে দেয় কিন্তু অভাব লুকিয়ে আছে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ফাঁকে ফাঁকে।

একজন লোক যার পৃথিবীব্যাপী যশ—হঠাৎ শুনি তিনি নাকি আর-একজন বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। আপনারা বলবেন, তাতে কি হলো—বন্ধুর সঙ্গে বাস তো অনেকেই করে থাকেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক বন্ধুর সঙ্গ পাবার জন্যে ঘটে নি—ঘটেছিলো অন্যকারণে। বাইরে সেই বিশেষ লেখকের খুব নামডাক থাকলেও হঠাৎ তাঁর বই-এর বিক্রি গেল কমে—এতো কমে গেলো যে, লেখক এতদিন যেভাবে চলছিলেন সেভাবে আর চলতে এবং চালাতে পারলেন না। অগত্যা শুধু মান বাঁচাবার জন্যে—মানে সেই বাড়িতে বাস করবার জন্যে তাঁকে বন্ধুর সাহায্য নিতে হলো। অনেকের এমন হয়েছে। হঠাৎ শুনি অমুক লেখক চাকরি করছেন কিংবা বই প্রকাশের ব্যবসা করছেন নাহলে কোনো প্রকাশকের মাইনেকরা রীডার হয়েছেন। বিলেতে এই রীডার হওয়ার রেওয়াজ অনেক দিনের। সাধারণত প্রকাশকেরা প্রসিদ্ধ লেখকদের দিয়ে পাণ্ডুলিপি পড়িয়ে তাঁদের মতামত নিয়ে তারপর তা মনোনীত করে। সেই লেখকরা হলেন রীডার।

দেশের খরচপত্রের হালচাল বুঝে ইংরেজ লেখকের ঘরে উঁকি মেরে দেখলে সহজেই মনে হয় আমরা এদেশে বসে এতোদিন ভুল খবর শুনে ইংল্যাণ্ডে সার্থক জনম—গান করে অকারণে পুলকিত হয়েছি।

একটি ছোটো গল্প লিখে তিনশো টাকা আর একটি উপন্যাস লিখে হাজার তিনেকের কাছাকাছি পারিশ্রমিক পেলেও সেদেশে বসে খুব অবাক হতে হয় না, কারণ এই সংখ্যাগুলির মূল্য ভারতবর্ষে যতো বেশি—ইউরোপে ততো মোটেই নয়।

শুধু লেখকদের কথা কেন—আমরা যখন এদেশে বসে শুনি ইংল্যাণ্ডে একজন মজুরের সাপ্তাহিক আয় পাঁচ পাউণ্ড তখন এদেশের মজুরের কথা মনে করে দুঃখ বোধ করি। কিন্তু বিলিতি মজুরের সঙ্গে কিছুদিন বাস করলে সে ভুল হয়তো সহজেই ভেঙে যায়। কারণ সে-দেশের বেঁচে থাকার রীতির সঙ্গে তাল মেলাবার অনিবার্য তাগিদে সে-মজুর আর এ-মজুরে বিশেষ তফাত থাকে না।

লেখকদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। শুধু আমাদের বেঁচে থাকবার পদ্ধতির সঙ্গে তাঁদের আকাশ-পাতাল তফাত। আমরা ছেঁড়া গেঞ্জি, ছেঁড়া কাঁথা আঁকড়ে এক ছোটো ঘরে পাঁচ-ছ জন ঘেঁষাঘেষি করে গুমোট গরমে হাঁসফাঁস করি—প্রতিবাদের ভাষা যোগায় না। এমনভাবে বাস করবার কল্পনা ইংল্যাণ্ডের কোনো লেখক দূরের কথা, সেখানকার ঝি-চাকরও করতে পারবে না।

আমরা প্রতিবাদ করি না, কারণ উপায় নেই। ইংরেজ লেখকের বেলায় প্রতিবাদের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ এমন অবস্থায় তাঁর বাস করবার কথাই ওঠে না।

কিন্তু একজন সাধারণ ইংরেজ লেখকের অবস্থা ইংল্যাণ্ডের একজন ধরা-বাঁধা মাইনের সাধারণ কেরানীর চেয়ে ভালো নয় বরং খারাপই বলা যায়, কারণ লেখকের আয় অনিশ্চিত। যদিও ভারতবর্ষে বসে আমরা ইংল্যাণ্ডের কেরানীর উপার্জনের কথা শুনেও অবাক হই।

একথা তো স্বীকার করতেই হবে যে যদি শুধু লিখে ভরণ-পোষণের খরচ চালানো যেতো তাহলে পৃথিবীর কোনো লেখকই কোনোদিনও চাকরি করতো না। যাঁরা চালাতে পেরেছেন তাঁরা যে-দেশের লোকই হোন না কেন, ছোট্ট সুন্দর বাড়ি করে ফুল ফুটিয়েছেন, গাড়িও চালিয়েছেন। বাংলাদেশেও কি তেমন লেখকের সংখ্যা কম? হয়তো বাঙালী লেখককে পয়সা দিয়েছে ছায়াচিত্র আর ইংরেজ লেখককে নিশ্চিন্ত করেছে তাঁর পৃথিবী-কথিত ভাষা। কিন্তু দু দেশের এই পর্যায়ের লেখকরা হলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ। অবশ্য আমি

তাদের কথা বাদ দিয়েই এতো কথা বললাম। আমি এতোক্ষণ শুধু তাঁদের কথা বলছিলাম যাঁরা সাধারণ এবং সবেমাত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

আরও একটা কথা। এ-দেশের লেখকদের অশান্তির মূল কারণ হয়তো শুধু অর্থাভাব আর অনিশ্চিত উপার্জন। এ থেকে পৃথিবীর কোনো লেখকের মুক্তি নেই। কিন্তু ইংরেজ লেখকের আজকের সবচেয়ে বড়ো অশান্তি হলো তাঁর অনিশ্চিত সংসার। যে কোনো মুহূর্তেই দীপ নিভে যেতে পারে, ঘর ভেঙে যেতে পারে। পারিবারিক কলহ, স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের মামলা—তছনছ করা সংসারের ভয়াবহ রূপ তাঁকে বার বার দিশেহারা করে। ইংল্যাণ্ডের এই ঘর-ভাঙা হয়তো খুব আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু যেমন দেখেছি আর শুনেছি তাতে মনে হয় স্বভাবসুলভ কোমলতার জন্যে এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় লেখকদের। এই পারিবারিক গোলযোগ আর আকস্মিক বিচ্ছেদ তাঁদের পরবর্তী সাহিত্যের ধারা একেবারে ঘুরিয়ে দেয়। সাহিত্যিক কিংবা কবি জীবনের আরম্ভে যিনি আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, সহসা একদিন দেখা গেলো মনের অশান্তি দূর করবার জন্যে সেই লেখক শুধু বাইবেল আঁকড়ে ধরেছেন অর্থাৎ দেশের লোককে তিনি বোঝাবেন নিদারুণ পার্থিব অশান্তির হাত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ঈশ্বরে মনপ্রাণ সমর্পণ।

আজ সারা ইউরোপের লেখকেরা একই ধ্বনি তুলেছেন—ঘর রাখো—যেমন করে হোক ঘর সামলাও। তা না হলে শান্তি নেই—শান্তি নেই। রাতারাতি কতো লেখক যে হঠাৎ ক্যাথলিক হয়ে এই শান্তির বাণী প্রচার করেছেন তার ঠিক নেই। অর্থাৎ ধর্মে মন দাও তাহলে মিটমাট করে সংসারের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আর অসুবিধা হবে না। তুমি এ-জীবনের সুখশান্তি কী পেলে আর কতটা না পেলে তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না—তুমি রাত্রিদিন শুধু স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখে শান্তি পাবে।

এই তো সেদিন লণ্ডনের অলিম্পিয়ায় আদর্শ গৃহ প্রদর্শনী (Ideal Home Exhibition) হয়ে গেলো। এমন মাঝে মাঝে হয়। কী দেখানো হয় সে প্রদর্শনীতে? নানারকম বাড়ি—কত সুন্দর ঘর আর এমন সব গৃহের ঝকঝকে সরঞ্জাম, যে দেখলে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। এইসব প্রদর্শনীর আসল উদ্দেশ্য হলো গৃহবিমুখ ইংরেজকে গৃহের প্রতি আকৃষ্ট করা। শুধু লেখক নন ইংরেজ জনসাধারণ এই প্রচণ্ড মানসিক অশান্তির হাত থেকে মক্ত হতে না পারলে তাদের সমস্তরকম কর্মক্ষমতা কমে যাবে। পারিবারিক অশান্তির আগুনে যে দিনরাত্রি জ্বলে মরে, বলা বাহুল্য তার দিশেহারা মন বেশি দিন সক্রিয় থাকে না, আর থাকলেও তার প্রকাশ হয় পঙ্গু।

কিন্তু আর একদল অন্য কথা বলে। ইংল্যাণ্ডের ক্যাথলিক-বিরোধী কিংবা অন্য কোনো মতাবলম্বী লেখক এসব কথায় কান না দিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেন, ঘর-ভাঙার মূল কারণ কী? অভাব। কিসের অভাব? না, অর্থের। তাই শুধু চোখকান বুজে স্বর্গরাজ্যে বিশ্বাস করলে ঠকে মরতে হবে—সাহিত্যের যুক্তি প্রবল হবে না। তার চেয়ে অভাব দূর করবার চেষ্টা এবং যারা কষ্ট পাচ্ছে তাদের হুবহু ছবি পাঠকের সামনে মেলে ধরতে হবে। শুধু সাংসারিক গোলযোগে, নিজের ব্যক্তিগত দৈন্যে যে লেখকের লেখনী দিশা হারায় এ সমাজে তার মূল্য নেই, প্রয়োজনও নেই—সে-লেখক নির্বোধ কারণ এই সমাজ-সচেতনতার যুগে সে পাঠককে শুধু ধাপ্পা দিয়ে ভুলিয়ে রাখে। ইংরেজ লেখকদের মধ্যেও এমনি দলাদলি কচাকচি তর্ক-বিতর্ক বিলক্ষণ চলে।

তা চলুক। বর্তমান আলোচনার পরিসরে তার অবতারণা এ লেখককেও দিশেহারা করে আসল বক্তব্য ভুলিয়ে দিতে পারে। তাই সতর্ক হই।

যা বলছিলাম। আর্থিক, পারিবারিক এবং ফলে মানসিক—এই

অশান্তি ইংরেজ লেখককে দিশেহারা করে। কিন্তু এতো অন্ধকারেও সুখের বিষয় যে ইংরেজ লেখক শুধু টাকার জন্যে নিজের রচনাকে বিকৃত করেন না। কথাটা আরও পরিষ্কার করে বলা দরকার। আমাদের দেশের লেখকেরা যখন ছায়াচিত্রে যোগদান করেন তখন দিনের আলোয় পাঁচজনের মাঝে তাঁরা স্পষ্ট ঘোষণা করেন যে আর কোনো উৎসাহ ছায়াচিত্র সম্পর্কে তাঁর নেই, শুধু অর্থের জন্যেই তাঁকে এই কাজ করতে হলো। কোনো ইংরেজ লেখক কখনও এমন ঘোষণা করবেন না। অর্থের প্রতি তাঁর নিঃসন্দেহে লোভ আছে এবং অর্থকরী মাধ্যমের সাহায্য নিতে তিনি কুণ্ঠিত নন, কিন্তু যখন তিনি সে-কাজ গ্রহণ করেন তখন মনে প্রাণে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই করেন যে ফাঁকি দেবো না—আমার কথায় কিংবা কাজে মুহূর্তের জন্যেও কোন অবহেলা প্রকাশ পাবে না। আর তাঁরা যা জানেন না তা (চিত্রনাট্য রচনা ইত্যাদি) শিখে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। অবশেষে যদি বোঝেন যে কাজ তাঁকে দেওয়া হয়েছে সে-কাজ তাঁকে দিয়ে সার্থক কি সর্বাঙ্গসুন্দর হবে না তাহলে সেখান থেকে তিনি নিঃশব্দে প্রস্থান করেন—পাঠক কি দর্শককে ধাপ্পা দিয়ে দুপয়সা গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করেন না।

লেখার ব্যাপারেও ঠিক তাই। চেক-বই পকেটে নিয়ে হাজার মাথা খুঁড়ে মরলেও লেখকের ভালো লেখবার মেজাজ না থাকলে একটি লাইনও প্রকাশক পাবে না। লেখক তাঁর সাধ্যমতো ভালো লেখবার চেষ্টা করবেন—যদি না পারেন স্পষ্ট বলে দেবেন, মাপ করো—এখন হবে না।

আমার মনে হয় এইখানেই ইংরেজ লেখকের সঙ্গে আমাদের দেশের লেখকের সবচেয়ে বড়ো তফাত। মাথায় সেই মুহূর্তে কিছু না থাকলেও পকেটে-চেক-বইওয়ালা প্রকাশককে আমরা কজন ফেরাই? চিত্রনাট্য রচনার বিন্দুবিসর্গ না জানলেও আমাদের মধ্যে কে আর 'জানি না' বলে তিন-চার হাজার দেবো বলনেওয়ালা

ডিরেক্টার সাহেবকে নিরাশ করেন? তাঁরা কাজ করেন, তাঁরা অর্থলাভ করেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রতি নিযুক্ত সেক্রেটারির সঙ্গে নিজের নতুন মোটর গাড়িতে ধুমধাড়াক্কা করে স্যুটিং-এর কাজ চুকিয়ে স্টুডিও থেকে বেরুবার সময় তাঁর নিজের কি মনে হয় জানি না কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ লেখকের সাহিত্যপ্রতিভার একেবারে অবসান হয়েছে আর ডিরেক্টার এবং প্রযোজকের দল ভাবে, বাংলাদেশের নামকরা সাহিত্যিককে এনে ফিল্মের কি উন্নতি হলো—তা যেখানে ছিলো সাহিত্যিক মশাই তো সেখান থেকে আরও কয়েক-ধাপ নামিয়ে দিলো! ইংরেজ লেখককে এমন কথা শুনতে হয় না। লেখক কুলিগিরি করতে পারেন, খনিতে কাজ করতে পারেন, সদাগরী কিংবা খবরের কাগজের আপিসে চাকরি নিতে পারেন কিন্তু যখন যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন এক মুহূর্তের জন্যে ভুলবেন না যে তিনি সাহিত্যিক, আর করবেন না তাঁর প্রতিভার অপচয়—যা করবেন তা সমস্ত শক্তি দিয়েই করবেন—নিষ্ঠাবান থাকবেন—আত্মসম্মান বজায় রেখে পদে পদে প্রমাণ দেবেন যে তিনি সত্যভ্রষ্ট নন। অর্থের প্রচুর প্রয়োজন থাকলেও তার জন্যে বিস্মৃত হবেন না নিজেকে।

শেষ করবার আগে একটি ছোট সত্য ঘটনার উল্লেখ করবো। শীতকাল। বাইরে বেশ বরফ পড়ছে। টটনহ্যাম কোর্ট রোডের একটি দিশি রেস্তোরাঁয় পোলাও-মাংসের অর্ডার দিয়ে চুপ করে বসে আছি। হঠাৎ সাহিত্যের আলোচনা শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখি এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা আর একজন তরুণ ইংরেজ দিশি খাওয়া খেতে খেতে কথাবার্তা বলছেন। যতদূর মনে আছে তাঁদের আলোচনার সারাংশ তুলে দিলাম—

ভদ্রমহিলা বললেন, কি ঠিক করলে?

হেসে তরুণ উত্তর দিলো, কোনো উপায় নেই—এখন অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু তুমি ফিল্মের চাকরিটা নিচ্ছ না কেন—তাহলে তো একটা বাঁধা মাইনে পেতে ?

আপনি তো জানেন আমি একেবারেই ছবির জন্যে লিখতে পারি না।

কিন্তু গল্প তো লিখতে পারো—তাতেই হবে। তোমাকে তো আর মৌলিক কিছু লিখতে হবে না—অন্য লেখার চিত্ররূপ দিতে হবে শুধু।

তাও পারবো না—তার চেয়ে ভাবছি ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে একটা চাকরি নেবো।

তোমার ছোটোগল্পগুলির কি হলো? এদিক-ওদিক তো অনেক বেরিয়েছে দেখছি।

দু-চার জায়গায় কথা বলেছিলাম। কোনো প্রকাশক নিতে চায় না। সকলেই উপন্যাস চায়। এক প্রকাশক অনেকদিন পাণ্ডুলিপি আটকে রেখে শেষে ফেরত দিলো।

এখনও বলছি, সিনেমার চাকরিটা নিয়ে নাও—বলো তো কাল কথাবার্তা পাকা করে ফেলি—

না থাক! ধন্যবাদ।

দুজনের মধ্যে একজন বর্তমান লণ্ডন ছায়াচিত্রের নামকরা অভিনেত্রী আর একজন বলা বাহুল্য নতুন লেখক। দুজনের নাম আমার জানা কিন্তু করতে পারবো না, কারণ—

কিন্তু কারণ বলেই বা লাভ কি ?

সপ্তাহশেষের ইংল্যাণ্ড

শীতের সকালে একদিন দেখি পথে প্রান্তরে আর পার্কে পার্কে জমা হয়ে আছে পুরু তুষার। কাল সারারাত ব্লিজার্ড বয়ে গেছে—আজ তারই চিহ্ন যেন ছড়িয়ে গেছে মাঠে, পত্রহীন মূক গাছের শাখা-প্রশাখায় আর যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর।

পাখি উড়ে গেছে। একে একে শুকিয়েছে ফুল। পাতারা ঝরে গেছে। শীতের কঠিন স্পর্শ লেগেছে। নিঃস্ব, রিক্ত প্রকৃতি যেন আতঙ্কে বিহ্বল। রোদ নেই। বিলাসী ম্লান সূর্যের ক্ষণকালের জন্যও দেখা পাওয়া কঠিন। শুধু ঝরা-তুষার ভেদ করে উঠেছে কান্নার রেশের মতো সিক্ত ধূম। বাইরে আনন্দ নেই, কোলাহল নেই, পরিত্যক্ত সাঁতার কাটবার দীঘি-সরোবর।

মানুষগুলো যেন মৃতপ্রায়। মুখে হতাশা আর বিরক্তি, লণ্ডন ব্রিজের ওপর দ্রুতগামী বাসে নিষ্ক্রিয় যন্ত্রের মতো লোকগুলোকে যেন বোবা বলে মনে হয়। তুষার বাঁচিয়ে অতি দ্রুত কর্মস্থলে পৌঁছানো আর সেখান থেকে বেরিয়ে সন্তর্পণে গৃহে ফিরে আসা। জীবনে যেন আর কিছুই করবার নেই। যখন তারা মুখ খোলে তখনও তোতাপাখির মতো সেই একই কথা শুনি, কী কনকনে ঠাণ্ডা! কী অসহ্য দিন!

বাইরের পৃথিবী থেকে গৃহস্থকে একরকম বিচ্ছিন্ন হতে হলো। সংসারের খরচ বাড়তে লাগলো দিনে দিনে। মেয়ের কোট, ছেলের বুট, গিন্নীর ওভারকোট, কর্তার গরম গেঞ্জি, কয়লা গ্যাস ইত্যাদি ব্যয়ের বাহুল্যে বিব্রত হলো জনসাধারণ। দরিদ্র, আর মধ্যবিত্ত ইংল্যাণ্ডবাসীর বড়-আশা-করা শনিবার-রবিবার অর্থাৎ উইক-এণ্ড দীর্ঘকাল ধরে বৃথাই এলো গেলো।

ইংল্যাণ্ডের দরিদ্র জনসাধারণ শীতে কোনোরকমে কাল কাটায়।

হাসি মিলিয়ে যায় তাদের। আতঙ্ক আর দুশ্চিন্তায় মন ভরে থাকে। কোনো কিছুতেই যেন উৎসাহ থাকে না। কেবলই প্রহর গোনে, কবে আবার শুরু হবে অঙ্গনে রবিনের আনাগোনা, কবে আবার প্রকৃতি ফোটাবে ফুল আর সপ্তাহশেষে গৃহকোণে উঠবে আনন্দধ্বনি।

কেন এই আনন্দ? সূর্য-ঝলমল-করা দিনে কেন পথে পথে দেখি হাসিভরা মুখ আর অনুভব করি দরিদ্রের উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ? কারণ অনেকদিন কষ্ট সহ্য করবার পর তারা সূর্যকে পেয়েছে। যাদের যথেষ্ট অর্থ নেই, যাদের সুখভোগের পরিমাণ সীমাবদ্ধ, তাদের বার বার জীবনের উপর ধিক্কার জেগেছে অলস কঠিন শীতের দুপুরে। তাই শীতের সপ্তাহশেষ কলরবহীন। বিরক্তির বর্ণনা ছাড়া আর কিছু নেই।

গ্রীষ্মের সপ্তাহশেষ বোধহয় ইংরেজ জনসাধারণের বেঁচে থাকবার সবচেয়ে বড়ো সম্বল। যারা বড়লোক, তাদের কথা নয়, তারা চলে যায় সমুদ্রতীরে রিভিয়ারায় মধু-যামিনীর উৎসবে কিংবা নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্কে। কিন্তু যাদের দূরে যাবার সামর্থ্য নেই, সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি অন্নচিন্তায় যারা নিশ্বাস ফেলার অবসর পায় না, তারা বুক ভরে উপভোগ করে সপ্তাহশেষের আনন্দোল্লাস। প্রতি সপ্তাহে তারা পায় ভ্রমণের আনন্দ, অল্প দিয়েই ভরে রাখে সংসার—যতদিন গ্রীষ্ম থাকে ততদিন।

ইংরেজ এককথায় দিশেহারা হয়ে অভাবকে সুযোগ দেয় না সংসারের সমস্ত সুখ-শান্তি গ্রাস করে নিতে। হাজার অভাবের মধ্যেও ইংরেজ হাসিমুখে ফুল ফোটায়। প্রাণপণে সাধ্যমতো আনন্দ উপভোগ করে। যতটুকু পায়, যেটুকু সামর্থ্যে কুলোয় তাই প্রাণভরে গ্রহণ করে। কি পেতে পারলো না, কতখানি বঞ্চিত হলো, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে গুমরে মরে না। পাওনা তোলা রইল ভবিষ্যতের জন্যে। কিন্তু যতটুকু পেলো তাই থেকে মধু

আহরণ করলো সযত্নে। আরও না পাওয়ার দুঃসহ কল্পনায় ব্যর্থ হতে দিলো না তার সামান্য এক কণাও। উপায় যখন নেই, তখন যা পেয়েছি তা থেকেই খুঁজে পেতে হবে মণিকণিকা। তাই ইংরেজ মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী, স্বল্পবাক। ইংরেজের ধর্ম উপভোগ—অনুযোগ নয়, অনুতাপ নয়।

আমরা অনেক সময় ভাবি, ইংল্যাণ্ডবাসী-মাত্রেই আমাদের চেয়ে ধনী। মানে আমাদের দেশের কুলি-কেরানীর চেয়ে তাদের কুলি-কেরানীর অবস্থা অনেক ভালো। কারণ ওরা সপ্তাহে খুব কম করেও প্রায় পঁয়ষট্টি সত্তর টাকা উপার্জন করে। তাই হঠাৎ ওদেশের ওই শ্রেণীর লোক দেখলে আমরা নিজের দেশের সঙ্গে ওদের তুলনা না করে পারি না। আর ভাবি দুই দেশের সামাজিক মানদণ্ডে কী আশ্চর্য প্রভেদ!

কিন্তু তাদের সংসারে প্রবেশ করে চারপাশে চোখ মেলে তাকালে ভুল ভাঙতে দেরি হয় না। ওদের তুলনায় নিঃসন্দেহে আমাদের আয় সামান্য, প্রয়োজনও সামান্য। ওদের আয় বেশি, কিন্তু আমাদের তুলনায় ব্যয়ও প্রচুর। ওদের ঘরভাড়া বেশি, জামা-কাপড়ের প্রয়োজন বেশি, আর ওদের সংসারের অন্যান্য দাবির তুলনায় আমাদের সংসারের দাবি হয়তো কিছুই নয়।

কিন্তু ওদের অভাবের কথা বিদেশী কেমন করে বুঝবে! সপ্তাহ-শেষে যখন যেখানে গেছি দেখেছি আনন্দের আয়োজন—দেখেছি খুশিতে ঝলমলকরা মুখ। তখন একবারও মনে হয় নি যে, ইংল্যাণ্ডের কোথাও কোনোরকম দুঃখ-দারিদ্র্য আছে। অভাবকে আনন্দের সূক্ষ্ম আচ্ছাদনে আবৃত করে, প্রচুর আত্মবিশ্বাস নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বেঁচে থাকবার কৌশল বোধ হয় একমাত্র ইংরেজ জাতই জানে। নাই-বা গেলো কর্নওয়ালে, নাই-বা যেতে পারলো আইল্ অব ওয়াইটে—তার জন্যে দুঃখ করে লাভ কি! ঘরের বাইরে দুই পা ফেলেই যোগ দিতে হবে আলোর উৎসবে। বাড়ির কাছে থেকেই

সেই দেড়দিনে করে নেবে আগামী সাড়ে পাঁচ দিন পূর্ণ উৎসাহে কাজ করবার শক্তি সঞ্চয়। কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেবে না গ্রীষ্মের সপ্তাহশেষ।

শনিবার সকাল থেকে ব্যস্ত হয়ে ওঠে ইংরেজ-গিন্নী। নাকে মুখে ব্রেকফাস্ট গুঁজে একটু আগে কর্তা বেরিয়ে গেছে কোন সওদাগরী আপিসে কেরানীগিরি করতে; কিন্তু আজ আর বাইরে লাঞ্চ খাবে না। দেড়টার মধ্যে বাড়ি এসে পড়বে।

প্রতি শুক্রবার ইংল্যাণ্ডে মাইনে পাবার দিন। কাল হাতে টাকা পাওয়া গেছে। তাই আজ খুশিমতো বাজার করতে গিন্নীর অসুবিধা হয় নি। ভেড়ার মাংস কিনেছে, আলু পেঁয়াজ মটরশুটি এনেছে, ক্যারটও আনতে হয়েছে প্রচুর।

ছেলেমেয়ে দুটি মায়ের পায়ে-পায়ে ঘুরঘুর করছে। ওরা জানে আজ মা-বাবার সঙ্গে বের হবার দিন।

কটা বেজেছে মা?

বারোটা—মা তাড়া দিয়ে মেয়েকে বলে—

যা জামাকাপড় পরে নে শিগগির, দেরি করলে নিয়ে যাবনা কিন্তু—

ছেলে এবার কাছে এসে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে,—আজ কোথায় যাবো মা?

মা হেসে উত্তর দেয়, হ্যামটন কোর্ট।

যথাসময়ে কর্তা বাড়ি এলো। গিন্নী টেবিল সাজিয়ে রেখেছে এর মধ্যেই। আয়েশ করে গরম গরম খাওয়া সেরে নিতে দেরি হলো না। তারপর বের হবার পালা। গিন্নী যা কিছু দরকারী জিনিস, হয় ব্যাগে নয় ঝুড়িতে ভরে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে। আজ তাদের এই একবেলাই ভালো খাওয়া জুটলো। রাত্তিরে এত ভালো খাওয়ার আর উপায় নেই। অর্থ নেই যথেষ্ট। তাই দুবেলা আয়েশ করে খাওয়া যায় না। গিন্নী ব্যাগে ভরে নিয়েছে

স্যাণ্ডউইচ, ফ্লাস্কে নিয়েছে চা কিংবা কফি। সন্ধ্যার সময় ফেরবার আগে যখন খিদে পাবে, তখন মাঠে কিংবা গাছতলায় বসে তৃপ্তির সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ খেয়ে পেট ভরাতে হবে।

ওদিকে ইস্ট এণ্ডের জীর্ণ ঘরে গরিব শিল্পীও গুছিয়ে নিলো তুলি আর আঁকবার নানা জিনিসপত্র। তারপর শুকনো খাবার বেঁধে বেরিয়ে পড়লো ; কোথায় যাবে ঠিক নেই। কাছাকাছি কোনো পার্কে কিংবা আর একটু দূরে—এপিং জাঙ্গলে। টিউবে যেতে কতক্ষণই বা সময় লাগে। গভীর জঙ্গল, কিন্তু এখানে সময় কাটাতে আসে অনেক লোক। আর কিছু দেখা যায় না—শুধু ঘন অরণ্যে গাছের সারি, পাতার মর্মর আর পাখির কলরব। চারপাশে সযত্নে পরিষ্কার করে বসবার জায়গা করা হয়েছে। সূর্যের আলো বাধা পায় না। সেই এপিং জাঙ্গলে খেলা করে গান গেয়ে আর ছবি এঁকে শিল্পী কাটাবে আজ সারা দিন। তারপর অনেক পরে যখন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে দীর্ঘ-কালস্থায়ী গোধূলি, আর অন্ধকার দানা বাঁধতে শুরু করবে গাছে গাছে, তখন জীর্ণ গ্যারেটে ফিরে মূর্ত হয়ে উঠবে সেই তরুণ শিল্পীর সতেজ মনের কল্পনা।

আর নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের যে মেয়েটি বীমা কোম্পানির টাইপিস্ট —আজ তারও বড়ো আনন্দের দিন। তার সঙ্গে যার বিয়ে হবে— আজ তার সঙ্গে দেখা হবার দিন। কোনো হোটেলে খাবার ক্ষমতা নেই তাদের। খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ছেলেটি সামান্য চাকরি করে—ভালো করে উন্নতি না হলে বিয়ে হতে পারে না তাদের। সংসারে মেয়েটিকে অনেক দিতে হয়, ছেলেটিরও রয়েছে অথর্ব বুড়ি মা আর নানা উপরি দেনা। কিন্তু আজ সেকথা কারো মনে থাকবে না। ক্ষণকালের জন্যে তারা সব ভুলে যাবে। হ্যাম্পস্টেড্ হীথের অজস্র আলোয় নিরলস মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে তারা পাবে ভ্রমণের আনন্দ—শক্তি লাভ করবে সংগ্রামের। অভাব

আর অশান্তির মধ্যেও তারা যতোটুকু পাবে, আশ মিটিয়ে গ্রহণ করবে। বেঁচে থাকার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে না কেউ।

ট্রাফালগার স্কোয়ারে, সেখানে রয়েছে পাথরের বিরাট বিরাট সিংহ—যেখানে মাথার ওপর উড়ে বেড়ায় অসংখ্য পায়রার দল, আর ডাকলেই হাতে কিংবা কাঁধে এসে বসে, সেখানে সপ্তাহশেষের অপরাহ্নে দেখি সেজেগুজে বসে আছে মেথর আর মেথরানী। দীর্ঘদিন ছুটি নিয়ে দূরে হাওয়া খেতে যাওয়ার কথা ভাবতে পারে না তারা। তবু ঘরে গুম হয়ে বসে থেকে বিরস করে তোলে না মুহূর্তগুলি—দূরে যেতে পারলো না বলে দুঃখ করে না। ঘরের পাশে চোখ মেলে সুন্দর পৃথিবীকে দেখবার মতো মন তাদের আছে।

তাছাড়া রিজেন্টস কিংবা হাইড পার্কে নৌকো বাওয়া চলেছে। সেখানে রয়েছে হ্রদ। ঘণ্টায় ক শিলিং দিলে নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়। দলে দলে ছেলেমেয়ে সেখানে নৌকো বাইছে। আর সন্তরণ-সরোবরে সুইমিং কস্ট্যুম পরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নর-নারী। টেনিস র‍্যাকেট হাতে নিয়ে ছুটে চলেছে কতো লোক। সূর্যের তাজা আলোয় গলফ খেলায় মেতে উঠেছে অনেকে। আরও নানা সুলভ আনন্দ-কৌতুকের ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে ওখানে।

সর্বত্র দেখছি জনতার দুরন্ত উল্লাস আর উচ্ছ্বাস। বাপ-মা, ছেলেমেয়ে, ছাত্রছাত্রী, তরুণ-তরুণী, সকলেই বেরিয়ে পড়েছে স্বল্প ব্যয়ে পূর্ণ আনন্দ পেতে। এদের সকলের সংসারে অভাব আছে, অনটন আছে, নানারকম দুঃখ-কষ্ট তো আছেই। কিন্তু জীবনের পূর্ণ জোয়ারে তারা যেন ভুলে গেছে সমস্ত অভাব। সপ্তাহ-শেষের খুশি ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে।

হ্যাম্পস্টেড্ হীথের গাছে গাছে যখন অসংখ্য গন্ধহীন রঙ-বেরঙের ফুল ফোটে, কিউ গার্ডেনস-এ যখন আলোর বন্যা বয়ে যায়, হ্যাম্পটন কোর্ট আর উইণ্ডসর ক্যাসেল সূর্যের আলো পেয়ে যখন উজ্জ্বল

হয়ে ওঠে, আর প্রজাপতি উড়ে উড়ে ফেরে এপিং জাঙ্গলের গাছে গাছে, তখন তাদের কাছে গিয়ে দরিদ্র ইংল্যাণ্ডবাসীর পক্ষে, সে সৌন্দর্যলোকে হৃদয় পূর্ণ করবার শ্রেষ্ঠ সময় সপ্তাহ-শেষ।

আজ সবদিক থেকেই ইংরেজের দৈন্য বেড়ে গেছে। কত ঘরে অশান্তি দিয়েছে যুদ্ধ, মূর্ত করেছে নানা অভাব। সংসারের অনটনের চাপে অন্যত্র সুখ পাবার আশায় কত গৃহস্থ-বধূ ঘর ছেড়ে গেছে। কোথাও শান্তি নেই, কোথাও সুখ নেই, তেমন করে বেঁচে থাকবার মতো অর্থও নেই সংসারে।

কিন্তু কি আছে তাদের? শীতের সময় যাদের মৃতপ্রায় মনে হয়েছিলো, গ্রীষ্মের সপ্তাহ-শেষে দেখি তাদের আছে প্রাচুর্য। নিজেকে প্রশ্ন করি, এতো প্রাণ-শক্তি ইংরেজ পেলো কোথা থেকে— এই দৃঢ়তা কে দিলো তাদের? উত্তরে ভাবি, হয়তো প্রকৃতি।

কঠিন শীতের পর সহসা একদিন ফুল ফুটে উঠলো, তাজা রোদ্দুরে ঝলমল করে উঠলো পত্রগুচ্ছ, আর ছোটো-বড়ো সকলেরই মনে হলো, আমরাও বেঁচে আছি।

অভাব তাদের ক্ষত-বিক্ষত করতে পারলো না, অশান্তি তাদের বিচলিত করলো না, যুদ্ধ তাদের প্রাণ-শক্তি ক্ষয় করতে সক্ষম হলো না।

যা গেছে তার জন্যে দুঃখ নেই, যা পেতে পারবো না তার ভাবনায় যা আছে তা নষ্ট হবে না—যা রইলো তাই ফুল হয়ে ফুটে উঠুক—তাই হোক সোনা।

সপ্তাহ-শেষে ইংল্যাণ্ডের ঘরে বাইরে দেখা যায় এই স্বল্প পুঁজি নিয়ে আনন্দ বাড়াবার প্রাণপণ আয়োজন।

ইউরোপ ও ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ

ভারতবর্ষের কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক যদি দেশে বসে মনে করেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে ভালো রচনা ভাষান্তরে ইউরোপে প্রকাশিত হলে সেখানেও তিনি সমান প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন তাহলে হয়তো তাঁকে হতাশ হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র আমাদের দেশে যতোখানি খ্যাতিলাভ করেছেন, ইউরোপে, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে, তার শতাংশের একাংশও পান নি—শরৎচন্দ্র তো প্রায় অপরিচিতই থেকে গেছেন।

সুইডেনের কোনো লেখক কিংবা ডেনমার্কের কোনো কবি নোবেল প্রাইজ পেলে তার কথা উল্লেখ করে আমরা প্রায়ই মন্তব্য করি, এমন লেখকও নোবেল প্রাইজ পেলো। এর চেয়ে লাখো গুণে ভালো লেখক তো আমাদের দেশে কতো রয়েছে—তাঁরা নোবেল প্রাইজ পান না শুধু ভারতীয় বলে।

কথাটা মিথ্যে নয়। ভারতীয় লেখক। তাঁর সমাজ, ভাবনা, চিন্তা—এ সমস্তর সঙ্গে ইউরোপীয় সমাজের আগাগোড়া অমিল। বাংলা থেকে ইংরেজী করার অর্থ শুধু ধরে ধরে অনুবাদ করা নয়; এই অমিল, এই প্রভেদ ঘুচিয়ে অন্য ভাষায় রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করা। সেকাজ একমাত্র তিনিই পারেন যিনি সাহিত্যিক এবং ভারতবর্ষ ও ইউরোপের সমাজের অলিগলি যাঁর নখদর্পণে।

অনেক ভারতীয় লেখক মাঝে মাঝে গর্ব করে বলেন, আমার অমুক লেখা ইংরেজীতে বেরুচ্ছে হে, পড়ে দেখো, অনুবাদ করেছে একেবারে খাঁটি ইংরেজ। যেন এবার তাঁর বিশ্ব-বিজয় রোধ করবে কে!

কিন্তু শেষ অবধি ফল হয় না কিছুই। ইংরেজকৃত অনুবাদ ইংরেজ পাঠকের কাছেই হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। একটি কথা এক্ষেত্রে

উল্লেখ না করে পারলুম না। মনে করুন কোনো ইংরেজ লেখক এদেশে এলেন এবং হাওড়ার উকিলবাবুর ওপর তাঁর উপন্যাস অনুবাদ করবার ভার দিলেন যেহেতু হাওড়ার উকিলবাবুর একমাত্র গুণ তিনি বাঙালী। সাহিত্যিক না হয়ে ইংরেজ লেখকের অনুবাদের ভার নিয়ে বাঙলার পাঠকের কাছে কি জিনিস তিনি পরিবেশন করবেন আশা করি সেকথা আরও স্পষ্ট করে বলবার প্রয়োজন নেই। একজন অসাহিত্যিক ইংরেজও ঠিক এই কাজ করেন। যুদ্ধের সময় একথার প্রমাণ তো এই কলকাতা শহরে বসেই আমরা পেয়েছি। অসাহিত্যিক ইংরেজ যোদ্ধা মাত্র দুবছরে বাংলা শিখে বাংলার প্রসিদ্ধ কবিদের সহযোগিতায় ইংরেজীতে তাঁদের কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন। তিনি আর কিছুই করেন নি—শুধু লাইন ধরে ধরে বাংলা থেকে ইংরেজী করেছিলেন। আমরা সকলেই তাই করি—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং আরও অনেক ভারতীয় লেখকের বেলায় ঠিক তাই করা হয়েছিলো। যে অংশ ইংরেজীতে একেবারে অচল, যা নির্মমভাবে সে-ভাষায় বর্জন করা উচিত আমরা সে অংশ লেখকের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলে সযত্নে প্রচুর পরিশ্রম করে ভাষান্তরে বিকৃত করেছি। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের কবিতার একটি লাইন 'এসো পাপ এসো সুন্দরী—'ইংরেজীতে করা হয়েছে, 'Come Sin, O Beautiful—'ইংরেজ পাঠক এ থেকে কি পাবে?

এমন অনেক লাইন, এমন অনেক অংশ, এমন অনেক গল্প-উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধ যা হয় একেবারে বাদ দিতে হবে, নয় যথার্থ অর্থ-বহ করে ইউরোপে পরিবেশন করতে হবে। কিন্তু কোন রচনা বিদেশী পাঠকের কাছে মূল্যবান বলে গৃহীত হবে তা মনোনীত করবেন কে?

কোনো দেশের কোনো ভালো রচনাই ফেলা যায় না, অনাদরে বিদেশের পাঠকের কাছে অবহেলা পায় না, শুধু জানা চাই দেশবিদেশে পরিবেশনের রীতিনীতি—কলাকৌশল।

অনেক ভারতীয় লেখকের অনেক প্রথম শ্রেণীর রচনা ইংল্যাণ্ডে আদর পায় নি কিন্তু ফ্রান্সে কিংবা ইউরোপের অন্যান্য কন্টিনেণ্টে আন্দোলন এনেছে। এর কারণ আবিষ্কার করা কঠিন নয়। ইংরেজীতে ভারতীয় অনুবাদকের অক্ষমতার জন্যে যা ভালোভাবে ফুটে উঠতে পারে নি—তাই যথার্থ রূপ নিয়েছে ফরাসী কিংবা জার্মান অনুবাদকের হাতে পড়ে; কেননা তাঁরা দুর্বল ইংরেজী থেকে অনুবাদ করলেও নিজেদের ভাষায় সেই বিষয়বস্তুর যথার্থ রূপ দিতে পেরেছেন। আরও একটা কথা, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের চিন্তাধারার প্রচুর অমিল থাকলেও কন্টিনেণ্টের সঙ্গে অনেক মিল, তাই সেখানে ভারতীয় লেখকের পক্ষে খ্যাতি লাভ করা ইংল্যাণ্ডের চেয়ে অনেক সহজ।

একটা কথা প্রায় শুনি—ইউনিভারসেল অ্যাপিল এবং শরৎচন্দ্রের সেটা ছিলো না বলেই নাকি তিনি বিশ্ববিজয় করতে পারেন নি।

একথা সব সময় মেনে নিতে কোথায় যেন বেধে যায়। বিদেশী পাঠক সব সময় চেনা চরিত্র চায় না, কিন্তু পেলে খুশি হয়, আর অজানা চরিত্র কিংবা দেশবিদেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধেও তার কৌতূহল কম নয়। শরৎচন্দ্র যদি নিজে কিছুদিন ইউরোপে বাস করতেন এবং সেখানকার হালচাল বুঝে রচনার অংশবিশেষ একটু এদিক ওদিক করে অনুবাদ সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করতেন তাহলে 'ইউনিভারসেল অ্যাপিল' কথাটির অসারত্ব সহজেই প্রমাণিত হয়ে যেতো! লেখক স্বয়ং ইউরোপে উপস্থিত থাকলে তাঁর প্রিয় বহু বিদেশী সাহিত্যিকের সহযোগিতায় সার্থক অনুবাদের বন্দোবস্ত করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ যতোবার তা করেছেন ততোবার কৃতকার্য হয়েছেন আর যখনই তা করেন নি তখনই ব্যর্থ হয়েছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের কথা কেন, ভারতবর্ষের যে-কোনো লেখক অনুবাদের উদ্দেশ্য নিয়ে বিলেত গেছেন তাঁরা ক্ষমতা অনুসারে যশোলাভ করেছেন বইকি। কেউ কেউ ক্ষমতার চেয়ে বেশি

প্রশংসালাভ করেছেন, শুধু শক্তিশালী সাহিত্যিক অনুবাদকের জন্যে।

ভারতীয় লেখক যদি নিজেকে পৃথিবীর কাছে পরিচিত করতে চান তাহলে তাঁকে স্বয়ং সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডে যেতে হবেই। সেদেশের পাঠকের রুচি তাঁর মতো সহজে আর কে বুঝবে! নিশ্চয়ই সেই রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি ফরমায়েশী সাহিত্য সৃষ্টি করবেন না, কিন্তু বুঝে নেবেন তাঁর পুরনো রচনার কোথায় কোন অংশ কিভাবে বর্জন করবেন আর স্থান-কাল-পাত্রের কথা স্মরণ করে কোন নতুন কথা প্রয়োগ করে ইংরেজ সাহিত্য-রসিক বন্ধুর সঙ্গে সহযোগিতায় সার্থক অনুবাদ প্রকাশ করবেন।

এই বন্ধুনির্বাচন আর-এক সমস্যা। বিলেত যাবার আগে অনেকে গায়ে পড়ে বলেন, দেবো কতকগুলো চিঠি দিয়ে, আলাপ করবেন গিয়ে—। কিন্তু কার সঙ্গে আলাপ করবো? মনের মতো লোক তো আপনিই জুটে যাবে। আর যদি না জোটে তাহলে আমার দুর্ভাগ্য।

এই মনের মতো লোক জোটাতে যা কালক্ষয়। তারপর যদি খবর রটে যে আপনি ভারতবর্ষের লেখক তখন শিক্ষিত কৌতূহলী বন্ধু-বান্ধবীর সংখ্যা আপনার দিনে দিনে বেড়ে যাবে। লেখক না হলেও ক্ষতি নেই, তারা যদি সাহিত্য উৎসাহী হয় তা হলেই কাজ চলে যাবে আপনার। এরা যদি আপনার ভাষা না জানে তা হলেও কিছু এসে যায় না—আপনি আপনার দীর্ঘ উপন্যাস তখন-তখন-করা ইংরেজীতে তাদের পড়ে শোনালেন—তারপর যখন তারা বিষয়বস্তু বুঝতে পারলো, গ্রহণ করলো উপন্যাসের মূল সুর তখন তারাই আপনার ভাষা না জানলেও আপনাকে সাহায্য করবে অনুবাদ করতে—আপনার বলা ইংরেজীর প্যারাগ্রাফকে সংশোধন করে তারা তাদের ইংরেজী বসিয়ে দেবে। বই প্রকাশিত হলে

আপনি অবশ্য উল্লেখ করলেন, Translated from Bengali by the author in collaboration with—নাম রইলো আপনার বন্ধু কিংবা বান্ধবীর।

এ কাজ দেশে বসে কিছুতেই হয় না। কারণ, যিনি ভালো ইংরেজী জানেন, তিনি হয়তো আপনার লেখা ভালো বাসেন না। আর এ দেশ থেকে ইউরোপে আপনার অপরিচিত প্রকাশককে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েও বিশেষ ফল হয় না। দূরত্বের অসুবিধা অনেক, আর যতো ভালো ইংরেজী আপনি লিখুন না কেন, ওদেশের সাহিত্যিক ও প্রকাশকের সঙ্গে সহযোগিতায় অনুবাদ করলে আপনি যতো সুযোগ-সুবিধা পাবেন, দেশে বসে তার কিছুই আপনি পেতে পারেন না। ব্যস, ইংরেজীতে অনুবাদ হলেই হলো—আর কিছু না করে আপনি যদি চুপ করে বসে থাকেন তাহলেও আপনার প্রকাশক উৎসাহ নিয়ে ইউরোপের অন্যান্য ভাষায় আপনার লেখা প্রকাশিত করিয়ে দেবেন। আপনার আর কোনো পরিশ্রম করবার দরকার নেই—কেননা বহুল উচ্চারিত ইংরেজী ভাষায় আপনার বই যখন বেরিয়েছে তখন আপনার নিশ্চয় কিছু মূল্য আছে আর যে ভাষা অনেক ফরাসী জার্মান ও কন্টিনেন্টের অন্যান্য জাতির বোধগম্য। পর পর এমন কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হলেই দেশে ফিরে একদিন আপনি দেখবেন সামান্য কষ্ট সহ্য করে ইউরোপ ভ্রমণ আপনার জীবনে কতোখানি সার্থকতা এনেছে।

ইউরোপের সমুদ্রতীর

তারপর একসময় যখন রোদ্দুরের তাপ বড় বেশী প্রখর মনে হয় তখন প্রচুর অনিচ্ছায় ক্লান্ত দেহ নিয়ে আস্তে উঠে বসি। আর আপন মনে অলস চোখ ফিরিয়ে দেখি কোথাও যেন আর এতটুকু জায়গা নেই। আমার ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে কিছুক্ষণ আগেকার-দেখা শূন্য স্থান ভরে উঠেছে সুইমিং-কস্ট্যুম-পরা অসংখ্য স্নানবিলাসী নরনারীর অলস-শয়নে। অবসর যেন রঙ-বেরঙের ফুল হয়ে ফুটে উঠলো ইউরোপের এই সমুদ্রতীরে!

বারো মাস আগে কবে ঝরে পড়েছিল এমনি সোনা-ঝলমল-করা দীর্ঘ পরিপূর্ণ দিন, শীতের কঠিন আঘাতে অবসন্ন আর কুয়াশার সেই একটানা অন্ধকারে পথ-চলা পরিশ্রান্ত পথিকের সে কথা তো মনে রাখবার কথা নয়। তাই মনে হয়, এমন করে এ-দিনের এই তুষারঘেরা দেশে আসবার কথা ছিল না—প্রকৃতির এই অকৃপণ উপহার যেন আকস্মিক—ব্যর্থ হবে না, বিফলে যাবে না, পথ-ভুলে-আসা হঠাৎ-দিনের একটি কণারও করা হবে না অপচয়। ইউরোপের জনসাধারণ যেন পণ করছে সমস্ত দেহমনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে হবে—অসীম শৈথিল্য দিয়ে উপভোগ করতে হবে প্রকৃতির হঠাৎ-ছড়ানো মুহূর্তগুলিকে। তারপর আসে এমনি আরও দিন—একের পর এক, অনেক। পথে ঘাটে হাটে—দিনের আলোয় যখন যেখানে যাই, যার সঙ্গে দেখা হয়, একমুখ হাসি নিয়ে সে শুধু বলে, সুন্দর দিন! কী উজ্জ্বল! অপরূপ!

ইউরোপের গ্রীষ্ম দিশেহারানোর কাল। ব্যবসায়ী ইংরেজের মনেও ক্ষণকালের জন্যে রঙ ধরে যায়। কাজে মন বসে না, পথ চলার গতিতে আসে শৈথিল্য। ফাইল ঠেলে দিয়ে জানালা দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করে অজস্র আলোর আলোড়ন আর অপরাধী

মনে করে নিজেকে। এই দিনগুলিকে নিরলস মুহূর্ত দিয়ে আঁজলা ভরে তুলে নেবে বলেই তো সারা বছর ধরে হাজার দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে সে নিয়মিত অর্থ সঞ্চয় করে গেছে। সব ভুলে, সব কাজ ফেলে একান্ত আপনার জনকে নিয়ে তাকে যেতেই হবে সেখানে যেখানে এ-আলোর এক কণাও হারিয়ে যাবে না অমনোযোগের অবসরে।

সেই বুঝেই যেন ট্রেনের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয় গভর্নমেন্ট। ওয়াটারলু স্টেশনে ভিড়, ভিক্টোরিয়ায় জায়গা নেই, ইউস্টন—কিংস-ক্রুশে স্বভাবগম্ভীর ইংরেজের কী কোলাহল জাগে।

যে যেখানেই থাক—সমুদ্র যেন ডাকে বেশির ভাগ যাত্রীকে। যাদের অর্থ পরিমিত তারা যায় ব্রাইটন, বোর্ণমথ, ডার্টমথ কিংবা হোভ—যাদের অবস্থা ভালো তারা গেলো আইল্ অব ওয়াইট কিংবা কর্নওয়াল, আর যারা বড়লোক তারা ইংল্যাণ্ডে যদি বাড়ি হয় তাহলে এ সময় তাকে নিজের সঙ্কীর্ণ গৃহকোণ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেই হবে দিশেহারানো আলোর উৎসবে।

সমুদ্রের ধারে—তীরের কোল ঘেঁষে অভিনন্দন জানায় কতো অজস্র ছোট বড় হোটেল। দেখলে মনে হয় গ্রীষ্মের অতিথি আসবে বলে যেন তারা এইমাত্র সাজ শেষ করে প্রস্তুত হয়েছে আপনাকে অভ্যর্থনা করে ঘরে তুলে নেবার জন্যে। কিন্তু হায়, কতবার যে ঠকেছি! অনাহূতের মতো যখনই সেখানে গেছি এই কথারই পুনরাবৃত্তি।

—কি নাম তোমার?

—অমুক—

—টেলিগ্রাম পাঠাও নি তো তুমি—দুঃখিত, জায়গা নেই।

এতো হোটেল—জায়গার অভাব কেন হবে আমার। ব্যর্থ আশা আবার সেই এক কথা। গায়ে পড়ে হোটেলওয়ালী উপদেশ দিয়ে দিলো। এ সময় আমরা বড় ব্যস্ত—আগে থেকে রিজার্ভ না থাকলে ঘর দেওয়া সম্ভব নয়। পরের বছর তাই কোরো।

ঘরে কতক্ষণই বা এ সময় থাকে লোক ! সারা দিন তো পড়ে থাকে সমুদ্রতীরে,—তবু ঘরের প্রয়োজন। হোটেলওয়ালীর কথা শুনে অকারণে কেন হাসি পেলো আমার। আজকের এই ব্যস্ততা—ঘর দেওয়ার এই অক্ষমতা কোথায় ছিলো দুদিন আগে। সুধায় ভরা এই কটি মাস তুলে দিয়ে যায় তাদের সারা বছরের খরচ। তারপর একে একে নিভিবে দেউটি। দেখতে দেখতে কখন কোথা দিয়ে কেটে যাবে মধুমাস—অতিথিরা বিদায় নিয়ে ফিরে যাবে। তখন আর হোটেলের ঘরে ঘরে এমন করে আলো জ্বালবে না কেউ। গালে হাত দিয়ে বসে বসে আগামী বছরের জন্যে শুধু প্রহর গুনবে হোটেলওয়ালা। শুকনো মুখে একদিন ছুটি দিতে হবে মেডকে। প্রতি বছরের মতো এবারেও যাবার বেলায় মেড ম্লান হেসে বলে যাবে, আমাকে মনে রেখো—আগামী বছর আবার ফিরে আসবো কিন্তু—

আগামী বছর! সে যে অনেক দূর। তবু সেই উজ্জ্বল দিনের কথা কল্পনা করে সজীব চোখে হোটেলওয়ালাকে হাতে হাত মিলিয়ে বলতেই হবে, তোমাকে নিশ্চয়ই মনে রাখবো—তোমার মতো কাজের মেয়ে আমি পাবো কোথায় প্লেডিস।

তাই আমাদের সকলের যখন ছুটি তখন সমুদ্রতীরের হোটেলের যারা মালিক তাদের কাজের শেষ নেই। রঙওয়ালা ডেকে রাঙিয়ে নিতে হয় দরজা জানালা—লক্ষ্য রাখতে হয় প্রত্যেক ঘরের কার্পেটের দিকে, হিসেবের নতুন খাতা কিনে দাগ টেনে টেনে ঘর ভাগ করে নিতে হয় নিজেকেই। সকাল থেকে রাত্তির অবধি ছুটোছুটি—গ্যাস উনুন বাথরুম রান্নাঘর খাবারের মেনু লেপতোশক বিছানা-বালিশ কতো কি। যারা বড়ো হোটেলের মালিক তারা আবার শুধু এটুকু করেই থামে না—সমুদ্রের ওপর যখন অন্ধকার নামে, বাতাস ভারী হয়ে ওঠে, তখন হোটেলে ফিরে আসে স্নান আর রৌদ্র বিলাসীর দল—তাদের কথা মনে করে হোটেলওয়ালা বাইরে

তৈরি করে কাঠের বিরাট নাচের জায়গা। সমুদ্রগর্জনের তালে তালে অনেক রাত অবধি নাচের বাজনা বেজে যায়, আর পায়ে পায়ে ঘেঁষে অক্লান্ত ছন্দে চলে কতো নর-নারীর আনন্দ-বিনিময়।

সুইমিং-কস্ট্যুম পরে সমুদ্র-তীরে আবাল-বৃদ্ধ ইউরোপীয়ের মতো অসঙ্কোচে গড়িয়ে পড়তে আমার অনেকবার বেধে গিয়েছিলো। কালো রঙ যে এদের মধ্যে বড় বেশি বেমানান—অযথা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কি লাভ হবে। তাই প্যাণ্টকোট পরেই ঘুরে বেড়িয়েছিলাম অনেক দিন। কিন্তু এ হলো উলটো। ওই করতাম বলেই সকলের কৌতূহলী চোখ পড়ল আমার দিকে। ভাবটা, লোকটা কে—পাগল নাকি—না হলে এই পোশাক পরে এমন আলো আর ঢেউ বিফলে যেতে দেয়। ব্যস, সে কথা যেই বোঝা আমিও ভিড়লাম তাদের দলে।

সামনে সমুদ্র—একের পর এক ঢেউ ভাঙছে। অগাধ আলোয় ঝলমল করছে চারপাশ। আমাব চারপাশে অজস্র নর-নারী। কেউ শুয়ে আছে, কেউ বসে আছে, কেউ গড়াগড়ি দিয়ে করছে রৌদ্র-স্নান, আর কেউ এর মধ্যেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—উঠে এসে ভিজে কস্ট্যুমে আবার রোদ্দুরে গড়াবে সারা দিন। তাই বলছিলাম, ঘরে আর এখানে লোকে থাকে কতক্ষণ। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সাঁতারের পোশাকে বেরিয়ে পড়লো, লাঞ্চ—মানে স্যাণ্ডউইচ কয়েকটি—সঙ্গে করেই নিয়ে এলো সমুদ্রের তীরে, সেখানেই খাওয়া সেরে নেবে এক সময়। তাছাড়া টুকটাক এটাওটা খাওয়া আর বাচ্চাদের বায়নায় এটাওটা কেনা তো আছেই।

অতগুলি হোটেল থাকলেও সুযোগ বুঝে এপাশে-ওপাশে আরও কতো রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছে ; কতো খেলনার দোকান—রঙবেরঙেব সুইমিং কস্ট্যুম নিয়ে নানাভাবে চেঁচিয়ে খদ্দের যোগাড়ের চেষ্টা করছে বুড়ো-বুড়ি। এদিকে সেই খোলা আকাশের নীচে কড়া

চাপিয়ে সসেজ ভাজছে একজন আর খুব তাড়াতাড়ি নিপুণ হাতে তার মেয়ে ভাজা সসেজ রুটিতে পুরে হাঁকছে সিক্স্‌পেন্স—সসেজ রোল। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ঝপাঝপ তাই কিনছে লোক। পটেটো-ক্রিশপ—আইসক্রীম—হে—চক—আইস—স্যুভেনির—স্যুভেনির। পাথরের পেপারওয়েট কিংবা লকেট কি অন্য কিছু সামনে সাজিয়ে বসে যুবতী মেয়ে শুধু বলছে, এখানকার স্মরণ-চিহ্ন না নিয়ে যাবে কেমন করে—এই নাও এসো আমার কাছে—দেখো কী সুন্দর বাটি। আর এই কোলাহল ছাপিয়ে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ।

নুলিয়া নেই। সমুদ্র কাউকে হরণ করতে চাইলে তরঙ্গের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাকে বাঁচাবার জন্যে হলদে পোশাক পরে যারা সব সময় ঘুরে বেড়ায় তাদের বলা হয়, লাইফ-গার্ল। আহা, এদের দেখে কতো যুবকের যে ডোববার সাধ হয় তার ঠিক নেই।

উঠে যাবার নাম করে না কেউ—স্নানের পর বালির উপরে সেই যে শুয়ে পড়ে—আর ওঠে সূর্য অস্ত যাবার পর। ঘরে ফেরবার তাড়া নেই—ডিনার তো দেবে সেই সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়। এখনও অনেক সময় আছে, এ সময়টুকু কী করা যায়। যাওয়া যাক আস্তে আস্তে যেখানে মেলা বসেছে সেখানে। এর মধ্যেই ভিড় জমে গেছে। মেরী-গো-রাউণ্ড, ছোটো ছোটো ইলেকট্রিক মোটর দ্রুত বেগে চালিয়ে ঘেরা-জায়গায় ঘোরা কিংবা বন্দুক দিয়ে লক্ষ্যভেদ করে পুরস্কার পাওয়া বা দোনলা-চেয়ারে বসে বোঁ বোঁ করে ঘুরে যাওয়া—সামান্য পয়সায় শিশুসুলভ আনন্দে কতো পরিণত মানুষের মন ভরে যায়। তার ওপর আরও কতো রকম ছেলেমানুষী জুয়োর বন্দোবস্ত আছে তার ঠিক নেই।

ওদিকে জলের ওপর অন্ধকার নেমেছে আর যেন সমুদ্রের থেকে ওঠা মিনারের মতো উদ্ধত দীর্ঘ 'পায়ারে' জ্বলে উঠেছে সহস্র আলো—তারই ছায়া বুকে নিয়ে নেচে নেচে ফিরছে ঢেউয়ের পর

ঢেউ। দিনের আলোয় এ 'পায়ারে'র এত সৌন্দর্যের কথা কল্পনাও করতে পারি নি। লোকে ছুটে আসে এদিকে। আর 'পায়ারে'র পরিচ্ছন্ন রেস্তোরাঁয় স্নানের পোশাকে অনেকক্ষণ ধরে কফির পেয়ালা সামনে নিয়ে বসে থাকে।

কোনো কোনো জায়গায় রোদ্দুরের জ্বালায় বেশীক্ষণ শুয়ে থাকতে পারি নি—হলদে বেলাভূমি ধরে মন্থর পায়ে অনেক দূরে চলে গেছি—দেখেছি অনেক বড় বড় ঢিপি—গুহায় ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা লুকোচুরি খেলে। এইসব গুহায় নাকি লোভী নাবিকেরা শুল্ক বাঁচিয়ে নানা মূল্যবান সব জিনিস লুকিয়ে রাখতো। আজ আর সেকথা কেউ মনেও রাখে না। কিন্তু তেমন করে ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাতে পারি নি। তথ্য জানবার চেষ্টা করে অপচয় করবার মতো অবসরও ছিল না। কবে পুড়ে গিয়েছিল ব্রাইটনের 'পায়ার' আর নতুন করে আবার নির্মাণের খরচ সম্পূর্ণ একা বহন করেছিলেন কোন লর্ড—সমুদ্রতীরে সর্বক্ষণ ব্যস্ত কর্মপ্রিয় ইংরেজের আশ্চর্য অলসতা দেখে এতো মন ভরে উঠেছিলো যে সে-খবর সংগ্রহ করবার আগ্রহই ছিলো না আমার। অন্য কোথাও বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি শুধু দুধের দোকান কিংবা ছোটো ছোটো কুটির—কথা বলে বুঝেছি অতিথিমাত্রেই তাদের কাছে বিদেশী, তা সে ইংরেজই হোক আর ভারতীয়ই হোক। অতিথির সঙ্গে তারা কম কথা বলে। সব সময় ভয় কী বলতে পাছে কী বলে ফেলে।

কত কথা যে জানবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভাষার প্রাচীর ভাঙতে পারি নি বলে এর বেশি আর কিছুই জানা হলো না।

সমুদ্রতীরে এক দম্পতির টুকরো টুকরো কয়েকটি কথাই শুধু স্পষ্ট মনে আছে।

—কিন্তু—

—বলো ডার্লিং।

—না, এ তো ভালোই হলো।

—কী ভালো হলো ?

—এমনি করে আমাদের বিয়ে করা ?

—নিশ্চয়ই ভালো হলো—খুব ভালো হলো—

—কিন্তু মা বাবা তো হ্যারীকে ডিভোর্স করেছি বলে আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

—তাদের কথা বাদ দাও—আমরা ভালো বুঝেছি বলেই তো এ কাজ করেছি, আর শেষের দিকে হ্যারীর সঙ্গে ঘর করা তোমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল না কি ?

—তা তো ঠিক।

—তবে সারাজীবন ধরে শুধু অভিনয় করে কী ফল পেতে তুমি ?

—তবু—

—কি ?

—কি জানি, ডিভোর্স করা মেয়েদের সম্পর্কে তো সকলের ধারণা ভালো নয়।

—তাতে কী হলো আমাদের ?

—সেদিন তো মা স্পষ্ট বললেন, হ্যারীর কোন দোষ নেই, সব দোষ তোর। এমন করে যে মেয়েরা ঘর ভাঙে তারা নিজেরাও দুঃখ পায়, পরকেও দুঃখ দেয়—

—তুমি আজও হ্যারীকে ভালোবাসো পেগী। হাতের কাছে পেয়ে ঝোঁকের মাথায় আমাকে তোমার বিয়ে করা উচিত হয় নি—

—বাজে কথা বোলো না। এ-কি, এই, তুমি রেগে গেলে নাকি ?

উত্তর শোনা যায় না।

মুহূর্তকালের জন্য দিশা হারাই। শুধু ঢেউ ভাঙছে, ঢেউ-এর পর ঢেউ—জীবনের কত ঢেউ !

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও নোবেল পুরস্কার

বাংলার অনেক জনপ্রিয় সাহিত্যিক প্রায়ই বিলেতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁদের বাসনা শুধু দেশভ্রমণ কিংবা হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার নয়, তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁদের আদর্শ ব্যাপক।

আমার পরিচিত সেই সব যশস্বী সাহিত্যিকের কথা শুনে সহজেই বুঝে নিতে পারি যে, তাঁরা এদেশের মতো পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও লেখক বলে পরিচিত হতে চান।

কোনো বাঙালী লেখক যখন নিজের সাহিত্য-প্রতিভার দ্বারা উপার্জিত অর্থে সুদূর সিন্ধুপারে যাবার কল্পনা করেন তখন কি জানি কেন, আমার সমস্ত দেহে আনন্দের শিহরণ জাগে।

ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি বাঙালী লেখক নাকি গরিব। দুঃস্থ সাহিত্যিকের 'মেসে' একটানা ক্লান্তিকর নীরস দিন কাটানোর মর্মান্তিক ইতিহাস আর কে না জানে! আজও পাঠক-সাধারণ মাঝে মাঝে আমাকে বলতে দ্বিধা করেন না, বাংলার লেখকরা অর্থকষ্টে দিন কাটান।

এসব কথা শুনে আমার মনে হয় শুধু সাহিত্যিক কেন আবহমান কাল থেকে এই দুঃস্থ দুর্নামের ভাগী হয়ে আসছে? বস্তুত, এ সংসারে অক্ষম লোক মাত্রেই গরিব। কিন্তু আশ্চর্য, তাদের বেলা লোকে সমগ্র কুলের ওপর 'দরিদ্র' দুর্নাম দেয় না। এক অক্ষম ডাক্তার যদি সারা মাসে কুড়ি টাকা রোজগার করে তাহলে কেউ বলবে না, ডাক্তারি করে কী হয়, কিছুই তো পাওয়া যায় না।

জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে যারা কৃতকার্য হতে পারলো না তাদের তুলনায় নিঃসন্দেহে সাহিত্যিক সবচেয়ে দরিদ্র। কিন্তু একথা ভাববার সময় আমরা আর একটি বড়ো কথা ভুলে যাই যে, জীবনে কৃতকার্য কিংবা অকৃতকার্য, সাহিত্যিক যাই হোন না কেন,

তিনি পরিমাণ বিশেষে এমন আশাতিরিক্ত কিছু লাভ করেন, যার নাম দিই, যশ।

শুধু যশে পেট ভরে না। আর পেট ভরে না বলেই, একজন লেখকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নানা ছোটো কাজ করে সংসার চালাবার ব্যবস্থা করতে হয়। একজন দুঃস্থ ডাক্তার হয়তো তা কোনোদিনও করেন না। আমরা সাধারণত শুনি না যে, কোনো এম-বি ডাক্তার পোস্ট অপিসে কেরানীগিরিও করেন, আবার ডাক্তারিও করেন।

তাই আজও পাঁচজন ধরে নেন যে, যতো বড় লেখক হোন না কেন তাঁকে লেখা ছাড়া অন্য কিছু করতেই হবে, তা না হলে তাঁর কিছুতেই দিন চলবে না।

কথাটা একাংশে সত্যি বৈকি। ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি আর সাহিত্যিক—এদের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ। সাহিত্যিকদের জন্য এমন কোনো স্কুলকলেজের ব্যবস্থা নেই যেখান থেকে পাশ করে বেরোলে—সাহিত্য করার অধিকার পাওয়া যায়। তাই হঠাৎ একদিন যে কোনো লোক নিজেকে লেখক বলে ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু ডাক্তারি করার সময় তা করা সম্ভব নয়।

একটিতে বিশেষ বিদ্যা দরকার, অন্যটিতে তা না হলেও চলে। তাই দুই বিভাগের নিয়মকানুন আলাদা।

আগে কবিরা ছিলেন অন্য জগতের মানুষ। জীবনের সঙ্গে কাব্যের যোগ না থাকলেও ক্ষতি ছিলো না, অনেকে মনে করতেন সাহিত্য কল্পনা বিলাস মাত্র। আজ সাহিত্যে নানা পরিবর্তন হয়েছে এবং কবি হলেই যে ঝাঁকরা চুল রেখে মুখের ভাব উদার করে চলেফিরে বেড়াতে হবে তাও কেউ ধরে নেন না।

তারপর আসে অর্থ উপার্জনের কথা। আমরা অনেকেই জানি, যে লেখক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন বর্তমানে তাঁর অর্থের অভাব নেই। তবু তিনি অন্য কিছু করেন কারণ সব সময় লেখা তাঁর পক্ষে হয়তো সম্ভব নয়, নিজের মেজাজ বুঝে তাঁকে চলতে হয়।

অতীতে সাহিত্যিকরা অর্থকষ্টে দিন কাটাতেন কারণ তখন মনের শিক্ষার দিকে মানুষের এতো বেশি ঝোঁক ছিলো না, আজকের মতো জীবনে বইয়ের প্রয়োজন ছিল না।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকরা যে পূর্বে অর্থকষ্ট পেয়েছেন তার চেয়ে দুঃখের কথা বোধ হয় আর কিছু নেই। শিক্ষার মান যতো বাড়বে, লোকে পড়াশোনার দিকে যতো বেশি আকৃষ্ট হবে, লেখকের আর্থিক অবস্থা ততো বেশি ভালো হবে।

কিন্তু আশ্চর্য আজও অনেকের বিশ্বাস যে, যতো বড় সাহিত্যিক হোন না কেন, অর্থকষ্টের হাত থেকে তিনি কিছুতেই মুক্তি পেতে পারেন না। যখন এসব কথা শুনি তখন আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, শুধু সাহিত্যিক কেন, অর্থকষ্টের হাত থেকে কে মুক্তি পেতে পারে?

তারপর নানা কথা ওঠে, মাইকেল, নজরুল—এই সব কবিদের নাম উল্লেখ করে তাঁরা বলেন, অতো বড়ো কবির যখন অমন অবস্থা হয় তখন আপনারা তো তুচ্ছ!

অবশ্য সেই সব পাঠকের কথায় কিছু মনে না করাই উচিত। তবু তাঁদের কথা শুনে আমার বলতে ইচ্ছে করে, আপনারা যাঁদের নাম করলেন, সেই সব লেখক যদি লক্ষ টাকা উপার্জন করতেন তাহলেও তাঁদের সেই একই অবস্থা হতো। কবি ছাড়া মাইকেল অন্য কিছুও যে ছিলেন, দারিদ্র্যের কথা উঠলে আশ্চর্য হবে লোকে শুধু সেই কথাটাই ভুলে যান। দুঃস্থ দুর্নাম, যেন কেবলমাত্র বাঙালী সাহিত্যিকদের জন্যেই।

হয়তো এত কথা বর্তমান আলোচনার সংক্ষিপ্ত আসরে অবান্তর। আমার বলবার আসল কথা হলো জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগে যে কোনো ক্ষেত্রের যে কোন মানুষ কঠিন সংগ্রামের সম্মুখীন হয়। কিন্তু সাহিত্যিক ছাড়া অন্য কারুর বেলায় আমরা বলি না, ব্যারিস্টাররা বড় গরিব, শ্বশুরের পয়সায় পোশাক কেনে কিংবা ডাক্তাররা দাদার টাকায় ডিসপেন্সরি খোলে।

এখানে আরও একটা কথা বলা দরকার। সাহিত্যিকদের জীবনযাত্রার ধরন একটু আলাদা। প্রচুর অর্থ পেলেও সহসা তাঁরা নাইট ক্লাবে গিয়ে সেকথা জাহির করেন না কিংবা ঘন ঘন বাইরে লাঞ্চ ডিনার খেয়ে আর পাঁচজনকে বোঝাবার চেষ্টা করেন না তাঁর বর্তমান মাসিক আয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর মতো।

হিসেব করে একজন লেখকের পক্ষে চলা কিছুতেই সম্ভব নয়। কাজেই আমরা যখন একজন লেখকের আর্থিক অবস্থা নিয়ে কথা বলি তখন আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আর্থিক অনটনের জন্যে দায়ী লেখক নিজে, দায়ী তাঁর কোমল স্বভাব আর বেহিসেবী মন। এমন তরুণ মনের জন্যেই কোনো কবি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ফেলেন, কেউ মাসে হাজার টাকা রোজগার করলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় জীবনের শেষ দিন অবধি তাঁর অর্থকষ্ট থেকে যায়।

তবু এতো করেও সম্প্রতি ক্ষমতাশালী সাহিত্যিকরা সকল রকম অভাবের হাত থেকে মুক্তি পেতে আরম্ভ করেছেন এবং জীবনে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে হলে যে জিনিসগুলির প্রয়োজন সেগুলি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তাঁরা সংগ্রহ করছেন।

বাংলাদেশে আরও অনেক লেখক আছেন যাঁরা ইচ্ছে করলে আরও ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারেন যদি তাঁরা তাঁদের স্বভাব-সুলভ সরলতা সংযত করতে পারেন।

হয়তো তাতে খুব বেশি দুঃখ করবার নেই। বেহিসেবী যৌবন জীবন-শিল্পীকে যদি জীবনের শেষ অবধি মাতাল করে রাখে তাহলে ক্ষতি কী। লোকে তাঁর যতই নিন্দে করুক না কেন, তিনি তো নিজেকে বঞ্চিত করেন নি পৃথিবীর অফুরন্ত রূপ, রস, গন্ধ থেকে। সে-অনুভূতির তীব্র তোড়ের কাছে অর্থকষ্ট কিছু নয়।

সে কথা জানি। তবু সংসারে থেকে দৈনন্দিন দাবি অস্বীকার করার উপায় নেই। যে লেখকরা এতদিন তা করে গেছেন, তাঁদের

সাধারণ মানুষ কৃপা করেছে আর তাঁরা নিজেরা শুধু শুধু কষ্ট পেয়েছেন।

এখন আস্তে আস্তে সকল কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে। পার্থিব যা কিছু দিনে দিনে সবার উপরে আসন নিচ্ছে। লেখকরা দেশের কথা ভেবে, দশের কথা মনে করে সচেতন হয়ে উঠেছেন। গজদন্ত-মিনারে বসবাস করবার দিন নতুন হাওয়ায় শেষ হয়ে এলো। যে আত্মসচেতন শক্তিশালী লেখকরা পৃথিবীর মঙ্গল চান তাঁরা আমাদের নমস্য। আমি তাঁদের কথা দিয়েই একেবারে প্রথমে আরম্ভ করেছিলাম। এখন আবার তাঁদের আলোচনায় ফিরে যাই।

এই বাংলার লেখকরা আজ বিলেত যেতে চান। অন্তত মাঝে মাঝে সেখানে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বর্তমানে এদেশের পক্ষে তার চেয়ে আনন্দের কথা আর কিছু নেই। লক্ষ লোক তো প্রতিদিন বিলেত যাচ্ছে। কতো ছাত্র, কতো বড়লোক, কতো সরকারী কর্মচারী, কতো স্তরের কতো ধরনের লোক। অথচ আশ্চর্য, যাঁরা সংস্কৃতি-বিনিময়ের অগ্রদূত তাঁরা নিজেদের পরিধি সঙ্কীর্ণ করে রাখলেন। কেউ কেউ সংসার আত্মীয় পরিজনের দোহাই দিলেন, কেউ কেউ আরও নানা অজুহাতে বিলেত যাওয়ার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন। আর যাঁরা অনেক অর্থকষ্ট ভোগ করে হঠাৎ অতি মাত্রায় সঞ্চয়ী হয়ে গেছেন, তাঁরা পালটা প্রশ্ন করেন, বিলেত গিয়ে কী হবে?

যাঁরা একথা বলেন, যাঁরা ইচ্ছে প্রকাশ করে শেষ অবধি চুপ করে যান, যাঁরা ভয়াবহ খরচের কথা ভেবে দ্বিতীয়বার বিলেত যাবার কথা ভাবতে সাহস পান না, যদি তাঁরা আজ সত্যি বিদেশে পাড়ি দেন তাহলে সেখানে গিয়ে সহসা একদিন হয়তো উপলব্ধি করবেন, কী বিপুল যশ তাঁদের জন্যে তোলা রয়েছে।

বস্তুত ইউরোপে মাত্র দু-একজন অতি সাধারণ বাঙালী লেখকের নাম ছাড়া অন্য কোনো নাম পরিচিত নয়। কিন্তু একথা তো

অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আজ বাংলায় যতো শক্তিশালী লেখক আছেন, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে ততো আছে কিনা সন্দেহ।

বাঙালী লেখকের তুলনায় অনেক শক্তিহীন লেখক শুধু ইউরোপে জন্মগ্রহণ করে অন্য ভাষায় লিখেছেন বলে আজ পৃথিবীজোড়া যশের অধিকারী হয়েছেন। তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা আমার একেবারেই উদ্দেশ্য নয়। তাঁরা নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান। কিন্তু আমার বলবার কথা হলো তাঁদের চেয়েও অনেক প্রতিভাবান লেখক বাংলাদেশে আছেন।

আজও অনেক বাঙালী পাঠক আছেন যাঁরা বিনা দ্বিধায় বাঙালী সাহিত্যিকদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলেন, আমি বাংলা পড়ি না, কন্টিনেণ্টাল লিটারেচর পড়ে বড়ো আনন্দ পাই।

যদি তাঁদের বলা হয়, প্রমাণ করুন, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের চেয়ে পৃথিবীর কোন্ দেশের আধুনিক সাহিত্য আরও বেশি সমৃদ্ধ, তাহলে হয়তো তাঁরা চুপ করে থাকবেন।

আমরাই বিদেশী লেখকদের নিয়ে বেশি মাতামাতি করি। কেউ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন শুনলে তাঁর সম্বন্ধে নানা তথ্য জোগাড় করে কাগজে কাগজে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি। সেটা নিঃসন্দেহে খুব বড়ো কাজ। জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার চেয়ে আনন্দের কথা আর কী হতে পারে। কিন্তু যখন আমরা কোনো বিদেশী উপন্যাস অনুবাদ করি কিংবা নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কোনো লেখকের নানা তথ্য জানবার প্রাণপণ চেষ্টায় গলদঘর্ম হই, তখন কেন ক্ষণকালের জন্যেও আমাদের মনে হয় না, হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন?

মার্কিন লেখকরা বর্তমানে লিপিচাতুর্য দেখাচ্ছেন সেকথা আমরাই দিনের পর দিন প্রচার করি। কিন্তু কেন আমরা একবারও সাহস করে বলবার তেমন চেষ্টা করি না প্রতিভাবান লেখক এই বাংলাদেশেও থাকতে পারেন।

আমাদের দেশের কোনো লেখকের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লেখকের তুলনা করে অপ্রিয় হবো না। শুধু বলবো, সময় এসেছে। আর অপেক্ষা করা চলে না। বাঙালী লেখকদের ভারতবর্ষের কথা মনে করে এবার পৃথিবীর লেখকদের পাশে প্রচুর আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়াতে হবে। আত্মশ্লাঘা মূর্খের কাজ কিন্তু আত্মবিশ্বাস না থাকলে নিজেকে কোথাও সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না। অনেক বাঙালী লেখকের শক্তি আছে, অর্থ আছে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আত্মবিশ্বাস নেই। তা যদি থাকতো তাহলে হয়তো এর মধ্যেই তাঁদের অনেকে বিশ্ববিজয় করে নিতে পারতেন।

আরও ব্যাপকভাবে এবার সেকথা বলি। বাংলাদেশের লেখকের খ্যাতি সাধারণত শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁরা মাঝে মাঝে অনুবাদে উৎসাহ প্রকাশ করেন বটে এবং হিন্দি গুজরাটি ভাষায় তাঁদের দু-একটি উপন্যাসও অনূদিত হয়। কিন্তু প্রতিভার তুলনায় তাঁদের যে পরিমাণ খ্যাতি হওয়া উচিত তা হয় না। হয় অনুবাদ খারাপ হয়, নয় প্রকাশক ভালো হয় না। আর ছায়াচিত্রের মাধ্যমে তাঁদের চিন্তাধারা অন্যান্য প্রদেশের লোকের কাছে পরিবেশিত হয় বটে কিন্তু চিত্র-পরিচালকেরা তাদের নিজেদের চিন্তাধারার পরিচয় এত বেশি দেবার চেষ্টা করে যে, লেখকের কাহিনী শেষ অবধি কতটা থাকে বোঝা কঠিন।

আমাদের দেশের লেখকরা মাদ্রাজ-গুজরাটের কথা কিছু কিছু ভাবলেও বিলেতের কথা তেমন করে ভাবেন না। ছেলেবেলা থেকে, 'সাহিত্য করে কী হবে?' 'যাদের কিছু হয় না তারা লেখক হয়'— এই ধরনের নানা কথা শুনতে তাঁরা এমনই অভ্যস্ত যে, তাঁদের পক্ষে কি করে পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয় সেকথা ভাবা কঠিন।

অথচ কয়েকটি বাংলা উপন্যাসের যদি ভালো অনুবাদ প্রকাশ করা যায় তাহলে ইউরোপে সাড়া জাগা সম্ভব এবং নোবেল কমিটি তালিকায় তাঁদের নাম ওঠা বিচিত্র নয়।

‘নোবেল প্রাইজ’ কথাটি শুনলে বাঙালী লেখকরা মুচকি হেসে চুপ করে থাকেন—যেন তাঁদের কাছে সে পুরস্কার হলো সুদূরের চাঁদ। অথচ ইউরোপের যাঁরা সে পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই কি সত্যি তাঁদের চেয়ে প্রতিভাবান?

এক কথায় উত্তর দেয়া চলে, না—তাঁরা নন। কিন্তু তাঁদের তদারকের জোর আছে। নানা ভাবে নরওয়ে সুইডেন গিয়ে নোবেল কমিটির কাছে তাঁদের প্রমাণ করতে হয়, দেশে লেখক বলে তাঁদের বিলক্ষণ খ্যাতি আছে।

নোবেল পুরস্কার হলো স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ব্যাপার। তাই প্রাইজের তালিকা খুললেই দেখা যায় যে, নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্কের বহু লেখক এই পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁদের লেখা এমন কিছু আলোড়নকারী নয় এবং খুব কম লোক তাঁদের নাম শুনেছেন।

নোবেল পুরস্কার পেলে একজন বাঙালী লেখকের জীবন ধন্য হয়ে যাবে কিন্তু ইংরেজ লেখক তা নিয়ে বেশি ভাবনা করেন না। এমনকি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সংবাদ লণ্ডনের দৈনিক পত্রিকাগুলিতে সাধারণ খবর হিসাবেই প্রকাশিত হয়।

কোনো প্রাদেশিক সাহিত্য সমিতি যদি প্রতি বছর বাঙালী লেখককে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেয় তাহলে লেখকরা টাকার কথা ভাববেন বটে কিন্তু যাঁরা সে-পুরস্কার দিলেন তাঁদের বড়ো দরের সমালোচক বলে মনে করবেন না। নোবেল কমিটির ওপর একজন ইংরেজ লেখকের প্রায় তেমন ধারণা।

কিন্তু ইংরেজ লেখকের ধারণা যাই হোক বাঙালী লেখক তাঁর স্বভাবসুলভ ভীরুতার জন্যে নোবেল প্রাইজকে আজও একেবারে নাগালের বাইরে বলে মনে করেন। একথা তাঁদের বর্তমানে আর ভাবা সঙ্গত নয়।

১৯৫০ সালের মাঝামাঝি নরওয়ের চারজন শিক্ষিত ভদ্রলোক কি কাজের জন্যে যেন লণ্ডনে বেড়াতে আসেন। ঘটনাচক্রে ইণ্ডিয়া

হাউসে লাঞ্চের টেবিলে তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায় এবং একথা সেকথার পর নোবেল প্রাইজের কথাও উঠে পড়ে। তখন অবধি আমার ধারণা ছিলো সে-পুরস্কারের আয়-ব্যয় হিসেব-নিকেশ সবই বুঝি সুইডেনে করা হয়। তাঁদের মুখে শুনলাম ট্রাস্টীরা থাকে নরওয়েতে। সবই সেখানে করা হয়, সুইডেনে শুধু প্রাইজ দেয়া হয়।

আমাদের দেশের লেখকদের কথা মনে করে এই পুরস্কার দেয়ার নিয়মাবলী বিস্তৃতভাবে জানবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম এবং সে-প্রসঙ্গ তোলবার সুযোগ খুঁজছিলাম।

ঠিক এই সময় সংস্কৃতি বিনিময়ের জন্যে ভারতবর্ষের লেখক সম্পর্কে তাঁদের উৎসাহ অত্যন্ত বেশি। কিন্তু দুঃখের কথা, নির্বাচনের জন্যে ভারতীয় লেখকের লেখা তাঁরা মোটেই পান না। যাঁদের রচনা পান তা খুব উল্লেখযোগ্য নয়। আর সেই সব লেখকরা অন্য প্রদেশের লোক, আধুনিক বাঙালী লেখকের কোনো লেখাই নোবেল কমিটিতে আজ অবধি পৌঁছয় নি।

এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কী থাকতে পারে। বাঙালী লেখকেরা জন্মগত আলস্য আর স্বভাবসুলভ ভীরুতার জন্যে নিজেদের পরিধি সংকীর্ণ করে যদি দীনের মতো দিন কাটিয়ে তিলে তিলে শেষ হয়ে যান তাহলে সে-লজ্জা শুধু তাঁদের নয়, সে-কলঙ্ক সমগ্র ভারতবর্ষের।

আমরা সকলেই জানি রচনায় কী কী উপাদান থাকলে একজন লেখক নোবেল পুরস্কার পেতে পারেন। অন্তত পৃথিবীর যে সমস্ত লেখকেরা এই পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের রচনায় ব্যাপক মনের ইঙ্গিত আর বিশাল পরিধির সুস্পষ্ট ছবি রয়েছে। প্রতিদিনের সংকীর্ণ স্বার্থ আর তুচ্ছতায় আবিল মন সহসা যদি স্পর্শমণির ছোঁয়ায় সুমেরুশিখরে সূর্যের মতন জ্বলে ওঠে তাহলে পাঠক সহজেই বুঝে নেয় সেই বিশেষ লেখক জীবনকে ব্যাপকভাবে দেখেছেন এবং তাঁর

অন্যান্য রচনায় তাই দেখাবার চেষ্টা করেন। আমাদের দৈনন্দিন স্বার্থ বঞ্চনা কলহ বিদ্বেষ রাজনৈতিক আন্দোলন ও দারিদ্র্যের দুঃসহ নিপীড়ন—এসবের ঊর্ধ্বে কি আর কিছু নেই যা আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, যা আমাদের সিসে থেকে সোনা ফলাবার প্রেরণা জাগায়? ভারতের আকাশ যে ত্যাগের মন্ত্রে, ধ্যানের মন্ত্রে, শক্তির প্রেরণায় যুগযুগান্তর থেকে প্রতিধ্বনিত, যার লাগি রাজপুত্র জীর্ণ কন্থা পরে—ভারতবর্ষের সেই শাশ্বত বাণী যাঁর লেখনী শোনাবার চেষ্টা করবে তাঁরই জন্যে যে সমগ্র পৃথিবীর যশ মান বৈভব—সে কথা নতুন করে বলবার কি প্রয়োজন।

আনন্দের কথা যে তেমন লেখকের অভাব বাঙলা দেশে আজ আর নেই। কিন্তু দারিদ্র্যের জন্যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভাবে, ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের উদ্দাম হাওয়ায় সেই সব লেখকরা চাপা পড়েছিলেন।

তাঁদের অবস্থা আরও খারাপ করে তুলেছিলো তথাকথিত বিদগ্ধ জন। যারা বিলেত থেকে ফিরে স্লিপিং স্যুট পরে রাত কাটাতো আর দিনের বেলা হ্যাভানা চুরুটে টান মেরে পূর্বপুরুষের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় ড্রেসিং গাউন পরে ইউরোপের লেখক সম্পর্কে বড়ো বড়ো বিশেষণ বসিয়ে দুর্বোধ্য প্রবন্ধ লিখে পাণ্ডিত্য জাহির করতো। তখন তারা যদি বাঙলার শক্তিমান লেখকদের তুচ্ছ না করে দু-একটি ভালো বাংলা উপন্যাস ইংরেজীতে অনুবাদ করতো তারা তাহলে দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করতো।

সুখের বিষয়, আজ সেইসব তথাকথিত বিদগ্ধ জনের দিন শেষ হয়ে গেছে। তেমন কোনো লোকের আবির্ভাব হলে পাঠকসাধারণ আগেকার মতো আর প্রাধান্য দেয় না, বরং বিদ্রূপ করে। তাদের কল্পিত গজদন্তমিনারে পড়েছে সাধারণ মানুষের উন্মত্ত আঘাত, টুকরো টুকরো হয়ে গেছে তাদের আশ্রয়স্থল। যে ময়দানের পাশে দামী মোটরগাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে হাওয়া খেতে খেতে বাঙালী পাঠককে

ধোঁকা লাগাবার জন্যে তারা স্পেংলারের বিভীষিকা কিংবা ওই ধরনের কথার আরও প্রয়োগ করতো আজ উদ্যত প্রাণের প্রকাশে বিরাট মিছিলের ভয়ে তাদের তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হয়—আরও সরতে হবে—একেবারে শেষ হয়ে যেতে হবে।

তাই আর দেরি নয়। অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। এবার লেখকদের সতর্ক হতে হবে। নোবেল পুরস্কারের কথা উঠলেই পরিহাস মনে করে লজ্জা পেলে চলবে না।

সংস্কৃতি বিনিময়ের স্বর্ণক্ষণ এসেছে। যে বাঙালী লেখকদের অর্থ প্রতিভা যশ—সবই আছে তাঁরা কেন এখনও পৃথিবী মন্থন করে নিজেদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করবেন না? বিলেতে কোনো বড়ো কাজ করতে পারলে লেখক শুধু নিজে যশ লাভ করবেন না, সমস্ত বাঙালী লেখকের প্রতিনিধি হয়ে প্রমাণ করবেন তাঁরা শখের সাহিত্যিক নন, তাঁরা জীবনশিল্পী; সময়মতো পৃথিবী তাঁদেরও একদিন স্বীকার করবে।

একথা বলছি কারণ চেষ্টা না করলে কিছু হয় না। প্রতিভাবান বাঙালী লেখকদের বিদেশে গিয়ে সক্রিয় হতে হবে। প্রথমে তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করতে হবে।

লেখকের কাজ শুধু এই করেই শেষ হলো না। তিনি অনূদিত গ্রন্থ উপহার দেবেন লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের ও নামকরা কবি-সাহিত্যিকদের।

তারপর তাঁকে কন্টিনেন্ট যেতে হবে এবং ভারত সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করে তাঁর ইচ্ছে স্পষ্ট জানাতে হবে। সেখানেও সন্ধান নিয়ে প্রসিদ্ধ লোকদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে যেন মনীষীরা তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। ফ্রান্স, ইটালি ও ইউরোপের অন্যান্য কন্টিনেন্টের প্রসিদ্ধ লেখকদের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর উপন্যাসের অনুবাদ উপহার দিলে ভালো হয়। কোনো বাংলা উপন্যাস যদি ভালো ইংরেজীতে অনুবাদ করানো যায়

এবং ইংল্যাণ্ডে তা সামান্য আলোড়ন আনে তাহলে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় তা খুব সহজেই অনূদিত হয়ে যায়।

অনেক লেখক বিলেতে গিয়ে সে-দেশের লেখকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু শুধু হাতে তা করে লাভ নেই কারণ তাহলে আমাদের লেখককে সেই বিশেষ বিদেশী লেখকের ভক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। আর হয়তো বাঙালী লেখক সেই বিদেশী লেখকের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান। তাই সব সময় অনুবাদ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত।

অনুবাদপ্রসঙ্গে লেখককে খুব সতর্ক হয়ে বই নির্বাচন করতে হবে কারণ যে লেখা বাংলাদেশে আলোড়ন এনেছে, বিদেশে সে লেখা হয়তো এতটুকু স্বীকৃতি না পেতে পারে।

এই উদ্দেশ্যপূর্ণ ভ্রমণের জন্যে যে-টাকা খরচ হবে বাংলাদেশে এমন বহু লেখক আছেন যাঁরা তা ব্যয় করতে পারেন। তাহলে কেন তাঁরা কূপমণ্ডুকের মতো দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন? রাতারাতি বিশেষ পুরস্কার না পেলেও নির্বাচনতালিকায় তাঁর নাম ওঠা অসম্ভব নয় এবং ইউরোপের মনীষীবৃন্দের সঙ্গে তিনি পরিচিত হবেন, তাঁর পাঠক বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকবে।

সংস্কৃতি বিনিময়ের জন্যে আজ বিশ্ব ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। লেখক হলেন চিন্তাধারা আদান-প্রদানের অগ্রদূত; তাই আজ শক্তিমান হয়ে নিজের পাওনা সম্পূর্ণ আদায় না করে কেন তিনি অকারণে বঞ্চিতের দাহ বহন করে বেড়াবেন।

বিলিতি প্রেম

সে বছর শীতকালে তুমি যদি অলিভকে দেখতে তাহলে কিছুতেই চিনতে পারতে না। মেয়ে আমার খায় না দায় না হাসে না নাচে না বাইরে যায় না, শুধু গুম হয়ে বসে থাকে। তুমি যেন আবার ওকে এসব কথা বলতে যেও না; কী ব্যাপার হয়েছিলো জানো? মেয়ে আমার সেই প্রথমবার প্রেমে পড়েছিলো। কিন্তু তিন মাস পর সে-ছেলের অলিভকে আর ভালো লাগলো না। মনের কথা স্পষ্ট করে তাকে জানিয়ে দিয়ে রিচার্ড বিদায় নিলো।

অলিভ আর কী বলবে বলো। সে অবশ্য এমনি করে হঠাৎ রিচার্ডকে হারাবার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। কিন্তু তাকে সে কথা কেমন করে তখন জানাবে। যা ভেঙে গেছে তা জোড়া দেবার চেষ্টা করে নিজের দৈন্য প্রকাশ করা বোকামি। তা করে কিছু লাভও হয় না। যা স্বতঃস্ফূর্ত নয় তা ভঙ্গুর। কিন্তু অলিভের বয়স তখন ঠিক সতেরো। ওর কি আর এত কথা বোঝবার মতো বুদ্ধি ছিলো! সে তো বাড়ি ফিরে কেঁদেই সারা। কী কান্না— কী কান্না! কেবলই আমাকে বলে, বল মা, রিচার্ড ফিরে আসবে কিনা, যেমন করে হোক তাকে ফিরিয়ে এনে দাও।

মেয়ের রকম দেখে আমি তো হেসেই বাঁচি না। আরে বাপু, আমরাও তো ওর মতো কত প্রেম করেছিলাম। কিন্তু কই ওর মতো করুণ অবস্থা তো আমার কখনও হয় নি। জানো বাছা, মেয়ে আমার বড্ড ভালোমানুষ। পারো তো ওকে একটু চালাক করে দিও। তোমার কথা ওর মুখে আজকাল প্রায়ই শুনি। কিন্তু তাড়াতাড়ি শেষ করি, এখনি আবার এসে পড়বে। ওর রকম দেখে আমি তো মনে মনে হেসে বাঁচি না। কী ছেলেমানুষ মেয়ে আমার! এ ব্যাপার নিয়ে কেউ আবার এত মাথা ঘামায়!

কচি বয়স। প্রথম মানুষকে ভালো লেগেছে বলে তাকেই আঁকড়ে ধরতে হবে! আরও পাঁচজনকে দেখ, তুলনা কর, যাচাই কর, যৌবন উপভোগ কর—তারপর তো বিয়ে। কিন্তু এখন সেকথা মেয়ে আমার শুনলে তো। হাপুস নয়নে অলিভ শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো।

মেয়ের রকম-সকম দেখে অবশেষে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। তখন ছাই আবার শীতকাল! জানোই তো শীতকালে এ পোড়া দেশের অবস্থা কেমন হয়। দিনরাত শুধু কুঁকড়ে থাক। ফুল নেই, পাখি নেই, মনে আনন্দ নেই, শুধু বরফ আর বরফ—সবকিছু যেন বরফে চাপা পড়ে যায়। আর ভাঙবি তো ভাঙ, অলিভের বুক ভাঙল সেই হাড়কাঁপানো শীতে! মরণ আর কি! মেয়ে আমার দিনরাত গোঙায় আর আমি ভাবি কবে যে হায় বসন্ত আসবে, ফুরফুর করে হাওয়া দেবে আর সেই হাওয়া গায়ে লাগলে মেয়ে আমার সব শোক ভুলে আবার নতুন প্রেমিকের সঙ্গে সূর্যের তাজা আলোয় পার্কে মাঠে এখানে ওখানে গড়াগড়ি যাবে।

হে ঈশ্বর! শীতকালে যেন এদেশে কেউ মনে কোনোরকম কষ্ট না পায়। তাহলে বুকে দ্বিগুণ আঘাত বাজে। তুমি তো এদেশে অনেক বছর রইলে! তুমি খুব সহজেই বুঝতে পারবে ঋতুপরিবর্তন এদেশের লোকের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে। শীতকালে আমরা মরে থাকি আর গ্রীষ্মকালে মেতে উঠি। রোদ্দুর সারা বছরে বড়ো কম পাই, কিন্তু যেটুকু পাই প্রাণভরে সেটুকু উপভোগ করি।

কিন্তু হায় গ্রীষ্মের যে অনেক দেরি! এদিকে অলিভের তখন মৃতপ্রায় অবস্থা। ভাবলাম এমনভাবে ওকে এপ্রিল-মে অবধি কিছুতেই ফেলে রাখা চলবে না, একটা ব্যবস্থা করা দরকার। শেষে কি মেয়েটা কঠিন অসুখে পড়বে।

আমি তখন নিজে উৎসাহী হয়ে ওকে জোর করে বাইরে বাইরে

নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। মেয়ে কি যেতে চায়! আমিও নাছোড়বান্দা। মা হয়ে কেমন করে ওকে এতোদিন মনমরা হয়ে থাকতে দি বলো?

এসব রোগের কী ওষুধ তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। আর-একজন বন্ধুর সন্ধান পাওয়া। কিন্তু বাইরে না বেরোলে কেমন করে নতুন বন্ধু পাবে ও? সত্যি কথা বলতে কি বাছা, এমন আশ্চর্য স্বভাবের ইংরেজ মেয়ে আমি আর একটিও দেখি নি। তাই সে-সময়ে ওর ওপর রেগে গিয়ে আমি প্রায়ই বলতাম, তুমি কী ইংরেজ? এত ভাবপ্রবণ হলে বিদেশীরাও যে হেসে গড়িয়ে পড়বে। হোক না অল্প বয়স, প্রেমকে অত প্রাধান্য দেয়া কেন বাপু! যারা দেয় তারা মূর্খ অকর্মণ্য। আগে কাজ পরে প্রেম। এদেশের মেয়েরা প্রেমকে কাজের মতো করেই নেয়, কিন্তু প্রেম মানুষের সবকিছু আচ্ছন্ন করবে কেন। আমি তো সেকথা ভাবতেই পারি না। অবশ্য শুনি, অনেক বিদেশী মেয়ে প্রেমের জন্যে সব ছাড়ে, কেউ কেউ নাকি আবার সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়। পাগলদের কাণ্ড যত সব। বলতে পারো, ওসব মেয়েরা অত বোকা কেন? সামান্য বুদ্ধি থাকলে তারা নিশ্চয়ই এমন কাজ করতে পারতো না। জীবন কি এমনি অবহেলার জিনিস! দু-একটা প্রেম ব্যর্থ হলে ক্ষতি কী? আমার মনে হয়, সেটা এক পক্ষে ভালোই। জীবনের অনেক কিছু দেখা হয়ে যায়। জীবন ছাড়া আমাদের আর আছে কী বলো! কেন যে মানুষ মরতে চায়! কী মধুময় এ মহাজীবন!

সেই কথাটা তখন অলিভকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না। ও কেবলই বলে, আমি আর বাঁচতে চাই না। ওইটুকু মুখে এসব বোকামির কথা শুনে আমার শরীর জ্বলে যেতো। ভাবলাম, যেমন করে হোক তাড়াতাড়ি ওর ধারণা ঘোরাতে হবে—কোনো বিশেষ মানুষকে নয় কিন্তু অনেক মানুষের মধ্যে নিয়ে ওকে জীবনকে ভালো লাগাতেই হবে। ওইটুকু বয়সে একটা ভুল ধারণা মনে শিকড়

গাড়া খুবই ভয়ের কথা। কে জানে কি মানসিক রোগ ধরে যাবে বাপু! আমি জোর করে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে ওকে এক ক্লাবে ভরতি করে দিয়ে এলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সে-ক্লাব যেখানে তুমি ওর দেখা পেয়েছো। ক্লাবটি সত্যি ভালো, কি বলো? দেশ-বিদেশের কত ভালো ভালো ছেলেমেয়ে আসে ওখানে। সাহিত্য রাজনীতি দর্শন—কত কী আলোচনা হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো এই ক্লাবে অলিভ রিচার্ডের চেয়ে অনেক ভালো ছেলের দেখা পাবে।

আর কী আশ্চর্য, কয়েক সপ্তাহ পরে ও ওখানেই তোমাদের দেশের একজন চমৎকার ছেলের দেখা পেলো। নাম আপ্পারাও। মাদ্রাজের লোক।

প্রথমে আমাকে এসে শুধু আপ্পার কথা বলতো, জানো মা, ইণ্ডিয়ানরা খুব বুদ্ধিমান হয়, এত সুন্দর কথাবার্তা বলে ওরা—ইংরেজ ছেলেদের চেয়ে অনেক ভালো।

তাই নাকি? মেয়ের কথা শুনে আমি উৎসাহ প্রকাশ করে বললাম, তোর সঙ্গে কোনো ইণ্ডিয়ান ছেলের আলাপ হয়েছে বুঝি?

হ্যাঁ, ওর কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু মা, আমি কোনো ছেলের সঙ্গে আর বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে চাই না! মেয়ের চোখ ছলছল করে ওঠে, তাই আপ্পা অনেক অনুরোধ করলেও ওর সঙ্গে বায়স্কোপ-থিয়েটার দেখতে আমার মন সরে না।

যা প্রাণ চায় করুক, এখন আমি আর কিছু বলবো না মেয়েকে—বলবার দরকার হবে না। এপ্রিল আসুক, হালকা রোদ্দুরের স্পর্শ গায়ে লাগলে আমি জানি মেয়ে আমার চঞ্চল হয়ে সঙ্কোচের সব প্রাচীর ভেঙে ফেলবে। এখন ওরা পরস্পরকে জানুক।

তারপর আমি অলিভের মুখে কেবলই আপ্পার কথা শুনতাম। সে কেমন করে কথা বলে, কী কী কথা অলিভকে জিজ্ঞেস করে, আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে কতো ব্যস্ত হয়—এইসব আর

কি। কথা শুনে আমি মেয়েকে বলতাম, তা আপ্পাকে বল না একদিন এখানে এসে চা খেতে, আমিও আলাপ করে দেখি ছেলেটি কেমন।

না না মা, মেয়ে ব্যস্ত হয়ে বলতো, তাহলেই আলাপ বেশি হবে, আবার সেই যন্ত্রণা, আমি আর কোনো ছেলের সঙ্গে নিজের জীবন জড়াতে চাই না মা।

মুখে অলিভ যাই বলুক না কেন, ওর চেহারা দেখে আমি বুঝতে পারতাম যে, ওর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, শিগগিরই একদিন আমাকে এসে বলবে, আপ্পার মতো লোক হয় না, আমি ওকে ভালোবাসি মা।

তোমাকে আগেই বলেছি বাছা, ছেলেবেলায় অলিভ ইংরেজ মেয়ের মতো একেবারেই ছিলো না। কোনো ছেলের মনের অলিগলির সন্ধান পাবার আগেই তাকে বিয়ে করবার স্বপ্ন দেখতো। তারপর হঠাৎ যখন বুঝতো তুজনের মনের কোথাও একটা বিরাট অমিল আছে তখন তাকে রাখতে পারতো না, ছাড়তেও চাইতো না—শুধু মনের যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে শয্যা গ্রহণ করতো। এমন মনের অবস্থা নিয়ে চলাফেরা করলে কোন ছেলে আর সাধ্যসাধনা করে বল! প্রত্যেকেই জীবনের তরঙ্গে তাল মিলিয়ে মেতে উঠতে চায়। ফলে তারা অলিভের অপেক্ষায় বসে থাকতো না, সে মুখ ফুটে কিছু বলবার আগে তাকে শয্যাশায়ী দেখে তারা সরে গিয়ে অন্য প্রাণচঞ্চল বন্ধু খুঁজে নিতো। মেয়ে আমার একটু বেশি ভাবে বৈকি, তোমরা যাকে বল "সীরিয়াস টাইপ"।

অবশ্য এখন অলিভের বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে। এখন ও বোঝে, প্রেম করা মানেই বিয়ের স্বপ্ন দেখা নয়। এ বোধ ওর হয়েছে আপ্পার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরেই। হ্যাঁ, শোন মন দিয়ে, এবার তোমাকে তোমাদের দেশের ছেলের সঙ্গে অলিভের প্রেমের কথা বলি।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হলো। আরে বাপু, আমরা কি আর কিছু বুঝি না। সারাটা জীবন তো আর চোখ বন্ধ করে কাটাই নি। ঠিক এপ্রিলে অলিভের চেহারা বদলে গেলো। আর যেমন বলেছিলাম—একদিন এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ছোট মেয়েটির মতো করে বললো, আপ্পার মতো লোক হয় না মা। আমি হেসে মনে ভাবলাম, এ আর নতুন কথা কী, তোমার মুখ থেকে এপ্রিল মাসে যে এমন কথা শুনবো তা তো আমি আগেই জানতাম।

আর সে-বছরের এপ্রিল, বলব কি বাছা, এক সঙ্গে অত ফুল আমি আর কখনও দেখি নি, অত উজ্জ্বল রোদ আমি আর কখনও পাই নি, ইংল্যাণ্ডকে কী অপূর্ব যে মনে হয়েছিলো সে-বছর। অলিভ তো অলিভ, আমারই মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো। প্রায়ই আমার অলিভের বাবার কথা মনে হতো।

হ্যাঁ বাছা, তুমি কি অলিভের বাবার কথা কিছু জানো ?···বোধ হয় বাপ-মায়ের এই বিচ্ছেদের জন্যেই ও ছেলেবেলা থেকে কেমন মনমরা গোছের হয়েছে। কিছু না বুঝলেও জ্ঞান হবার পর থেকেই ও দেখছে ওর বাপ-মা কেবল ঝগড়া করে, এক সঙ্গে বেড়াতে যায় না। বাড়িতে সব সময় একটা থমথমে ভাব।

শুনি তোমাদের দেশে স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি হয় না। সেকথা ভাবলে আমার ভারি অবাক লাগে। তোমাদের বিয়ের ব্যাপারটাও আমার কেমন আশ্চর্য মনে হয়। জানা নেই, শোনা নেই, বাপ-মা ঠিক করে দিলো আর হুট করে বিয়ে করে বসলে। অচেনা লোকের সঙ্গে তোমাদের দেশের লোকেরা কেমন করে বছরের পর বছর সংসার করে সেকথা আমি ভেবে পাই না। তার ওপর আবার ছেড়ে চলে যাবারও উপায় নেই। স্বামীর সঙ্গে তোমাদের দেশে যাদের ছাড়াছাড়ি হয় শুনি সমাজে মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে তাদের নাকি বেশ অসুবিধা হয়।

আমাকে মাপ করো বাছা, এসব শুনে তোমাদের সমাজের ওপর আমার এতটুকুও শ্রদ্ধা নেই। এ আবার কেমন কথা! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল না থাকলেও সমাজের খাতিরে একসঙ্গে বাস করতে হবে? নিজেকে এত বড়ো প্রবঞ্চনা করবার কথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না। এ যে তিলে তিলে ক্ষয়। তোমাদের দেশে আবার মা-বাপের ঠিক করা বিয়ে—আগে থেকে আলাপ না থাকলে অনেকের ক্ষেত্রে মনের মিল না হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কি জানি বাপু, এমন বিয়ের কথা আমরা কিন্তু কিছুতেই ভাবতে পারি না।

ছ-সাত বছরের পরিচয়ের পর বিয়ে করে আমার নিজের কী হলো? অলিভের বাবা মার্টিন বিয়ের আগে একেবারে অন্য মানুষ ছিলো। বিয়ের পর তিন-চার বছর আমরা বেশ ছিলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য হঠাৎ যে সেই এক মানুষের এত পরিবর্তন হতে পারে সেকথা অলিভের বাবার সঙ্গে বিয়ে না হলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না। তখন সবে অলিভের জন্ম হয়েছে, আমি ওকে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত, অন্য কোনোদিকে মন দেবার আমার সময় ছিলো না। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য করতাম মার্টিন যেন দূরে সরে যাচ্ছে। ও যেন আমাকে চেনে না, আমি যেন ওকে আর তেমনি করে বুঝতে পারি না—বড়ো অচেনা মনে হয়। এমনি করেই মাস কয়েক কাটলো তারপর আরম্ভ হলো গোলমালের পালা। ও কেবলই আমার খুঁত ধরতে লাগলো আর অন্য কোনো বান্ধবী জুটিয়েছে বলে আমি ওকে সন্দেহ করতে লাগলাম।

এমনি মনের অবস্থা নিয়ে কী বাস করা যায়? তুমিই বলো। তোমাদের দেশে হলে তো সমাজের ভয়ে স্বামী-স্ত্রী কোনোরকমে মানিয়ে নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিতো—তাই না?

আমরা কিন্তু সেকথা ভাবতেও পারি না। দারুণ দুরবস্থায় পড়বো জানলেও না। আজ আমাদের হয়তো কিছুই নেই, কিন্তু

সত্যনিষ্ঠা আছে। ইংরেজ ঠকে না, ঠকায় না—প্রবঞ্চনার মাঝে কোনোদিনও কোনো অবস্থাতেও বাস করতে পারে না।

আমরাও একসঙ্গে বাস করতে পারলাম না। শেষ অবধি ভেবে দেখলাম অলিভের মঙ্গলের কথা ভেবে আমাদের দুজনকে দূরে সরে যেতেই হবে। সেই নিরানন্দ পরিবেশে শিশু কেমন করে মানুষ হবে। তারপর একদিন আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেলো। গোলমালের মধ্যে দিয়ে নয়, যুক্তি দিয়ে বিচার করে। যেদিন আমি বুঝেছিলাম ওর আর আমাকে ভাল লাগে না, সেইদিন থেকে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হতে লাগলাম। আমি জানি ইউরোপে স্বামী-স্ত্রীর এই ডিভোর্সের কথা নিয়ে তোমরা মাঝে মাঝে আমাদের ব্যঙ্গ করো, স্বার্থপর দুর্নাম দাও। শুধু তোমরা কেন, আমার কাছ থেকে সত্যি কথা শোনো বাছা, গোঁড়া ইংরেজ মেয়ে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা আজও ভাবতে পারে না।

অবশ্য যে মেয়েদের সত্তা বলে কোনো পদার্থ নেই তারা একথা ভাববে কেমন করে। বড়লোকের দুলালী বউরা সব দেশেই এক। স্বামীর লাথি-ঝাঁটা খেয়ে তারা মুখ বুজেই থাকে।

কিন্তু আরো দেখছি তোমাদের দেশের মতো এখানেও ঘর রাখবার জন্যে বাড়াবাড়ি রকমের ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। ক্যাথলিকরা জোর গলায় 'ঘর রাখো' 'ঘর রাখো' বলে চেঁচাচ্ছে। মেনে নিতে হবে, মানিয়ে নিতে হবে—ঘর ভেঙে বেরিয়ে এলে বাইরের জগতে কোথাও শান্তি পাওয়া যায় না। ছন্নছাড়া জীবনে সংহতি কোথায়!

ইংল্যাণ্ডের গৃহজীবনের এই মানসিক দ্বন্দ্ব আজকাল আমাদের বড়ো বেশি পীড়া দেয়। অর্থাৎ মনের অমিল সত্ত্বেও মানিয়ে নিয়ে ঘর রাখলে সত্য কিংবা সত্তা রাখা যায় না, আর ও দুটো রাখলে ঘর রাখতে অসুবিধা হয়।

যাক, এসব কথা ভেবে এখন আমি আর কী করবো! ভাববে

আমার মেয়ে আর তার ছেলেমেয়েরা। আমার জীবন তো ফুরিয়ে এলো, যা পাবার তা পেলাম, যা হারাবার তা হারালাম। কিন্তু অলিভের বাবাকে আমি কিন্তু নতুন করে ফিরে পেতে চাই নি। ভিক্ষে-করে-পাওয়া জিনিসের ওপর ইংরেজের কোনো শ্রদ্ধা নেই। ও-ও আমাকে ডাকে নি, মিটমাট করবার কথা ভাবতেও পারি নি। কেন না জোড়াতালি-দেয়া জীবন আমরা ঘৃণা করি।

ঘর ভাঙুক, না থাকুক স্বামী, জীবনের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ আমার ছিলো—অফুরন্ত প্রাণশক্তি আর অপরিসীম যৌবন। এদেশের প্রত্যেকের এ দুটো জিনিস আছে। কারণ শীতের জন্যে বাধ্য হয়ে আমাদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়, পাছে পরের গলগ্রহ হই সেই ভয়ে প্রাণপণে খেটে পয়সা রোজগারের চেষ্টা করি। আমাদের জীবন এত বেশি ছকে ফেলা যে অবসর বড়ো কম। তাই আমরা সব সময়ে সতর্ক পাছে অবসরক্ষণ বিফলে যায়। যৌবনের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই কারণ পরিশ্রম করে অর্থ আহরণ করে নিজের রোজগারে বেঁচে থাকতে হবে। তার জন্যে ফুর্তি চাই, মন সতেজ থাকা চাই, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে ঘরে বসে ধ্যান করে তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে গেলে চলবে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কোনো কাজ করে ইংরেজ সহজে নিজেকে কষ্ট দিতে চায় না।

না না না, তুমি আবার অন্য কিছু ভেবো না। মাথা খারাপ! অলিভের বাবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর আমি আর বিয়ে করবার কথা কল্পনা করি নি, কাউকে ভালোবাসতেও পারি নি। ওসব প্রেম ভালোবাসার ওপর আমার কেমন ঘৃণা এসে গিয়েছিলো।

কিন্তু যৌবনের দাবী অস্বীকার করবো কেমন করে? আর তা করে নিজের শরীরকে কষ্টই বা দেব কেন? ভালো না হয় কাউকে না বাসতে পারলাম, কিন্তু ভালো লাগতে তো বাধা ছিল না। হ্যাঁ, অনেককে আমার ভালো লেগেছিলো।

কত বসন্তে-গ্রীষ্মে দেখেছি রোদ্দুরে গড়াগড়ি যাচ্ছে অসংখ্য প্রেমিক-প্রেমিকা, বন্ধু-বান্ধবী, স্বামী-স্ত্রীর দল। দেখতে দেখতে আমার শরীরে রোমাঞ্চ লাগতো। আমি মনেপ্রাণে সঙ্গী খুঁজতাম, যৌবন উপভোগ করবার উদ্দাম নেশায় যেন মাতাল হয়ে উঠতাম। তখন অনেককে আমার ভালো লেগেছে, অনেক বন্ধুর সঙ্গে আমি কতবার বাইরে গেছি !

তাই অলিভের শোক দেখে আমি অধীর আগ্রহে এপ্রিল-মে-র অপেক্ষায় দিন গুনছিলাম। আমি তো জানি ইংল্যাণ্ডের ও বয়সের মেয়েদের মনের অবস্থা তখন কেমন হবে। তুমি অমন করে হাসলে কি হবে বাছা, যা বলছি একেবারে খাঁটি কথা। প্রমাণ কি পাও নি এখনও ?

প্রকৃতির সঙ্গে কী বন্ধনে বাঁধা আছে এ দেশের লোকের মন ! আমার বুঝতে দেরি হলো না তোমাদের দেশের আপ্পারাও ওর মনে আবার প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অলিভের এই হুপ করে প্রেমে পড়ায় আমার খুব বেশি সায় ছিলো না। অনেককে দেখে, অনেককে ভালো লাগবার পর তারপর প্রেমে পড়া উচিত। তখন ওর মনের অবস্থার কথা ভেবে আমি কিছু বললাম না। ভাবলাম পরে এক সময় বলে দিলেই চলবে। ও আর বাজিয়ে দেখলো কাকে বলো ? রিচার্ডের পরই তো আপ্পা।

আপ্পার সঙ্গে ও খুব ঘুরে বেড়াতে লাগলো ! এমন কি, এক উইক এণ্ডে আইল্ অব ওয়াইটে গিয়ে হোটেলের এক ঘরে রাত কাটিয়ে ফিরে এলো !

তা কাটাক, তাতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। কেনই বা থাকবে ? ঘনিষ্ঠভাবে না মিশলে মনের মানুষকে জানবার সুযোগ কেমন করে হবে ওর ? কারই বা হয় ? তবে আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না আপ্পার সঙ্গে ওর বিয়ের কথাবার্তা কিছু হয়েছে কিনা। সেটা হয়েছে জানলে তখন আমি বিচলিত হতাম। এতো

অল্পদিনের আলাপে কোনো ইংরেজ মেয়ে পাকাপাকি সম্পর্কের কথা কল্পনা করে না। তবে অলিভের চাল-চলন তো খাঁটি ইংরেজ মেয়ের মতো ছিল না, ওর ধরনধারন একটু কেমন যেন। তাই আমার ভয় ছিলো তোমাদের দেশের আপ্পারাওকে বিয়ে করবার স্বপ্নে ও বিভোর না হয়।

শেষ অবধি আমার ভয় ভাঙলো। দেখতে দেখতে গ্রীষ্মের উজ্জ্বল দিনগুলি একে একে শেষ হয়ে গেলো। আবার এলো শীতের সঙ্কেত। টুপটাপ গাছের পাতা ঝরে যেতে লাগলো। দেখা দিলো কুয়াশাভরা গম্ভীর দিন। আর প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে অলিভের মনের দরজাও যেন হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে গেলো।

ও আমাকে বললো, যেমন ভেবেছিলাম, আপ্পা ঠিক তেমন লোক নয় মা, বড়ো বেহিসেবি, বড়ো চঞ্চল, ওর ওপর নির্ভর করতে বাধে, অবান্তর কথা বলে কি না—

তা কী করবি ঠিক করেছিস?

মেয়ে আমার মুচকি হেসে বললো, যা বোঝাবার ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি। বলেছি আর দেখা করবো না। জানো মা, ও বড়ো ভাবপ্রবণ। আমার কথা শুনে চোখে জল নিয়ে বললো, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না—অলিভ আমি যে তোমাকে বিয়ে করবার আশায় এতদিন প্রহর গুনে এসেছি···এসব কথা শুনে ওর ওপর নির্ভর করবার কথা কেমন করে ভাবি বলো তো মা? আমাকে মাত্র পাঁচ মাস দেখছে—কীই বা বুঝেছে আমাকে যে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যাবার কথা ভেবে চোখের জল ফেলছে। আপ্পা একটু বাজে কথা বলতে ভালোবাসে, না মা?

অলিভের একটু একটু জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে দেখে আমি খুব খুশি হলাম—বুঝলে বাছা? আপ্পার সঙ্গে ও নিজেই সব শেষ করে দিলো। শীতকালে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ কম। আপ্পার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে অলিভ সারা শীত ঘরে বসে পড়া-

গুনা করে কাটালো। ওর মন পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে দেখে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

এই এপ্রিলে ওর জীবনে এলে তুমি। তোমার কথা ও:আমায় কিছুই বলতে বাকি রাখে নি। তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, তুমি আগামী বছর দেশে ফিরে যাবে, তোমাদের বিয়ে হবার কোনো আশাই নেই। তবু ওর তোমাকে ভালো লাগে, তোমার সঙ্গে ছাড়া ও আজকাল অন্য কারুর সঙ্গে মেশে না, মিশতেও চায়ও না। তোমার সঙ্গে ও লণ্ডনের বাইরে বেড়াতে যায়, যতক্ষণ বাড়িতে থাকে সারাদিন তোমার কথা বলে।

রিচার্ড, আপ্পা আর তুমি—এই তিনজনের মধ্যে আমি দেখছি তোমাকেই ওর সবচেয়ে ভালো লেগেছে। আর তোমার কাছ থেকে সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা ওর হবে। অর্থাৎ বোকা মেয়েদের মতো প্রথম থেকে কল্পনা না করে ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে মিশতে পারবে। আমার মনে হয় সেটাই সবচেয়ে আগে দরকার। কতো দেখতে হবে—তারপব তো বিয়ে। যারা হঠাৎ ভালোবেসে ফেলে তারা দুঃখ পায়, ঠকে মরে। তাই অলিভকে আমি সাবধান করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি আমার আর কিছু করবার দরকার নেই। তোমার সঙ্গে এভাবে মেলামেশা করে মনের দিক থেকে ওর প্রচুর লাভ হয়েছে।

হি হি হি, তবু জানো বাছা, তোমার কথা উঠলে অলিভ আজও ছেলেমানুষের মতো কথা বলে বৈ কি। তুমি যখন থাকবে না— মানে তুমি দেশে ফিরে যাবে তখন খুব বেশি দরকার না থাকলে ও নাকি আর বাড়ি থেকে বার হবে না, কোথাও যাবে না, কারো সঙ্গে মিশবে না।

একুশ বছর বয়স হলো তবু এখনও ওর ছেলেমানুষি গেলো না। কেউ কি অমন কৃচ্ছ্রসাধন করে জীবন কাটাতে পারে – না কাটানো উচিত ? ওর স্বীকার করতে বেধে যায়, স্বীকার করবার মতো বুদ্ধি

ওর আজও হয় নি। কিন্তু আমি তো জানি সময় এলে ও আবার কী করবে। না না, ওর মুখে তোমার কথা যা শুনেছি তাতে মনে হয় না যে, তোমাকে ও সহজে ভুলতে পারবে। ভোলবার দরকারই বা কী। কিন্তু উপভোগে বঞ্চিত হবে কেন! অন্য এপ্রিলে আসুক অন্য কেউ, ও উপভোগ করুক যৌবন, জীবনকে আরও ভালো করে জানুক। এমনি করে গভীর পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে যেদিন ও আসল মানুষের দেখা পাবে—সেদিন বলবার অপেক্ষা করতে হবে না, ওদের মনে আপনি জ্বলে উঠবে যুগ্ম জীবনের হোমাগ্নি।

কিন্তু সে হলো অনেক পরের কথা। এখন ওর কতোই বা বয়স! কী বোঝে ও জীবনের। এখন ও ঘুরে বেড়াক এলোমেলো হাওয়ায়, প্রেমিকের সঙ্গে গড়াগড়ি যাক হালকা রোদ্দুরে, যৌবন নিঙড়ে সুধা পান করুক, জীবনের সঙ্গে হোক কঠিন পরিচয়।

কিন্তু আজ আর নয়। ওই দেখ অলিভ আসছে। কী অপূর্ব দেখাচ্ছে ওকে! তাই না? এপ্রিলের আকাশ আজ কী আশ্চর্য উজ্জ্বল! আমারও মন মেতে উঠছে। ওই সুন্দর ফুলগুলির দিকে শুধু একবার চেয়ে দেখো—হালকা হাওয়ায় বার বার কেমন দুলে দুলে উঠছে।

কী সুন্দর এই পৃথিবী।

ইভ্‌নিং ইন প্যারিস

ঃ রচনাকাল ঃ

২৩শে আগস্ট ১৯৫৪ সোমবার সকাল

থেকে

১লা অক্টোবর ১৯৫৫ শনিবার সকাল

কলিকাতা

সবই যেন ভুলে গিয়েছিলাম।

হাল্কা রোদ্দুরে ঝলমল করা আইফেল টাওয়ারের চূড়া, নোতরড্যাম গির্জের বড় বড় থাম, আর্চ ডু ট্রায়াম্প, সেইনের জলকল্লোল, মোনালিসার হাসি।

প্যারিস ছেড়ে আসবার ঠিক আগের মুহূর্তে তেমন করে আমার কিছুই মনে পড়েনি।

কিন্তু শুধু তাকে ভুলতে পারিনি।

আমি যেন তার মধ্যে আজকের প্রত্যেক মানুষকে দেখতে পেয়েছিলাম। অথচ সব কিছু ভুলে শুধু তাকে আমার মনে রাখবাব কথা নয়। মাত্র কয়েকদিন তাকে দেখেছিলাম। প্যারিসের সুলভ নাইট ক্লাবের একটি মেয়ে।

নাম মিকি।

প্যারিসে গিয়ে লোকে নাকি নাইট ক্লাব না দেখে ফেরে না। একবার যায়, দু'বার যায় তারপর মনে মনে বিচার করে দেখে ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে প্রভেদ কোথায়?

এসব বড় বড় কথা অবশ্য আমার মাথায় আসে নি। পাঁচ জনের মুখে নানা কথা শুনে আমি শুধু মজা দেখতে গিয়েছিলাম। কিছুতেই ভাবতে পারি নি প্যারিসের রাতের রঙ্গ আমাকে এমনি আকর্ষণ করবে।

মাত্র কয়েকদিন থাকব বলে প্যারিসে এসেছিলাম। অল্প সময়ের জন্য যারা আসে আমিও ঠিক তাদের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে ঘুরে ঘুরে যা কিছু দেখবার দেখেছিলাম। শুধু নাইট ক্লাব দেখা বাকি রইল।

নাইট ক্লাবের নামে কেমন যেন ভয় হয়, লজ্জা আসে। কি

জানি কি দেখব, কেমন অবস্থায় কাকে দেখে ফেলব, যদি আমাকে কেউ দেখে ফেলে।

আর আমাকে পাঁচজন চেনে। আমার সঙ্গে আরও দু' চারজন প্যারিসে বেড়াতে এসেছে। তারা কেউই নাইট ক্লাব সম্পর্কে উচ্চ-বাচ্য করে নি।

কাজেই আমিও নীরব ছিলাম।

মুখে কিছু না বললেও মনে মনে কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। প্যারিসের রাতের রঙ্গের কথা এত শুনেছি যে তা না দেখে ফিরে যেতে কিছুতেই মন সরল না।

কাউকে কিছু বলা হল না। বলবার উপায় নেই। আমি বাঙালী। এখানে আমার সঙ্গে এর মধ্যে যাদের আলাপ হয়েছে তারাও বাঙালী। নাইট ক্লাবের কথা তুললে তারা আমার সম্পর্কে কি ভাববে তা আমি জানি। কাজেই মুখ খোলা হল না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন নাইট ক্লাব দেখবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ ঘটে গেল। কোন সঙ্গী ছিল না। নির্ভাবনায় অগ্রসর হলাম। আমার গতিবিধি কারোর জানবার উপায় ছিল না।

এবার সে কথাই বলি!

অবশ্য এখন আর সেকথা বলতে বাধা নেই, মনের কোণায় কোথাও এতটুকু সঙ্কোচ নেই।

বলে রাখা ভাল, প্যারিসের রাতের রঙ্গ দেখবার আগে আমি যে-মানুষ ছিলাম, এখন আমি আর সে-মানুষ নেই। প্যারিসের তৃতীয় শ্রেণীর নাইট ক্লাবের এক অতি সাধারণ মেয়ে আমাকে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে অনেক বড় মানুষ করে দিয়ে গেছে। আজ দীর্ঘ কয়েক বছর পর আমি সেই মিকিরই গুণ গাইব।

টিউব স্টেশনের নাম কেডে। প্যারিসে কেউ টিউব স্টেশন বলে না, বলে মেট্রো। কেডে মেট্রোয় দাঁড়িয়ে আমি এদিক ওদিক

তাকাচ্ছিলাম। ভাষা জানি না বলে ইংরেজী জানে এমন লোকের দেখা পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

এ পাড়ায় কখনও আসি নি। ইচ্ছে ছিল পাড়াটা স্বাধীনভাবে ঘুরে ঘুরে দেখব। কিন্তু বড় বেশি ভিড় এ পাড়ায় আর রাস্তাগুলো অত্যন্ত ছোট। এত ছোট যে গলি বললে ঠিক কথা বলা হয়।

রাত নটা বেজে গেছে। ক্ষিধেও বেশ পেয়েছিল। কিন্তু রেস্তোরাঁয় যেতে একটু ইতস্তত করছিলাম। কারণ ভাষা একেবারেই রপ্ত করতে পারি নি। ভয় ছিল, ঠিক কথা না বলে কি কথা বলে ফেলি।

ঠিক এমনি করে রাত্তিরে একা আমি প্যারিসের পথে আর কখনও বার হইনি। আমরা সাধারণত একটা দল বেরোতাম। আর যে বাঙালীদের সঙ্গে এখানে আসবার সময় স্টিমারে কিংবা ট্রেনে আলাপ হয়েছিল, পথে বেরোলে তারা সব সময় আমার সঙ্গে থাকতেন।

আজ তারা কেউই ছিলেন না। কেউ ইটালী, কেউ লণ্ডন, কেউ সুইজারল্যাণ্ড—এমনি করে যে যার চলে গেছেন। আরও কিছুদিন থাকব বলে আমি শুধু প্যারিসকে আঁকড়ে ধরলাম।

লণ্ডন থেকে আসবার আগে ওদের মতো আমিও ঠিক করেছিলাম আরও পাঁচ জায়গায় দু একদিন থেকে বুঁড়ি ছোঁয়ার মতো করে বেড়িয়ে যাব।

কিন্তু শেষ অবধি প্যারিসের মায়া কাটাতে পারলাম না। মনে হল, কি যেন পাইনি, কি যেন দেখা হল না, কি যেন রয়ে গেল গোপন। সেই না-জানা অ-দেখা জিনিসের জন্যে প্যারিস যেন আমাকে জোর করে টেনে রাখল।

কিন্তু যেদিন প্যারিস ছেড়ে আসি সেদিন সকালে আমার মনে কোন দৈন্য ছিল না। আমার মন তেমন করে আর কোনদিনও ভরে ওঠেনি।

আমি মিকির কথাই ভাবছিলাম।

প্রথম থেকে আরম্ভ করি।

কেডে মেট্রোতে আমার দিশেহারা ভাব দেখে একটি মেয়ে আমার কাছে এসে হেসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল, লণ্ডন থেকে আসছ ?

হাঁ, একটু থেমে বললাম, কেমন করে বুঝলে ?

তোমার চেহারা দেখে, মেয়েটি হেসে বলল, লণ্ডনের লোকরা ঠিক তোমার মতো করে তাকায়, অমন করে কথা বলে—

বাধা দিয়ে বললাম, আমি কিন্তু লণ্ডনের লোক নই।

তবে অ্যামেরিকার বুঝি ?

না, ভারতবর্ষের। কিন্তু সেকথা থাক। তুমি নিশ্চয়ই ফরাসী ?

নিশ্চয়ই, মেয়েটি বেশ গর্বের সঙ্গে বলল যেন।

যাক বাঁচা গেল। আমি তোমার মতো একজনকে খুঁজছিলাম।

মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, কেন বল তো ?

আমি একটু ইতস্তত করে উত্তর দিলাম, তুমি তো ইংরেজী জান ?

ওই কোন রকমে চালিয়ে নিতে পারি আর কি।

ওতেই হবে, আমি হেসে বললাম, যা কিছু দেখবার দেখা হয়ে গেছে, শুধু এই অঞ্চলটা ভাল করে দেখি নি। তোমাদের ভাষা তো একেবারেই জানিনা তাই চলে ফিরে বেড়াতে খুব অসুবিধা হচ্ছে—

মেয়েটি বলল, আমি ঠিক রাত্তির দশটা অবধি তোমার সঙ্গে ঘুরতে পারি। তারপর আমার অন্য কাজ আছে।

আমি খুশি হয়ে বললাম, অনেক ধন্যবাদ। চল দুজনে আগে কিছু খেয়ে নি। তারপর আমাকে দেখাও কি দেখবার আছে এ পাড়ায়।

আমরা সামনে এগিয়ে গেলাম। কাছের একটা ছোট রেস্তোরাঁ পাওয়া গেল।

আমার পাশে অসঙ্কোচে বসে পড়ে মেনু হাতে নিয়ে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, কি খাবে বল দেখি?

যেন আমার সঙ্গে ওর কতদিনের পরিচয়। যেন আমি ওর নিমন্ত্রিত।

আমি হেসে বললাম, যা হয় তুমিই বলে দাও।

মদ খাবে কোন?

তুমি?

কি ভেবে মেয়েটি বলল এখন থাক। পরে ভাল জায়গায় তোমাকে মদ খাওয়াব।

মেয়েটির মুক্ত স্বাধীন ভাব দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম; আর আমার খুব ভাল লাগছিল। ভাবলাম, যা শুনেছি তা তো মিথ্যে নয়।

প্যারিসের পথে পথে মেয়ে, ঘরে ঘরে প্রেম, গলিতে গলিতে আনন্দ। তা হলে এতদিন কেন আমি মূর্খের মতো বঞ্চিত হয়ে ছিলাম? কেন আমি এমন করে একা পথে বার হইনি? কেন আমি আমার ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে অকারণে ঘুরে মরেছিলাম? তা যদি না করতাম তাহলে কবে মন থেকে আমার শুষ্ক নীরস যান্ত্রিক ভাব কেটে যেত।

বস্তুত, লণ্ডনে বসে যখন প্যারিসে আসবার কল্পনা করতাম তখন মনে কেমন একটা দুরন্ত আগুন জ্বলে উঠত। ক্ষুধার আগুন—আনন্দ পাবার আগুন, আর মনে মনে ভাবতাম কবে আমি প্যারিসে গিয়ে সেখানকার পথে পথে প্রেম কুড়োব, ক্ষণিকের জন্যে সব শোক দুঃখ অভাব দৈন্য ভুলে নিজেকে বিলিয়ে দেবো আকুল উন্মাদনায়।

এমনি অপরিণত সবুজ মন নিয়ে আমি প্যারিসে এসেছিলাম। স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই, সেই সব ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে

পথে ঘুরতে ঘুরতে উপবাসী মন আর কাঙালের চোখ নিয়ে আমি বার বার চার পাশে তাকাতাম। তাকিয়ে তাকিয়ে আমার শরীরে রোমাঞ্চ হত, বন্ধুদের হাত এড়িয়ে সঙ্গী পাবার জন্যে আমি মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠতাম।

কেনই বা হব না? আমি যে পরিবারের ছেলে, আমি যে দেশের মানুষ, সেখানে পদে পদে বাধা, পদে পদে বারণ।

ছাত্র জীবনের মাঝামাঝি যৌবনের আরম্ভে যখন হৃদয়ে সহসা বেজে উঠত কোন কুমারীর কঙ্কনঝঙ্কার কিংবা মৃদু করাঘাত, তখন বাসনা দুর্বার হলেও সাড়া দেবার উপায় ছিল না। তাহলে অভিভাবকদের ঘুম ছুটে যাবে। কানাঘুষো শুরু হবে আত্মীয় মহলে। ছেলে বদ হয়ে যাচ্ছে। ছেলের মতি গতি ভাল নয়।

মেয়েদের পথ আরও বন্ধুর। যা স্বাভাবিক, যা সঙ্গত তা করা পাপ। যে ছেলে মেয়েরা যৌবনের আহ্বানে সাড়া দেয় নি, বেশি বয়স অবধি কারোর দিকে চোখ তুলে না তাকিয়ে অক্ষুণ্ণ রেখেছে তথাকথিত সুনাম, গুরুজনের মতে তারা ভাল ছেলেমেয়ে।

আমিও তাদের মতো একজন। না, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে যোগাভ্যাস করবার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। আমি বাধ্য হয়ে শুধু আমার পরিবারের আইন কানুন মেনে চলেছিলাম।

তাই আমি প্যারিসের নামে দিশা হারালাম। অনেক দিনের অনিচ্ছাকৃত উপবাস ভাঙতে চাইলাম অকৃপণ উপভোগে। যে মেয়েটি এত সহজে কেড়ে মেট্রো থেকে আমার সঙ্গে রেস্তোরাঁয় এল তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখে যেন নামল স্বপ্নঘোর। শাণিত চেহারা, রঙ-মাখা পাতলা ঠোঁট, টানা ভুরু, গলায় বোধ হয় নকল মুক্তোর মালা, গা থেকে ভেসে আসছে ফরাসী এসেন্সের মধুর সুবাস।

কি নাম ওর?

আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

মিকি, খেতে খেতে মেয়েটি বলল, তোমার ?

আমি নাম বললাম।

হেসে মিকি বলল, এ আবার কেমন নাম ? এমন নাম তো জীবনে শুনি নি।

আমিও হেসে বললাম, কত কী দেখবার আছে জীবনে। কতটুকুই-বা তুমি দেখেছ মিকি !

চোখ বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে মিকি বলল, তুমি বুঝি দার্শনিক ?

না না। আমি একজন সাধারণ চাকুরে মাত্র।

আমিও চাকরি করি।

তাই নাকি ? কি চাকরি তোমার ?

চল, সেখানে নিয়ে যাব তোমাকে, খাওয়া শেষ করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে মিকি বলল, নাইট ক্লাব দেখেছ ? যা দেখতে তোমার মত হাজার হাজার লোক এখানে আসে ?

আমি মুখে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে বললাম, না ও আমার দেখা হয়নি। তুমি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পার ?

পারি বৈকি, মিকি আমার একটা হাত ধরে বলল, আমার ক্লাবে চলো।

তোমার ক্লাব ?

হ্যাঁ আমি নাইট ক্লাবে চাকরি করি।

'চাকরি' কথাটা সে এমন ভাবে উচ্চারণ করল যার অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভেবে পেলাম না, মিকি কি চাকরি নাইট ক্লাবে করতে পারে।

ভাবলাম অত কথায় কাজ কি, আমাকে নিয়ে যাক না যেখানে ইচ্ছে। আমি তো নাইট ক্লাব দেখবার জন্যে উৎসুক। হয় তো বেশ কিছু খরচ হবে।

হয় হোক। খরচ করবার জন্যে আমি প্রস্তুত।

সেই রেস্তোরাঁয় বসে আর সময় নষ্ট করা সমীচীন মনে করলাম না।

মিকিকে বললাম, আমাকে তোমার নাইট ক্লাবে নিয়ে চল।

মিকি বলল, আর একটু পরে গেলেই ভাল হয়, বেশি রাত না হলে আসর ঠিক জমেনা। আমি আজ একটু আগে বেরিয়েছিলাম অন্য একটু দরকারে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আমার কাজ মিটে গেল—

আমার আর ধৈর্য ছিল না। আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, কিন্তু আগে গেলে তো ক্ষতি নেই। তোমাদের ক্লাব খোলে কখন?

মিকি আমার গা ঘেঁষে বললে, খোলে সন্ধ্যাবেলা। হ্যাঁ চল ক্লাবেই যাওয়া যাক। তুমি একটা টেবিল নিয়ে আমার জন্যে বসে থেক, আমি মাঝে মাঝে এসে তোমার সঙ্গে গল্প করে যাব। মনে রেখ আমার নাম মিকি।

আমি সিগারেট ধরিয়ে বললাম, আমার খুব মনে থাকবে। কিন্তু না থাকলে ক্ষতি কি, তুমি তো বললে আমার টেবিলে এসে আমার সঙ্গে গল্প করবে।

মিকি আমাকে নিয়ে রাস্তায় বার হল। খুব সহজে ও আমার হাতের মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পথ চলতে লাগল।

প্রথম কয়েক মিনিট অপরিচয়ের ভীতি আর মনের দুর্বলতার জন্যে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সেই সনাতন ভাবনা বারবার আমার মনে উঁকি মারছিল। যদি কেউ দেখে ফেলে, যদি দেশে খবর পৌঁছয়, যদি আমার সুনাম মুছে যায়। বয়স হয়েছে। দায়িত্ব বেড়েছে। তাই যেন দোটানায় পড়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

অবশ্য নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখবার মতো মনের অবস্থা সেদিন ছিল না। আজ মিকির কথা লিখতে বসে সেকথা ভেবে হাসি পাচ্ছে।

আমাদের এই নিদারুণ বিকৃতির জন্যে দায়ী কে ? কেন প্রতিপদে আমরা শুধু নিজেকে ঠকিয়ে যৌবন দাবিয়ে রাখি ?

স্বল্প পরিচিতা একটি মেয়ের সঙ্গে বিদেশের নাইট ক্লাব দেখবার জন্যে আমার সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, অথচ অন্য কাউকে সেকথা জানাবার সাহস নেই। কেবলই ভয় হচ্ছে পাছে কেউ দেখে ফেলে।

কেন এই ছলনা ? নিজেকে এই প্রতারণা ? লোককে আমার মনের আসল কথা সহজ করে বলবার সাহস নেই কেন ?

ডিসেম্বর মাস। আর কয়েকদিন পর বড়দিন। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। লণ্ডনের চেয়ে প্যারিসের শীত যেন আরও ভারী। পথ চলতে চলতে আমার সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কিন্তু সমস্ত কেডে অঞ্চল উৎসবে মুখর হয়ে উঠেছে। রাস্তার ধারে ধারে মেলা বসেছে। সেখানে বহু নর নারীর ভিড়। কোথাও ম্যাজিক দেখান হচ্ছে, কোথাও লটারী হচ্ছে, কোথাও পুরোদমে জুয়োখেলা চলেছে।

দূর থেকে বাজনার শব্দ ভেসে আসছে। কাছে গেলে দেখা যাচ্ছে সেখানে ছেলেমেয়ের সুলভ নাচ চলেছে।

এদের দিকে তাকিয়ে মনে হয় না যে, পৃথিবীর কোথাও কোন দুঃখ কষ্ট আছে। সকলের মুখে হাসি, সকলের প্রাণে খুশি। শরীরের কোথাও কোন ক্লান্তির ছাপ নেই।

সেই দূর দেশে এক প্রায়-অপরিচিতা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে পথ চলতে চলতে চারপাশে অসংখ্য প্রাণচঞ্চল নরনারীর দিকে তাকিয়ে সহসা আমি আমার সমস্ত সংস্কার ভুলে গেলাম। আমি সজোরে মিকির হাত চেপে ধরলাম।

কি হলো ; মিকি জিজ্ঞেস করল, খুব শীত লাগছে ?

না, তোমার সঙ্গে হাঁটতে আমার খুব ভাল লাগছে।

হেসে মিকি বলল তাহলে শুনে দুঃখিত হবে, পথ প্রায় ফুরিয়ে এল, একটু আস্তে চলব ?

তোমার কোন ক্ষতি হবে না তো?

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু থেমে সে বলল, না না, কি আবার ক্ষতি?

সে চলার গতি অনেক কমিয়ে দিতে আমি বললাম, এবার যে শীত লাগছে মিকি—

আমার নামটা এখনও ভোল নি দেখছি।

এত সুন্দর নাম এখুনি ভুলে যাব, তুমি কি মনে কর আমাকে?

আমার কথা যেন শুনতে পায় নি এমন ভাব করে ও বলল, প্যারিসে বুঝি এই প্রথমবার বেড়াতে এসেছ?

হ্যাঁ।

ভাষা শিখেছ?

এই একটু-আধটু আর কি।

মানে, আমি তোমাকে ভালবাসি—এই কথাটা দিব্যি পরিষ্কার করে বলতে পার?

আমি জোরে হেসে বললাম, তার চেয়ে আর একটু বেশি জানি।

যেমন?

এই ধর, শনিবার রাত্তিরে তোমার সঙ্গে নাচতে যাব তারপর তোমার সঙ্গে সমস্ত রাত গল্প করব।

খুব জোরে হেসে মিকি বলল, বাঃ তুমি তো একেবারে তৈরী হয়ে প্যারিসে এসেছ, দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে ও বলল, কতদিন থাকবে এখানে?

আর চার পাঁচদিন থাকবার মতো অর্থ আছে। ভেবেছিলাম মাসখানেক থাকব। কিন্তু দিন সাতেকেই টাকা প্রায় ফুরিয়ে এল।

মিকি বলল, প্যারিসে এলে অনেকের অবস্থা ঠিক তোমার মত হয়। এসব কথা ভাবলে খুব গর্ব হয় আমার। প্যারিসকে তোমরা এত ভালবেসে ফেল যে কিছু না ভেবে সব টাকা খরচ করে দাও।

একবার ভাবলাম বলি, যে দেশে পথে ঘাটে তোমার মতো মেয়ের দেখা মেলে সেখানে নিঃস্ব হয়ে যেতে আর কতক্ষণ সময় লাগে মানুষের।

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই মিকি হঠাৎ থেমে বলল, এই যে ক্লাব এসে গেছে। এবার আমি অন্য দরজা দিয়ে যাব, তুমি সামনে দিয়ে যাও। ঢুকতে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক লাগবে আর মদের একটা পুরো বোতল কিনতে হবে। যাও কিছু অসুবিধা হবে না। ওরা একটু একটু ইংরেজী জানে।

মিকি আমাকে ভেতরে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে অতি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

আগেই বলেছি নাইট ক্লাবের অভিজ্ঞতা আমার এর আগে হয় নি। তাই মনে উত্তেজনা মেশান কৌতূহল ছিল। কি দেখব কে জানে। হয়ত কত অপ্সরীর লীলায়িত ভঙ্গি। নৃত্যের তালে তালে কত রকমের রূপবিকাশ! কত মধুর পরিচয়ের ইঙ্গিত। আমার ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে হয়ত ঘিরে থাকবে ফরাসীর কত অপরূপ সুন্দরীর দল।

দেশে সব রকমের ক্ষুধা সংস্কারের ভারে বাধ্য হয়ে চেপে রাখতে হয়েছে বলে প্যারিসে এসে মনটা যেন বড় বেশি কাঁচা হয়ে পড়েছে।

এদেশের আকাশে বাতাসে শুধু শুনি উর্বশীর নৃত্যের ঝঙ্কার। আমাকে নিরন্তর হাতছানি দিয়ে ডাকছে। অথচ আশ্চর্য, আমি প্রাণ খুলে সাড়া দিতে পারছি না। তাই মাঝে মাঝে মনের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করি।

কিন্তু মিকির সেই নাইট ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার সাহস যেন আশ্চর্য রকম বেড়ে গেল। আমি যেন আর কাউকে গ্রাহ্য করি না। কেউ আমাকে দেখুক বা না-দেখুক, কেউ আমার এই রাতের রঙ্গ উপভোগ করবার কথা জানুক বা না-জানুক তাতে আমার কিছু আর এসে যায় না।

আমি আর পাঁচজনের সামনে দিয়ে অসঙ্কোচে সটান ভেতরে এসে বসলাম।

প্রথমে একটু হতাশ হলাম যেন। আমি যেমন কল্পনা করেছিলাম তেমন কিছুই চোখে পড়ল না।

আমি ভেবেছিলাম ভেতরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সুন্দরী আমাকে ঘিরে নানা রঙ্গ শুরু করবে আর তাদের স্পর্শে আমার যৌবন উচ্ছল হয়ে উঠে আমাকে কাঁপিয়ে মাতিয়ে দিশেহারা করে তুলবে। অন্তত ক্লাবের অভ্যন্তর যে একটু কায়দা করে সাজান থাকবে তা আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। প্যারিসের নাইট ক্লাব যে এত সাধারণ হবে সেকথা ভাবতে পারি নি।

ঠিক বড় প্রেক্ষাগারের মতো মনে হয় আর চেয়ার টেবিল হোটেলের মতো করে সাজান। নানা রকম লোক সেখানে বসে মদ খাচ্ছে। ওয়েটাররা ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। সামনে স্টেজ। অনবরত বাজনা বেজে চলেছে আর রঙমাখা মেয়েরা একের পর এক সেখানে নাচগান করে চলেছে।

হয়তো ওরাই হল প্যারিসের নাইট ক্লাবের দেখবার জিনিস। কারোর কারোর গায়ে কোনো রকম কাপড় নেই বললেই চলে। লাবণ্যময়ী যুবতী মেয়ের দল। নাচ গানের ফাঁকে ফাঁকে তারা তাদের ভাষায় দর্শকদের সঙ্গে নানা রকম রসিকতা করতে ছাড়ছে না।

কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর এসব দেখতে আমার মন্দ লাগল না। সত্যিই তো পৃথিবীর কোথাও স্টেজের ওপর এমন স্বল্প বস্ত্র মেয়েদের ভিড় দেখিনি। এরা রঙ্গ দেখাতে জানে বটে।

এই ধরনের ক্লাবগুলি নাকি সারারাত খোলা থাকে। বাইরে মদের দোকান যথাসময়ে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু এখানে মদ সব সময় পাওয়া যায়। এখানে সব সময় আনন্দ। এমনি ফুর্তির মাঝে যারা সময় কাটাতে চায়, প্যারিসের এই ধরনের নাইট ক্লাবগুলি বোধ হয় তাদেরই জন্যে।

নানা রকম লোক এখানে এসেছে। তারা জোরে জোরে গল্প করছে, স্টেজের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে রসিকতা করছে আর প্রেক্ষাগারে হাসাহাসির ধুম পড়ে যাচ্ছে।

এক বর্ণ ভাষা বুঝতে না পারলেও আমার মনে হল এখানে যেন সকলের সাত খুন মাপ। রসিকতার মাত্রা ছাড়ালেও কেউ কিছু মনে করে না। বরং স্টেজ থেকে মেয়েরা মনের মতো উত্তর দেয়।

আমি লক্ষ্য করলাম, স্টেজের সেই মেয়েরা তাদের প্রোগ্রাম হয়ে যাবার পর সেই পোশাকেই বাইরে বেরিয়ে এসে লোকের সঙ্গে গল্প করছে। অর্থাৎ তাদের সঙ্গে মদ খেতে খেতে তাদের সঙ্গ দিচ্ছে।

এই সব দেখে শুনে আমি নড়ে চড়ে বসলাম। এখন আর আমার মোটেই দিশেহারা ভাব নেই। আমি অবাক হয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

এদের দিকে তাকিয়ে কে বলবে মানুষের দুঃখ দৈন্য অভাব অভিযোগ আছে। শুধু আনন্দ করবার জন্যে যেন এদের জন্ম হয়েছে। অফুরান রূপ যৌবন নিয়ে যেন উর্বশী নুপূর বাজিয়ে চলেছে আর তার তালে তালে এরা সব কিছু ভুলে মেতে উঠেছে। জীবনে যদি অভাব থেকে থাকে তাহলে যেন আজকের এই শক্তিসঞ্চয় কাল তাদের দেবে অভাবের সঙ্গে সংগ্রামের বিপুল ক্ষমতা।

আমি মধ্যবিত্ত। তাই অভাবকে আমি সব চেয়ে বেশি ভয় করি। দৈন্য আমাকে নিরন্তর পীড়া দেয়। আমি জীবনের কোন অবস্থাতে দুঃখ দৈন্য অভাব একেবারে ভুলে থাকতে পারি না। আর ভোলবার চেষ্টা করলে এত বিস্মৃত হয়ে এমন কিছু করে থাকি যা পরমুহূর্তে আমার অভাব আরও বাড়িয়ে দেয়।

হঠাৎ স্টেজের ওপর মিকিকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। তারপর অবাক হয়ে তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

এই অল্প সময়ের মধ্যে কেমন করে সে অন্য মানুষ হয়ে উঠল। এখন তাকে আর সহজে চেনা যায় না। আমি দুই চোখ ভরে তাকে দেখতে লাগলাম।

তার পরনে শুধু নামমাত্র বস্ত্র। তাও গায়ের রঙের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গেছে যে বস্ত্র বলে মনে হয় না।

স্টেজের ওপর আর একজন অভিনেতার সঙ্গে সে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে ফরাসী ভাষায় কি সব রসিকতা করছিল।

আমি তাদের কথার এক বর্ণ বুঝতে না পারলেও থেকে থেকে আমার চারপাশ থেকে হাসির হুল্লোড় হচ্ছিল। না বুঝলেও আমি না হেসে থাকতে পারছিলাম না।

মিকিও আমাকে দেখতে পেয়েছিল আর আমার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে প্রাণপণে রসিকতা করে বিশেষভাবে আমাকে হাসাবার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু হায়রে বাঙালীর মন? এতক্ষণ পর আমি ভাল করে বুঝতে পারলাম মিকি নাইট ক্লাবে চাকরি করে। তার ব্যবহার দেখে একেবারে প্রথমেই আমার সে কথা বোঝা উচিত ছিল। এমন মেয়ে না হলে একজন পথের লোককে কে আর অত সহজে আপনার করে নেয়।

হঠাৎ যেন আমার সমস্ত আনন্দ বিস্বাদ হয়ে গেল। বার বার এই কথাটা ফিরে ফিরে মনে বাজতে লাগল, আমি যার সঙ্গে এতক্ষণ কাটালাম, সে একজন সাধারণ নাইট ক্লাবের অতি সুলভ মেয়ে।

এমন মেয়ের দেখা পাবার জন্যেই কি আমি প্যারিসে রয়ে গেলাম। কোন দেশে এদের অভাব। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিজের কাছে নিজে যেন ছোট হয়ে গেলাম।

মিকির প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাবার পর সেই পোশাকেই আস্তে আস্তে এসে আমার পাশে বসল। আমি তো এতক্ষণ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে বসেছিলাম। তাই মদের বোতল টেবিলের ওপর

যেমনকার তেমন পড়েছিল। এর আগে আরও অনেক মেয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমি এমন নির্বিকার ভাবে বসেছিলাম যে তারা কয়েক মিনিটের মধ্যে উঠে চলে যায়।

মিকি এসে সটান আমার গলা জড়িয়ে ধরে তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল, নাইট ক্লাব কেমন লাগল?

আমার থমথমে ভাব ততক্ষণে কেটে গেছে। আমি উৎসাহ নিয়ে উত্তর দিলাম, খুব ভাল। এমন আমি কখনও কোথাও দেখি নি।

সকলেই সেকথা বলে, আমার টেবিলে রাখা ফরাসী মদের বোতল খুলতে খুলতে সে বলল, এটা এখনও খোল নি যে?

তোমারই অপেক্ষা করছিলাম মিকি।

বেশ বেশ, এখন যতক্ষণ চাও আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারি, হেসে ও বলল, বাইরে নিয়ে যেতে চাও তাও যেতে পারি, কিন্তু তাহলে আমাকে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে হবে। রাজি? সেকথায় কান না দিয়ে বললাম, তুমি আর স্টেজে যাবে না? না, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন উপরি-পাওনা আদায় করবার সময়, আমার গালে হাত বুলিয়ে মিকি বলল, আর এক বোতল মদ আনতে বল। এটা তো এখুনি শেষ হয়ে যাবে। আমি বড় ক্লান্ত। এ সময়ে দু তিন বোতল না হলে আমার হয় না, আমাকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে সে আর এক বোতল কনত্রো আনতে বলল।

আমি কম খরচ করি। আর নাইট ক্লাব দেখব বলে বেশ কিছু বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। ব্যয় সম্বন্ধে মুহূর্তের জন্যে সচেতন হয়ে উঠলেও পর মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলাম।

আমি তখনও মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে চারপাশে তাকাচ্ছিলাম। রাত অনেক। আর কয়েক ঘণ্টা পর বাইরে আস্তে আস্তে ভোরের আলো ফুটে উঠবে। তখন মিটে যাবে এ আনন্দ কোলাহল।

কিন্তু আমি এর মধ্যেই বুঝতে পেরেছি এরা ক্লান্ত হবে না। খুব অল্প সময়ের জন্যে হয়তো বিশ্রাম করবে। তারপর ছুটবে চাকরি করতে। রাতের ক্লান্তি থাকবে না শরীরের কোনখানে। ওদিকে বাজনা বাজছে। এখন যে মেয়েরা স্টেজে নানা ভঙ্গি দেখাচ্ছে, এক কথায় তাদের বিবস্ত্র বলা যায়।

মিকির পাশে বসে তাদের দিকে তাকাতে অকস্মাৎ আমার সঙ্কোচ হল। মিকির কিন্তু কোন লজ্জা নেই। সে মাঝে মাঝে সেই মেয়েদের দিকে তাকিয়ে রঙ্গ উপভোগ করছে আর কখনও কখনও আমার পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করছে, কেমন লাগছে?

আমি সমানে উত্তর দিয়ে যাচ্ছি, ভাল, খুব ভাল।

মিকির মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে কতক্ষণ বসেছিলাম খেয়াল নেই, হঠাৎ শুনলাম স্টেজ থেকে বড় করুণ সুর ভেসে আসছে। তাকিয়ে দেখলাম একা গিটার বাজিয়ে একটি সম্ভ্রান্ত চেহারার মেয়ে গাইছে। তার পোশাক কামনার ইঙ্গিত করে না।

এ কি গান মিকি? আমার খুব ভাল লাগছে।

বিরহের করুণ গান, মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে মিকি বলল, মেয়েটির গলা সত্যিই খুব মিষ্টি।

কিন্তু ওর সাজসজ্জা তো তোমাদের মতো নয়?

হেসে মিকি বলল, স্বভাবও আমাদের মতো নয়। ও খুব ভদ্র। বেচারির স্বামী জার্মান সৈনিকের হাতে মারা যায়। কোথাও কিছু করতে না পেরে এই ক্লাবে চাকরি নিয়েছে, দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মিকি বলল, ঠিক আমার অবস্থা আর কি!

ওর গানের কথাগুলির মানে কি?

দক্ষিণ ফ্রান্সের চলতি একটি গান, প্রিয়তম তুমি কোথায়! আমি জানি তুমি এই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও বেঁচে আছ। যেখানেই থাক, সুখে থাক।

আমি শুধু বললাম, বাঃ সুন্দর।

মিকি বলল, নাইট ক্লাবে শুধু সুলভ রঙ্গ রস হয় না। তোমার মতো বিদ্বান লোকেদের জন্যে এমনি গানের ব্যবস্থাও থাকে।

কেমন করে বুঝলে আমি বিদ্বান ?

কে কেমন লোক সেটুকু বোঝবার বুদ্ধি আমার আছে।

কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা আলাপ হয়েছে ?

মিকি হাসল, ওইটুকুই যথেষ্ট।

তারপর সেই করুণ গান শুনতে শুনতে আমি অন্য কথা ভাবতে লাগলাম। আমরা এতদিন জানতাম এইসব ক্লাবে যারা আসে তাদের ওপর লোকের ভাল ধারণা থাকে না। কিন্তু আজ মনে হল এরা সকলেই বড় লোক, ভাল লোক। সমাজে হয়তো এদের নাম আছে, দামও আছে। বোধ হয় এদের আনন্দ পাবার রীতিই এমনি।

তবে এসব কথা ছাড়িয়ে মিকির ভাবনা আমার মনে প্রধান হয়ে উঠেছিল। আমি তার দিকে তাকিয়ে আবার তারই কথা ভাবতে লাগলাম।

মিকি, আস্তে বললাম, এখানে কতক্ষণ থাকবে ?

মিকি হেসে বলল, তুমি যতক্ষণ রাখবে, একটু থেমে ও আবার বলল, চল না তোমার হোটেলে গিয়ে সারা রাত গল্প করি ?

তার কথার উত্তর দিতে কোথায় যেন বেধে গেল। একটু ইতস্তত করে বললাম, অন্য দিন হবে, আজ নয়।

আজ বেশি টাকা নেই বুঝি ?

অন্যমনে বললাম, না।

তাতে কিছু যায় আসে না, মনে হল মিকির যেন ঘোর লেগেছে, যা পার দিও, চল তোমার সঙ্গে যাই। তোমাকে আমার খুব ভাল লাগছে।

আমি মনে মনে হাসলাম। ঠিক এই কথা হয়তো প্রতি রাত্রে কত অজস্র মানুষকে সে বলে। কিন্তু কেন বলে? অত টাকা দিয়ে কি করে ও? ওর টাকার অভাব কি? চেহারা ভাল। অসঙ্কোচে প্যারিসের রাতের রঙ্গমঞ্চে নিজেকে তুলে ধরে। তারপর কেন ও আবার সঙ্গ দিতে বাইরে যায়?

আমি অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠলাম। কিছুতেই মিকিকে আমার হোটেলে নিয়ে যাওয়া হবে না।

মিকি আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি কি সত্যিই আমাকে নিয়ে তোমার হোটেলে যাবে না?

আমি বললাম, আজ নয়। অন্য আর একদিন হবে। আমি আগে থেকে হোটেলে বলে রাখব।

আমার কথা শুনে অবাক হয়ে মিকি বলল, বলবার দরকার কি? এ সব কথা এখানে আবার আগে থেকে কেউ বলে রাখে না কি?

মানে তবু—

কিন্তু তুমি আমাকে না নিয়ে গেলে আমার বেশ অসুবিধা হবে।

কি অসুবিধা মিকি?

বোঝ তো আমাকে সংসার চালাতে হয়। আর তার জন্যে বেশ খরচ আছে—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, কে আছে তোমার সংসারে?

ও হাসল, অনেক লোক। বাবা, তুটো ভাই, তিনটে ছোট ছোট বোন।

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, বাঃ তুমি তো তাহলে রীতিমতো গৃহস্থ!

গৃহস্থ কি সারারাত ধরে চাকরি করে?

আমি কিছু না বুঝে বললাম, কিসের চাকরি মিকি?

আমি আমার নিজের কথা বলছিলাম। আমি দিনে ঘুমোই আর সারা রাত চাকরি করি। তোমার সঙ্গে এতক্ষণ যে গল্প করেছি,

তোমার হোটেলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি—এ তো আমার চাকরির অঙ্গ। এর জন্যে পারিশ্রমিক পেতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠল। মিকির মুখে একথা শোনবার পরমুহূর্ত থেকে আমি বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কোথায় যেন আমার নতুন করে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল।

মনে হল, আমি যার সঙ্গে কথা বলছি সে প্যারিসের রাতের সুলভ সঙ্গিনী, সে যে-কোন লোককে অর্থের বিনিময়ে সব দিতে প্রস্তুত। নিদারুণ অস্বস্তিতে উঠে পড়বার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

কিন্তু ভেবে পেলাম না মিকির হাত থেকে মুক্তি পাব কেমন করে। কারণ খুব বেশি টাকা আমার পকেটে ছিল না। আমি বুঝতে পারলাম না সে কি পরিমাণ অর্থ দাবী করবে। সেকথা জানবার চেষ্টায় একান্ত অনিচ্ছায় মিকির সঙ্গে নানা গল্প করতে লাগলাম।

এবার স্টেজের অভিনেতা অভিনেত্রীরা হঠাৎ আমাদের নিয়ে রসিকতা করতে আরম্ভ করতে লাগল। অবশ্য সেকথা মিকি আমাকে না বলে দিলে আমরা কিছুই বুঝতে পারতাম না।

এই রে, এবার ওরা আমাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতে লেগে গেল যে?

স্টেজের দিকে তাকিয়ে আমি ভয়ে ভয়ে মিকিকে জিজ্ঞেস করলাম, তাই নাকি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে কর কি? ভুলেও স্টেজের দিকে তাকিও না—

কেন?

মাথা নিচু করে মিকি বলল, জান ওরা আমাদের নিয়ে কি রসিকতা করছে?

কি?

না, সে কথা তোমায় কি করে বলি?

আমার মুখ থেকে ফস করে বেরিয়ে গেল, তোমাদের আবার লজ্জা কি ?

আমার কথায় মিকি যেন বেশ দুঃখ পেল। তারপর একটু উসখুস করে বলল, আর বেশিক্ষণ এখানে বসা যাবে না, আমাদের বোধহয় এবার উঠতে হবে—

যারা একা এসেছিল তাদের সঙ্গী জুটে গেছে। জোড়ায় জোড়ায় অনেকে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। দেখতে দেখতে খালি হয়ে যাচ্ছে প্রেক্ষাগৃহ।

আমি প্রশ্ন করলাম, তুমি কি এখন বাড়ি যাবে ?

স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে মিকি বলল, আমি এ সময় কোন দিনও বাড়ি যাই না, আর এখন যাবার উপায়ও নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

এখন মেট্রো বন্ধ। আমি এখান থেকে বেশ দূরে থাকি, ট্যাক্সি করে যেতে গেলে খরচ অনেক !

আজ রাত্তিরটা এখানে থাকতে পার না বুঝি ?

না না না, এখানে কারা থাকে জান ?

আমি বোকার মতো প্রশ্ন করলাম, কারা ?

যাদের বয়স হয়েছে, যারা কুৎসিত, যাদের বাইরে নিয়ে যাবার লোক জোটেনা শুধু তারা—বুঝেছ ? আমার মান সম্ভ্রম আছে তাই আমার এখানে রাত্তিরে থাকা সাজে না।

আমি হেসে বললাম, আহা রাগ কর না, আমি তোমায় ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দেব।

কিন্তু অনেক ভাড়া লাগবে যে ?

লাগুক, আমি মিকিকে আশ্বাস দিলাম, এখানে যতক্ষণ বসতে দেয় বসা যাক, যখন আর বসতে দেবে না তখন আমরা দুজনে বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সি খুঁজে নেব।

ঠিক বলছ ?

হ্যাঁ, হেসে বললাম, আমি মিথ্যা কথা বলি না।

মিকি আমার কথায় অবাক হয়ে বলল, ট্যাক্সি ভাড়া খরচ না করে আমাকে তোমার হোটেলে নিয়ে গেলেই তো পারতে? আমাকে যা হয় দিলেই চলত—

আমি তার মুখের কাছে মুখ এনে বললাম, হোটেলে তো সকলেই নিয়ে যায়, আমি না হয় নতুন কিছু করে যাই। আমার কথার অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে মিকি বলল, তাহলে আর এক বোতল মদ আনতে বল, এখনও কিছু সময় আছে।

আমি তাই করলাম।

ওদিকে আসর ভেঙ্গে গেছে। একটু পরেই শেষ হয়ে যাবে আমাদের রাতের রঙ্গ। পৃথিবীর জাগরণের সময় ক্লান্ত নটীর চোখে নেমে আসবে ঘুম।

সেই ভাঙ্গা আসরে তখন সমবেত স্বরে গান চলেছে—

"আলুয়েৎ।
আপুয়েত্তা জলি আলুয়েৎ
আলুয়েৎ—"

মিকির সঙ্গে ট্যাক্সির খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। সে সেই পোশাকের ওপর শুধু দামি ওভারকোট পরে নিল।

ভেতরে যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ বুঝতে পারিনি ঠাণ্ডার জোর কত। বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁতে দাঁত ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললাম, আমি তো এখানকার কিছুই চিনি না, কোনদিকে গেলে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে?

সামনেই, আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে মিকি বলল, আমাদের দেখলেই ট্যাক্সি এগিয়ে আসবে—কিন্তু সত্যি বলছি তোমাকে, এখন, বাড়ি ফেরবার আমার একটুও ইচ্ছে নেই—

আমি কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে বললাম, তাতো বুঝতেই পারছি কিন্তু উপায় কি!

সে কথায় কান না দিয়ে মিকি বলল, এ চাকরি করবার পর এর আগে আমি বোধহয় আর কখনও এমনি করে বাড়ি ফিরিনি।

তাহলে তো আজ তোমার খুব ভাল লাগবার কথা।

না, বরং খারাপ লাগছে!

কেন মিকি?

মনে হচ্ছে ফাঁকি দিয়ে তোমার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছি। তুমি যদি কাজ না করে মাইনে নাও তাহলে তোমার যেমন মনে হয় যে তুমি কারোর কৃপা কুড়লে, আমার আজ সে কথা মনে হচ্ছে।

কৃপা কেন? তুমি তো আমাকে অনেকক্ষণ সঙ্গ দিয়েছ।

দিয়েছি বটে। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার কাছ থেকে যেন আমাব পাওনার চেয়ে অনেক বেশি নিচ্ছি। কাজেই কিছুতেই আমার এখন বাড়ি যাওয়া হবে না, মিকি জড়ানো স্বরে বলল, আমাকে তোমার হোটেলে নিয়ে চল।

তা হয়না মিকি?

কেন হয় না? খুব হয়। কতবার বলেছি, যা পারবে আমাকে দেবে, আমি একটি কথাও বলব না।

তবুও আমি চুপ করে রইলাম। মিকিকে কেমন করে বোঝাব টাকার কথা আমি একেবারেই ভাবছি না। মুখে কিছু না বললেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই প্যারিসে নানা আমোদ প্রমোদে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে প্রথমে আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম! সৎ বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে খরচ আমার তেমন কিছুই হয়নি! এখনও মিকির জন্যে পরপর কয়েকদিন কিছু খরচ করবার সামর্থ্য আমার আছে।

আমি ভাবছিলাম অন্য কথা! মধ্যবিত্ত বাঙালী মনের সেই

সনাতন ভাবনা। আমি পয়সা বাঁচাবার জন্যে লণ্ডন থেকে এখানকার একটি খুব সাধারণ হোটেলের ঠিকানা নিয়ে এসেছিলাম।

সার্ভ লে কুর্ব মেট্রোর নিম্ন-মধ্যবিত্তদের জন্যে একটি হোটেল। নাম হোটেল লুক্সা। নাম আর হোটেলের মালিকের স্ত্রীর চেহারাটি শুধু জাঁকালো। আর কিছু চোখে পড়বার মত নয়। দরিদ্রের পাড়া। একটু দূরেই মজুরদের বস্তি।

প্যারিসের ভাল মন্দ দোষ গুণ বোঝবার জন্যে আমি আসিনি। অল্প কয়েকদিনে বোঝা সম্ভবও নয়। হোটেলের সুবিধা অসুবিধার কথা আর পাঁচজনকে জানান আমার ইচ্ছে নয়।

শুধু এইটুকু বলব যে, সেই হোটেলের প্রত্যেকে আমাকে এর মধ্যেই যথেষ্ট সম্মান করতে আরম্ভ করেছে। ওদের স্পষ্ট ধারণা হয়েছে যে, আমি লেখাপড়া জানা সৎ লোক। শেষ রাত্তিরে হঠাৎ নাইট ক্লাবের মেয়ে নিয়ে ঘরে ফিরলে আমার ওপর কি ধারণা হবে সেই কথা ভেবে আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আর তাই মনে মনে ইচ্ছে থাকলেও মিকিকে এড়িয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। এসব কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ আমার হাসি পেল। থেকে থেকে বুঝতে কষ্ট হয় কেন আমার সংস্কার আমার সত্যকে ছাড়িয়ে যায়।

এদিকে মিকির সঙ্গে আমি নাইট ক্লাবে রাত কাটালাম, ফরাসী মদের গেলাসে চুমুক মারলাম। এখন আর পাঁচ জনের সামনে তাকে বের করতে সঙ্কোচ হয় কেন! কেন দিনের আলোয় দিতে পারি না তার পরিচয়! হঠাৎ নিজেকে জয় করবার তীব্র নেশা আমাকে পেয়ে বসল।

আমি মিকিকে বললাম, চল আমার হোটেলেই যাই।

আমার কাঁধে তার সমস্ত দেহভার এলিয়ে দিয়ে মিকি পরম খুশিতে যেন ভেঙে পড়ে বলল, সেই সব চেয়ে ভাল।

আমি জানতাম এমন একটা অবস্থা আমার হবেই।

মিকিকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় আমার বুক কেঁপে উঠল। ঘর খোলবার সময় জোরে চাবির শব্দ হল মনে করে চমকে উঠে চারপাশে তাকিয়ে নিলাম।

আলো জ্বালাতেই মনে হল কারা যেন আমাদের দেখে ফেলল। মিকিকে হোটেলে নিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কায় আমার শরীর হিম হয়ে গেল। কে জানে তার নেশা হয়েছে কি না। কে জানে কি তার অভিপ্রায়। এখন আমি কোন ফাঁদে পড়ব বোঝা কঠিন।

এ ধরনের মেয়েদের সম্পর্কে নানা গল্প শুনেছি। এরা মুখে এক রকম বলে, কাজের সময় অন্য রকম করে। যদি এখন ও চেঁচামেচি করে একটা কাণ্ড বাধায় তাহলে আমি কি করব? কোথায় পালাব?

দুঃসহ গ্লানিতে আমার সমস্ত মন ভরে উঠল। ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ এমন কাজ করা আমার কিছুতেই উচিত হয়নি।

এ ছাড়া আরও একটা কথা ভেবে আমি মনে মনে লজ্জা পেলাম। আমার ওপর অনেক দায়িত্ব। দেশে আমার ভরা সংসার। এমন করে বিদেশে মেয়ে নিয়ে রাত কাটান আমার সাজে না।

প্যারিসে তো আরও কত কি আছে দেখবার। সকল কিছু ছাড়িয়ে কেন নাইট ক্লাব আমার কাছে বড় হয়ে উঠল! যদি তা না দেখে আমার সেই সব বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আমি লণ্ডনে ফিরে যেতাম তাহলে বোধহয় সব চেয়ে ভাল হত!

এমনি নানা কথা ভাবতে ভাবতে আমি অসহায়ের মত মিকির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তার মুখ দেখে মনে হল ঘরে প্রবেশ করতে পেরে সে বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছে। আমাকে কিছু করবার অবসর না দিয়ে সে নিজেই কোট খুলে হুকে টাঙিয়ে রাখল। তারপর খাটের ওপর বসে জুতো

খুলতে লাগল। লক্ষ্য করলাম সে আমাকে আড়াল করবার ভান করে নাইলন খুলতে লাগল।

তারপর বিছানার দিকে তাকিয়ে জোরে বলে উঠল, বাঃ কী সুন্দর বিছানা!

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, এই আস্তে।

কেন? খিলখিল করে হেসে মিকি বলল, তুমি অমন শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছ কেন গো? এস, শোবে এস, রাত যে শেষ হয়ে এল প্রিয়তম—

আমার দেহে মনে ভয়ের একটা শিহর খেলে গেল। মিকিকে হাসতে দেখে আর কথাবার্তা শুনে আমি নিঃসন্দেহ হলাম তার নেশা ধরেছে। এখন সে যা-তা কাণ্ড করতে পারে। আমি চোরের মতো এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আশঙ্কায় কাঠ হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কম্বল টেনে গায়ে দিতে দিতে মিকি বলল, কি হল? তুমি কি আসবে না? এসো শিগগির, আমার ঘুম পাচ্ছে কিন্তু—

আমি ভয়ে ভয়ে আবার বললাম, দয়া করে একটু আস্তে কথা বল মিকি, কেউ শুনতে পাবে—

আমার কথা শুনে গলার স্বর আর এক পর্দা তুলে মিকি বলল, শুনতে পেলে কি হবে শুনি? এটা নোতরদাম গির্জে নাকি যে মুখ বুজে প্রার্থনা করতে হবে?

না না—মানে যদি হোটেলে অন্য কারোর অসুবিধা হয়?

সে ভাবনা তোমার নাকি? যাদের পয়সা থাকে তারাই তোমার মত ফুর্তিতে রাত কাটায়। আর যাদের পয়সা নেই তারা হাত কামড়ে নাক ডাকায়। ঘাবড়িও না, আমার গলার স্বর কারোর কানে যাবে না।

সে অভয় দিলেও আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। কাল সকালেই বা কি করব? এদের চোখের সামনে দিয়ে মিকি কেমন করে বেরিয়ে যাবে?

ওর চেহারা দেখেই তো এই হোটেলের প্রত্যেকে বুঝে নেবে সে কোন জাতের মেয়ে। আর তখন আমি দাঁড়াব কোথায়।

ঘুম জড়ান স্বরে মিকি আর একবার ডাকলো, এস এস—উঃ কী শীত!

আমার ঘরের আলো ঠিক তেমনি করেই জ্বলছে। কিন্তু বাইরে আর অন্ধকার নেই। বুঝতে পারিনি সেই চেয়ারেই কখন আমার চোখে ঘুম নেমে এসেছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ঘুম ছুটে গেল।

চোখ খুলে দেখলাম বাইরে বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিকি দাঁড়িয়ে আছে। ওভারকোটও পরে নিয়েছে। আমার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে সে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার চেহারা দেখে আমি বিচলিত হয়ে উঠলাম।

কি হল মিকি!

জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করছে না? কেন তুমি রাত্তিরে আমাকে তোমার হোটেলে নিয়ে এলে?

তার প্রশ্ন শুনে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এইবার নিশ্চয়ই মিকি একটা কেলেঙ্কারী করবে। তারপর খবর পৌঁছবে ইণ্ডিয়ান এমবেসি আপিসে। ব্যস, ভারতীয়ের মামলা নিয়ে সারা প্যারিস শহরে ঢি ঢি পড়ে যাবে।

আমি ঢোঁক গিলে থেমে তার কথার উত্তর দিলাম, তুমিই তো বললে হোটেলে নিয়ে আসতে?

হ্যাঁ, একশো বার বলেছি। কিন্তু সে কি এখানে ঘুমিয়ে কাটাবার জন্যে? না তোমার ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে? তুমি কি মনে করেছ আমি তোমার বিয়ে-করা স্ত্রী? এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি তোমার নেই যে, আমাকে চাকরি করে খেতে হয়?

আমি তখনও কিছু না বুঝে বললাম, সে কথা আমি জানি, কিন্তু

তুমি শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করছ কেন ? আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি বলতে পার ?

মূর্খ কোথাকার ! কিছু বুঝতে পার না, না ? মুখ বিকৃত করে সে বলে চলল, কাল তোমার সঙ্গে না বেরিয়ে আমি যদি অন্য কারোর সঙ্গে গিয়ে অন্য কোথাও রাত কাটাতাম তাহলে এতক্ষণে আমার ব্যাগে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক এসে যেত—

এইবার আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। সে ভেবেছে যে আমি তাকে টাকা না দিয়ে বিদায় করে দেব। কারণ তাকে টাকা দেবার মতো কিছুই আমি করি নি। সারা রাত চেয়ারে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি !

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ছি ছি, এই জন্যে তুমি আমার ওপর এমন চেঁচামেচি করছ ?

চেঁচামেচি করব না তো কি সোহাগ করব ? আমার সময় নষ্ট করবার কোন অধিকার তোমার নেই।

সে কথা আমি খুব ভাল করে জানি। কিন্তু তুমিই বা কোন বুদ্ধিতে ধরে নিলে যে আমি তোমাকে টাকা দেব না ? পকেট থেকে হাজার ফ্রাঙ্কের পাঁচটা নোট বের করে আমি তার দিকে এগিয়ে দিলাম।

মিকি আমার হাত থেকে নোটগুলো ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে চিৎকার করে উঠল, আমি কি ভিখিরী নাকি, যে তুমি এমন করে আমাকে ভিক্ষে দিতে চাও ?

বিস্ময়ে স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আমি আস্তে আস্তে বললাম, ভিক্ষে দেব কেন ? তোমার ন্যায্য পাওনা তোমাকে দিচ্ছি—

বলি আমার পাওনা হয় কিসে ? তুমি কি একা চেয়ারে ঘুমিয়ে রাত কাটাও নি ?

তা হলেই বা। তুমি তো হোটেলে এসে আমার সঙ্গে রইলে,

একটা রাত নষ্ট করলে। তোমার সময়ের দাম আছে বৈকি, নোটগুলো কুড়িয়ে আবার তার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললাম, কাজেই এগুলো ধর—

না, ও টাকা আমি নিতে পারব না।

কিন্তু কেন নেবে না মিকি ?

একটু নরম সুরে মিকি বলল, আমি কাউকে ঠকাই না। ঠিক যতটুকু পাওনা ততটুকু নিই। কারোর কাছ থেকে এক পয়সা বেশি আদায় করবার চেষ্টা করি না।

আমি জানি। আমি তোমাকে বলছি, এটাকা তোমার পাওনা, তুমি নাও।

তুমি বললেই আমি শুনব না। তুমি আমাকে খাইয়েছ, অনেক বোতল মদ কিনেছ, ট্যাক্সি চড়িয়েছ, শোবার জন্যে নরম বিছানা দিয়েছ—আমার পাওনার চেয়ে অনেক বেশি আমি তোমার কাছ থেকে নিয়েছি। আর কিছু নিতে পারব না, দরজার দিকে পা বাড়িয়ে মিকি বলল, যাবার সময় তোমাকে শুধু একটি অনুরোধ করে যাই, এমন সাধু সেজে যদি থাকতে চাও তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনও কোন নাইট ক্লাবে যেও না। কেননা তোমরা এমন ব্যবহার করলে আমাদের .আর্থিক ক্ষতি হয়, সেকথা তো বুঝতেই পারলে—

আমাকে আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে দরজা খুলে খুব তাড়াতাড়ি মিকি অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি শুধু তার জুতোর খট খট শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর আস্তে দরজা বন্ধ করে জানালা দিয়ে রাস্তায় মুখ বাড়িয়ে দেখলাম সে সামনে সার্ভ লে কুর্ব মেট্রোয় নেমে গেল।

হয়তো মিকির সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা হত। হয়তো সেইদিনই আমি প্যারিস ছেড়ে লণ্ডনে চলে আসতাম। নাইট

ক্লাবের একজন সাধারণ মেয়েকে নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়। তাকে ভুলতে কতদিনই-বা সময় লাগে।

কিন্তু আশ্চর্য, আর একবার তার দেখা পাবার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমি জানি কিছুতেই আমার এ ব্যাকুলতা আসত না, যদি না মিকির শেষের দিকের কথাগুলি অমন করে আমার কানে বাজত।

না, তার প্রেমে আমি দিশা হারাই নি। কিন্তু বলতে এতটুকু লজ্জা নেই, মনে মনে তাকে আমি শ্রদ্ধা করেছিলাম। সে যেন আমায় নতুন রূপ দেখিয়ে গেল। নতুন কথা শুনিয়ে গেল। তার তেজে আমার ব্যক্তিত্ব যেন ম্লান হয়ে গেল। আর একবার তার দেখা আমাকে পেতেই হবে।

পর মুহূর্তেই আবার মনে হল কি দরকার। যেটুকু জেনেছি তাই তো অনেক। যেটুকু পেয়েছি তাই তো প্রচুর। যদি বেশি জানতে গিয়ে অকস্মাৎ প্রচণ্ড আঘাতে এই জানা চুরমার হয়ে যায়, যা পেয়েছি তা হারিয়ে যায়, তখন লজ্জা ঢাকবার জায়গা থাকবে না। তার চেয়ে মিকি যা দিয়ে গেছে তাই সম্বল করে চলে যাই। দেশে গিয়ে জনে জনে গল্প বলব।

প্যারিসের কথা আর কে না জানে। কে আর ফ্রান্সের খবর না রাখে। সকলেই জানে ইউরোপের বিলাস নগরীর অপরূপ জাঁকজমকের কথা। প্রসাধনের আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপের কথা। চির যুবতী চিরচঞ্চলা প্যারী। তার ধুলিতে রাত্রি দিন বাজে যৌবনের জয়গান। অন্তত আমি তো তাই শুনে প্যারিসে এসেছিলাম।

আর যারা পণ্ডিত, যারা ইতিহাস নাড়াচাড়া করে তারা শুধু এইটুকু জেনে সন্তুষ্ট থাকে না। তারা আরও অনেক বেশি খবর রাখে। তারা বড় বড় বই খুলে বিচার করে ফরাসী বিদ্রোহের ভালমন্দের কথা, নেপোলিয়নের পতনের মূল কারণ, তারা ফরাসী সাহিত্যে সোনার খনির সন্ধান পায়।

কিন্তু তারা তো মিকির কথা জানে না। আর আমি যদি না বলি তাহলে হয়তো জানতেও পারবে না। কিন্তু আমিই বা তার কথা লোককে জানাবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি কেন? এই পৃথিবীতে এমন কত কিছু আছে যার খবর কেউ রাখে না, রাখতে চায় না।

মিকির খবর আর পাঁচজনকে দিতে গিয়ে আমিই বা টাকা নষ্ট করব কেন? একজন মেয়ের জন্যে প্যারিসের নাইট ক্লাবে কেন মদের বোতল খুলব। লোকে শুনলে বলবে কি। এই বয়সে প্যারিসে এসে তরুণী মেয়ের রূপ যৌবন দেখে আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

দরকার নেই আমার মিকির সঙ্গে দেখা করে। আমি কাল সকালে সোজা লণ্ডন চলে যাব। যা পেয়েছি তাই ঢের। আর কিছু পেতে গিয়ে সব কিছু হারাব না।

সে সন্ধ্যেয় ইচ্ছেমতো প্যারিসের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আমি কিছুতেই কেডে মেট্রোর দিকে যাব না। আমি আজ মিকির ক্লাব খুঁজে বের করবার কোন চেষ্টা করব না। যখন ক্ষিধে পাবে তখন কোনো রেস্তোরাঁ থেকে খুশি মত খেয়ে সোজা হোটেল লুক্সায় ফিরে যাব।

মিকির সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না।

মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। নিজের ওপর কোন হাত থাকে না। নিজেকে অদৃশ্য শক্তির ক্রীড়নক বলে মনে হয়। সেই কথার অর্থ বেশ ভাল করে আমি উপলব্ধি করলাম যখন একসময় বুঝতে পারলাম আমি মিকির নাইট ক্লাবের প্রবেশ পথে এসে দাঁড়িয়েছি।

সারা সন্ধ্যে আমি প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। মেট্রোর একেবারে অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে নর নারীর ভিড় দেখেছি।

সাঁজেলীজের বারটি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ভরা চোখে আমি আর্চ হ্যু ট্রায়াম্পের দিকে অনেক ক্ষণ তাকিয়ে থেকেছি।

কিন্তু আমার হোটেল থেকে বেরোবার পর এক মুহূর্তের জন্যেও আমি ভুলতে পারি নি যে, এখন আমি যা করব সব কিছু হবে মিকিকে ভুলে থাকবার জন্যে। আর সেই চিন্তাই আমার সব গোলমাল করে দিল।

নিঃশব্দে কখন যন্ত্রচালিতের মতো আবার এসে মিকির নাইট ক্লাবের সামনে দাঁড়ালাম। তার সঙ্গ পাবার জন্য ব্যাকুল হলাম। যা থাকে কপালে, আমি মনে মনে স্থির করলাম, আজ আমি আবার মিকিকে আমার হোটেলে নিয়ে যাব। তার কালকের লোকসান আজ পূরণ করে দিতে হবে।

ঠিক তেমনি সমারোহে নাচ গান চলেছে। আমি সেই বেশেই আবার মিকিকে দেখলাম। আমার টেবিলে খোলা মদের বোতল দেখে অনেক নর্তকী আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করে গেল, বন্ধু চাই কি না।

আমি তাদের দিকে ভাল করে না তাকিয়ে মাথা নেড়ে জানালাম, চাই না।

হয় তো তারা মিকির চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী! হয় তো তাদের কথাবার্তা তার চেয়ে আরও মধুর। কিন্তু নাইট ক্লাব বলতেই আমি যেন মিকিকে বুঝি। শুধু নাইট ক্লাব কেন, প্যারিসের কথা উঠলে সব চেয়ে আগে মিকি এসে আমার চোখের সামনে দাঁড়ায়।

সেই রাত্রেই মিকির কাছ থেকে আমি প্রচণ্ড আঘাত খেলাম। আর তখুনি ভাবলাম এবার হয় তো আমার ঘোর কেটে যাবে, ছিন্ন হবে রঙীন জাল।

কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে দেখি আবার যে কে সেই। অর্থাৎ মিকির সঙ্গ পাবার জন্যে আমি ব্যাকুল। শুধু আর একবার আমি তাকে ঠিক তেমনি করে পেতে চাই। কেমন করে তাকে একা ধরতে

পারব সেই ভাবনা ভাবতে ভাবতে নিঃসঙ্গ আমি অনেক রাত্তিরে ট্যাক্সি করে আবার হোটেলে ফিরলাম।

তার প্রোগ্রাম হয়ে যাবার পর সে আবার তেমনি করে বেরিয়ে এল। আমার চোখে চোখ পড়ল তার। সঙ্গে সঙ্গে সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আমাকে যেন চিনতেও পারল না।

আজ সে এসে বসল একজন লম্বা চওড়া নিগ্রো ছেলের কাছে। আমি দূর থেকে দেখলাম সে ঠিক তেমনি করে মদ খেল।

আবার তাকে দিয়ে নতুন বোতল কেনাল। তারপর তার হাত ধরে আমারই পাশ দিয়ে ঠিক তেমনি করেই বেরিয়ে গেল।

তাকে চলে যেতে দেখে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল। মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। বার বার মনে হল, কেন, কি আশায় আমি আজ আবার এখানে এলাম।

এমন তো হবেই। এই ওদের পেশা। কারোর মুখ চেয়ে বসে থাকলে ওদের চলে না। এই করেই মিকিকে বেঁচে থাকতে হবে। তবুও সমস্ত বুঝে শুনে তাকে মাত্র আর একবার কাল রাত্রের মতো নিবিড় করে পাবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব হবে ? রোজই তো আমাকে সে আজকের মতো এড়িয়ে যাবে। লোকসানের ভয়ে আমার দিকে ফিরেও চাইবে না।

আমার টেবিলে মদের বোতল যেমনকার তেমন পড়ে রইল। মিকি চলে যাবার মিনিট কয়েক পর আমিও উঠে দাঁড়ালাম। একটা তুচ্ছ সামান্য ব্যাপার যে আমাকে এত ছেলেমানুষ করে তুলবে, এত যন্ত্রণা দেবে, সেকথা কল্পনা করা এতদিন আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

বাইরে বেরিয়ে অনেকক্ষণ রাস্তায় হেঁটে বেড়ালাম। নিজের কাছে নিজে যেন ভীষণভাবে হেরে গেছি। নিজেকে বড় দুর্বল মনে হচ্ছে, বড় অসহায়।

শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ট্যাক্সি নিলাম।

হঠাৎ খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়ল প্যারিসে। এত বেশি যে, রাস্তায় চলতে কষ্ট হয়। লণ্ডনের চেয়ে প্যারিসের ঘরগুলি অনেক ভাল—অনেক গরম। তাই মনে হল আজ হয় তো লোকে ঠাণ্ডার হাত এড়াবার জন্যে ইচ্ছে করে ঘরে বসে আছে। বাইরে লোক চলাচল বড় কম।

আমি অনেকক্ষণ ধরে কেডে মেট্রোয় দাঁড়িয়ে আছি। বুঝতে পেরেছি আমার এখন এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে আর হিতাহিত জ্ঞান নাই। কাজেই ভাগ্যের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি। যা হয় হোক। আমি শুধু আর একবার মিকিকে আমার হোটেল লুক্সায় সে রাত্রের মত নিয়ে যাব।

তাই সেই প্রচণ্ড শীত তুচ্ছ করে কেডেতে এসে দাঁড়িয়ে আছি! মিকির সঙ্গে আমার এখানেই প্রথম দেখা হয়েছিল। হয় তো প্রতি সন্ধ্যায় সে এই পথ দিয়েই ক্লাবে যায়। আমি আশা করলাম আবার এখানেই তার দেখা পাব। আর তখন নিশ্চয়ই তার সঙ্গে কেউ থাকবে না। এই পথ দিয়ে সেদিনকার মতো সে একাই ক্লাবের দিকে এগিয়ে যাবে। ঠিক সেই সময় আমি তার সঙ্গ নিয়ে আমার মনের কথা জানাব।

তারপর প্যারিসে আমার আর কিছু করবার থাকবে না। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে লণ্ডনের ট্রেন ধরব—সেখান থেকে যথাসময়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব।

কিন্তু মিকির দেখা নেই।

কনকনে হাওয়া শুধু বারবার আমার শরীর কাঁপিয়ে গেল। মাঝে মাঝে টিউব ট্রেন আসবার দমকা শব্দ আসছে, তারপর মৃদু পায়ের আওয়াজ। আশায় মুখ বাড়িয়ে আমি নিরাশ হই? মিকি নয়, অন্য কেউ। হয় কোন তরুণী ছবি দেখতে যাচ্ছে, কিংবা

কোন যুবক তার প্রিয়তমাকে দেখতে ছুটে যাচ্ছে, না হয় কোন বৃদ্ধ লাঠি ঠকঠক করতে করতে ওপরে উঠে আসছে।

প্রায় দু ঘণ্টা সেই শীতে কেডে মেট্রোয় দাঁড়িয়ে আমি অধীর আগ্রহে মিকির প্রতীক্ষা করলাম। কিন্তু না, আর আশা নেই। এবার ফিরে যেতে হবে। কে জানে যে আমি আসবার আগে সে চলে এসেছে কিনা। আর এ পথ দিয়ে হয় তো সে রোজ যায় না। নাইট ক্লাবে যাবার আরও কত পথ আছে। আমার এই ছেলেমানুষী থেকে মুক্ত হবার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। আর কোথাও নয়, আর নাইট ক্লাবে নয়, এখান থেকে চোখ কান বুজে হোটেলে ফিরে যাব।

একি, আজও তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ ?

মিকি! আমি উল্লাসে চিৎকার করে উঠলাম। তাকে দেখে আমার সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ লাগল। এই কণ্ঠস্বর শোনবার জন্যে আমি যে অধীর হয়ে প্রহর গুনেছি, এই চেহারা দেখবার জন্যে আমি যে তুচ্ছ করেছি কঠিন শীতের প্রহার।

যাক আমার প্রহর গোনা সফল হল। শেষ অবধি যাকে এতক্ষণ ধরে মনে মনে কামনা করছিলাম সে এসে দাঁড়াল আমার চোখের সামনে।

কিন্তু মিকির চেহারা দেখে আমি অবাক হলাম। তার চোখ বসে গেছে, চোখের কোণে কালি পড়েছে, ঠোঁট সাদা হয়ে আছে। আজ তার মুখে রঙের চিহ্নমাত্র নেই। তার চলায় সে গতিও নেই। ক্লান্ত শ্লথ অঙ্গভঙ্গি তার।

আমি আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার চেহারা এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন ? কি হয়েছে তোমার ?

আমার কিছু হয়নি। আমি ভালই আছি—

আমার স্বরে বোধ হয় সহজ আন্তরিকতার সুর ফুটে উঠল, তাহলে কি ব্যাপার ?

অনেক ব্যাপার, ক্লান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মিকি বলল, সব কথা শোনবার ধৈর্য তোমার থাকবে না।

খুব থাকবে। কি হয়েছে বল ?

সে ম্লান হাসল, কিন্তু আমার কথা শোনবার জন্যে তুমিই-বা এত কৌতূহল দেখাচ্ছ কেন? সে এক করুণ কাহিনী। তুমি প্যারিসে ফুর্তি করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। দুঃখের কাহিনী শুনে সময় নষ্ট করবে কেন ?

আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বললাম, আমি শুধু ফুর্তি করতে আসি নি তার প্রমাণ তুমি কি পাওনি মিকি ?

পেয়েছি, কি মনে করে মিকি বলল, তাই বোধ হয় তোমার সঙ্গে আজ এ অবস্থায় আমার দেখা হল।

চল সেই রেস্তোরাঁয় খেতে খেতে কথা শুনি।

না, আচ্ছা, কি ভেবে মিকি বলল, তুমি সেখানে গিয়ে বসো, আমি আমাদের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে আসি। আমার ফিরতে খুব বেশি দেরি হবে না।

কিন্তু তোমার তো প্রোগ্রাম আছে আবার—

না, আমি আজ থেকে দিন কয়েকের ছুটি নেব। তুমি যাও রেস্তোরাঁয়। আমি যাব আর আসব।

তারপর মিকির কাছ থেকে সেই সন্ধ্যায় যা শুনলাম!

অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু তবু আমি অবাক হলাম। আগেই বলেছি, আমি এখানে সবুজ অপরিণত মন নিয়ে শুধু রঙের নেশায় মেতে উঠতে চেয়েছিলাম। তাই ভুলেছিলাম আলোর পিছনে অন্ধকার আছে, আনন্দ কোলাহলের মাঝে ক্রন্দনের রেশ আছে, নৃত্যের তালে তালে ফাঁক আছে, ফাঁকি আছে।

মিকি এই নাইট ক্লাব থেকে প্রতি সপ্তাহে মাইনে পায়। এমন

ক্লাবের সংখ্যা প্যারিসে অনেক, তার বয়সী বহু মেয়ে তার মতো চাকরি করে।

কিন্তু সকলেই যে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বাইরে যায় তা নয়, অনেকে অভিনয়ের পর সোজা স্বামীর কাছে ফিরে যায়। ফিরে যাবার মতো তেমন কোন লোক অবশ্য এখন অবধি মিকির কেউ নেই। যারা একদিন ছিল তাদের কথা শিগগিরই সে শোনাবে। বাড়িতে এখন শুধু তার পঙ্গু বাবা আর ভাই-বোন। এই বাবাকে নিয়েই এখন তার মুশকিল হয়েছে।

কয়েক দিন ধরে তার বাবার শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। এখন ডাক্তার সন্দেহ করছে তার সেই সাংঘাতিক রোগ হয়েছে—অর্থাৎ ক্যানসার।

খবর শোনবার পর থেকে মিকির ঘুম ছুটে গেছে। এখন কি করবে সে? কার কাছে যাবে? তাদের বাড়িতে একমাত্র সে-ই উপার্জন করে। তারই টাকায় সংসার চলে। অবশ্য তার আরও তুএকজন আত্মীয় প্যারিসে আছে। কিন্তু তাদের কাছে একথা বলে কোন রকম সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ তারা নিজেদেরই সংসার কষ্টে স্বষ্টে চালায়।

আজ অনেক আশা করে মিকি গিয়েছিল তার নাইট ক্লাবের ম্যানেজারকে সমস্ত কথা জানিয়ে কয়েক সপ্তাহের মাইনে আগাম চাইতে। খুব অনিচ্ছাসত্ত্বে সে তাকে মাত্র এক সপ্তাহের মাইনে দিয়েছে।

আমার যে কি মনের অবস্থা তা আমি তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারব না, চোখে মুখে জ্বালা নিয়ে মিকি শেষ করল।

সে তার ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে এমন করুণ সুরে আমাকে সমস্ত কাহিনী শোনাল যে আমার সমস্ত মন তার তুঃখে ব্যাকুল হয়ে উঠল।

আমি বললাম, তোমার বিপদে আমি কি করতে পারি মিক?

ম্লান হেসে মিকি বললে, তুমি যে এমন সুরে বিনা স্বার্থে আমার সঙ্গে কথা বললে, সেইটুকুই যথেষ্ট। আমার এ ব্যাপারে কার কি করবার আছে বল?

কিন্তু তুমি কি করবে এখন?

জানি না। আশা ছিল ম্যানেজার আমাকে সাহায্য করবে, কিন্তু লোকটা যে এমন ব্যবহার করবে তা ভাবতে পারি নি, কি ভেবে মিকি বলল, আমার সেই আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করে যা হয় একটা বন্দোবস্ত করবার চেষ্টা করব। রুগীর অবস্থা এখন এমন যে বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয়, হাসপাতালে পাঠাতেই হবে। মিকি, তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাবে?

মিকি, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

এমনি, হঠাৎ কি বলব ঠিক করতে না পেরে আমি অনেক এলোমেলো কথা বলে ফেললাম, তোমার কথা শুনে আমার ছেলে-মানুষী কেটে যাচ্ছে, অনেক কাঁচা ধারণা বদলে যাচ্ছে। তাই আমি নিজের চোখে সব দেখতে চাই—তোমার বাড়ি, তোমার বাবাকে, তোমার ভাই বোনদের—

ম্লানমুখে মিকি জিজ্ঞেস করল, আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আমি উত্তর দেবার আগেই সে আবার বলল, কেনই বা হবে। লোককে শুধু আনন্দ দেয়া আমাদের ব্যবসা, দুঃখের কাহিনী তারা বিশ্বাস করবে কেন? না, তোমার কোনো দোষ নেই—

ছিঃ মিকি, আমি তোমাকে অবিশ্বাস করতে যাব কেন?

আমাকে বাধা দিয়ে মিকি বলল, আমার মনে হয়েছিল তুমি আমাকে অবিশ্বাস করবে না। তাই তো এসব আজেবাজে কথা তোমাকে বললাম। তা না হলে বলে আমার লাভ কি বল? এসব কথা বলা মানে আমার নিজের অসুবিধা সৃষ্টি করা। পাছে কাঁদুনি

গেয়ে বেশি সাহায্য চাই মনে করে লোকে আমাকে এড়িয়ে যায়। তাতে আমারই ক্ষতি। কিন্তু অল্প আলাপে তোমার নতুন পরিচয় পেয়েছি বলেই ত এত কথা বলে শুধু বুক হাল্কা করলাম, আমার চোখের উপর চোখ রেখে অনেকক্ষণ পর মিকি বলল, তোমার মত মানুষ আমি আর কখনও দেখিনি—

কবে আমি তোমার বাড়ি যাব মিকি ?

আমার বাড়িতে তুমি কেন যেতে চাও বুঝতে পারছি না, তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে আমার লজ্জা করবে।

কিসের লজ্জা ?

আমি বড় গরিব। তুমি আমাকে দেখছ ঐশ্বর্যের মাঝে, আনন্দের মাঝে তাই আমার দারিদ্র্যের চেহারা তোমাকে দেখাতে সঙ্কোচ হচ্ছে।

সে কি কথা মিকি ? তুমি বোধ হয় জান না কি মোহের বশে আমি তোমার বাড়ি যেতে চাইছি, একটু থেমে বললাম, আমি নিজেই জানি না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি আমার মন বেড়ে উঠেছে। খুব অল্প পরিচয়ে তুমি যেন আমাকে নতুন করে ভাবতে শেখালে।

কি সব বাজে কথা বলতে আরম্ভ করলে। আমি আবার একটা মানুষ যে আমাকে নিয়ে তোমার অত ভাবনা।

তোমার মতো মানুষের কথাই যেন আমি চিরকাল ভাবতে পারি—

আশ্চর্য হয়ে মিকি জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কেন ?

আমি কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে বললাম, সেকথা আজ নয়, অন্য আর একদিন বলব, বল কবে আমি তোমার বাড়ি যাব ?

তুমি কি যাবেই ?

হ্যাঁ যাবই।

বল কবে যাবে ?

আমি বললাম, কাল।

বেশ তাই হবে, অনেকক্ষণ পর মিকি সহজ হাসি হেসে বলল, আমার বাড়ি অনেক দূর। আমি শহরতলীতে থাকি। একা খুঁজে পেতে তোমার অসুবিধা যবে। যদি তুমি সত্যি যাও তাহলে আমি প্যারিসে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

সেই ভাল। কখন কোথায় তোমার দেখা পাব ?

সাঁ লেজার স্টেশনে, এই ধর বিকেল সাড়ে পাঁচটায়।

বেশ তাই ঠিক রইল।

সে রাত্রে আমি আরও ঘণ্টাখানেক মিকির সঙ্গে ছিলাম। তারপর তাকে সাঁ লেজার স্টেশন থেকে ট্রেনে তুলে দিয়ে নানা কথা ভাবতে ভাবতে একা হোটেলে ফিরে এলাম।

অনেকক্ষণ আমার ঘুম এল না। আমি নিজের কথাই ভাবছিলাম। এই প্যারিস সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকে শুধু আনন্দ কোলাহলের কথাই শুনে এসেছি। তাই মিকিকে অজস্র আলোকমালার মাঝে দেখে চমকে উঠেছিলাম। তাকে ভাল লেগেছিল। আমি আমার সমস্ত দৈন্যের কথা তার সংস্পর্শে এসে ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার মুখ থেকে সেই পুরোনো কথা শুনতে শুনতে আমার বিস্ময় জাগল। ঘোর কেটে গেল। তাকে বড় পরিচিত মনে হল। আর প্যারিসকে বাংলা দেশের খুব কাছে মনে হল।

কাল আমি নিশ্চয়ই মিকির বাড়ি যাব। আমি নিজের চোখে তার সংসার দেখে ভাববার চেষ্টা করব কেন প্রাণপাত পরিশ্রম করে পৃথিবীর নানা দেশের লোককে আনন্দ দিয়েও সে নিজে আনন্দে থাকতে পারছে না।

আজ মিকি আমার কাছে অনেক দুঃখ করেছে। অজ্ঞাতে তার মনের গোপন কথাটিও বলে ফেলেছে। সব কথা স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও মোটামুটি ভাবটা আমি বুঝতে পেরেছি।

বোঝা কষ্টকর নয়। কেননা আমাদের প্রত্যেকেরই সেই এক অবস্থা। অর্থাৎ কারা যেন ষড়যন্ত্র করে একটা বিশেষ ছক কেটে রেখেছে, সেখানেই আমাদের চোখে ঠুলি বেঁধে দিনের পর দিন ঘুরে মরতে হয়। হাজার মাথা খুঁড়লেও সেই ছক থেকে বেরোবার উপায় নেই।

মিকি নিজে স্বীকার করেছে সে এখন একেবারে যন্ত্র হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে নিজেকে মানুষ বলেও আর ভাবতে পারে না। চোক কান বুজে সে শুধু চাকরি করে যায়। কেননা সে জানে তার মাথার ওপর কঠিন দায়িত্ব। একচুল এদিক ওদিক হলে সংসার অন্ধকার হয়ে যাবে। বাবা তাকে অভিশাপ দেবে।

কিন্তু তবু এমন তো হবার কথা ছিল না। সেও তো স্বপ্ন দেখেছিল সুন্দর সার্থক জীবনের। এমন ভাঙাচোরা ছন্নছাড়া জীবন সে কোন দিনও চায়নি। অবশ্য এখন সেসব কথা ভাবলেও হাসি পায়। আজকাল এমনি কাঠিন্যের মাঝে তার থাকতে ভাল লাগে। শুধু এই ভেবে তার সুখ যে, সে একা দুঃখ ভোগ করছে না। তার মতো লক্ষ নরনারী এই প্যারিস শহরেই আছে। দলে তারা দিন দিন ভারী হচ্ছে। কেন কে জানে!

তাদের অবস্থা কোনদিনই ভাল ছিল না। যুদ্ধ আরও সর্বনাশ করে গেল।

যুদ্ধের সময় সেই সব দিন রাত্রির কথা ভাবলে আজও শিউরে ওঠে মিকি। কী সব দিন গেছে যে তখন! বাড়িতে কেউ নেই, শুধু সে, তার দুটো ছোট ছোট ভাই আর তিনটি বোন। বাবাকে জার্মান সৈনিকের গুলি খেয়ে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। বাঁচবার কোন আশা ছিল না তার। একেবারে অকর্মণ্য হয়ে বাবা ফিরে এল, আর কিছু করবার উপায় রইল না তার। যা সামান্য সাহায্য পাওয়া যায় তাতে আর অত বড় সংসারের কি-বা হয়।

মিকির তখন বয়স খুব বেশি নয়। সংসারের অবস্থা দেখে

বাধ্য হয়ে তাকে চাকরির চেষ্টা করতে হল। প্রথমে সে হয় এক শিল্পীর মডেল। ম'মার্টে থাকত সেই শিল্পী। তার অবস্থা খুব ভাল ছিল না। কাজেই সে মিকিকে যত প্রেম দিল তত পয়সা দিতে পারল না।

কিন্তু শুধু প্রেমে তো তার পেট ভরবে না। তাই ইচ্ছে না থাকলেও পেটের দায়ে সেই শিল্পীকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হল মিকি। কোন মানুষের ওপর এমনি দুর্বলতা নেমে এলে তার নিজেরই সর্বনাশ।

সেই শিল্পীর কথা মিকি আমাকে আর একদিন ভাল করে শোনাবে। আমার সঙ্গে নাকি তার অনেক মিল আছে।

এমনি করে তারপরে যখনই তার কাউকে ভাল লেগেছে সে তাকে জোর করে এড়িয়ে গেছে। তার পঙ্গু বাবাও তাকে নানা ভাবে আগলে রেখেছে। সংসার থেকে মিকি বেরিয়ে গেলে সেখানকার সব আলো ফুৎকারে নিভে যাবে। কোন প্রাণে সে বেরিয়ে যাবে, কোন সাহসে কি আশায় ভাল বাসবে।

আমি লক্ষ্য করেছিলাম কথা বললে বলতে মিকির চোখে-মুখে এক অদ্ভুত যন্ত্রণার ছায়া ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে মাত্র। তারপরই সে হাসিমুখে বলেছিল এখন অবশ্য নিজের কথা ভাববার তার আর অবসর হয় না। ইচ্ছেও করে না। আর প্রেম? তার কাছে এখন রূপ-যৌবনের অপব্যয়। সে ছেলেমানুষী তার অনেকদিন কেটে গেছে।

এখন তার বয়স বেড়েছে, বুদ্ধি বেড়েছে, অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। তাই প্রেমের কল্পনা তেমন করে সে আর করতে পারে না। কিন্তু থেকে থেকে শুধু এক ভাবনা তাকে বড় বেশি পীড়া দেয়। তা হ'লো তার অভাবের ভাবনা, তাদের দুর্দশার কথা। নিজের মনকে মিকি বহুদিন আগে মেরে ফেলেছে, লজ্জা ত্যাগ করেছে, মেয়েমানুষের যা সব চেয়ে বড় সম্পদ তাও বিসর্জন দিয়েছে, তবু

কেন তার অভাব মেটেনা ? কেন তার পরিবারের প্রত্যেকটি লোক সুখে থাকতে পারে না ? আর কি করতে পারে মিকি ? আর কতদূরে নামতে পারে ? এর পর মেয়েমানুষের নামবার যে আর স্থান নেই। সংসারের অভাবের তাড়নায় যখন সে দিশেহারা হয়ে যায়, যখন তার চোখের সামনে শুধু অন্ধকার নামে তখন মাথার মধ্যে এক রকম যন্ত্রণা হতে থাকে আর সে যে কী কষ্টকর তা কোন দিনও কাউকে সে বোঝাতে পারবে না।

ঠিক বিকেল সাড়ে পাঁচটায় স াঁ লেজার স্টেশন থেকে মিকি আমাকে নিয়ে ট্রেন ধরল। তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতে আমাদের প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল।

একটা বিরাট জীর্ণ অট্টালিকা। দেখলেই বোঝা যায় একদিন এর সর্বাঙ্গে বোমার প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল। সিঁড়ির কাছে ম্লান আলো জ্বলছে। একটা বড় বোর্ডে যারা এখানে বাস করে তাদের প্রত্যেকের নাম লেখা রয়েছে।

নিস্তব্ধ রাত্রি। যেন একটা পিন পড়লে শুনতে পাওয়া যাবে। চারপাশে তাকিয়ে বাংলাদেশের অজ পাড়াগাঁয়ের কথা মনে হয়। ডিসেম্বর মাস প্রায় শেষ হয়ে এল। পরশু বড়দিন। তাই শীতের কাঠিন্য প্যারিসের শহরতলীতে আরও প্রবল।

সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আমি ইতস্তত করলাম। কেমন যেন ভয় লাগল হঠাৎ। ভাবলাম কাজ নেই ভিতরে গিয়ে। এখান থেকে শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে ফিরে যাই।

এস, আমার দিকে তার একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে মিকি বলল, আমরা চার তলায় থাকি। বাড়ির চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছ এখানে লিফটের বালাই নেই, কাজেই এস দুজনে গল্প করতে করতে সিঁড়ি ভাঙি।

আমি মিকির বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরে বললাম, চল।

কয়েক মিনিট সিঁড়ি ভাঙবার পর আমরা চারতলায় মিকির ফ্ল্যাটে এলাম। মাত্র দুখানি ছোট ছোট ঘর। কিন্তু বেশ সুন্দর করে সাজান। দেয়ালে কয়েকটি ছবিও টাঙান রয়েছে দেখলাম।

এই জীর্ণ অট্টালিকার অংশ যে এত অল্প আসবাবে এমন করে সাজান যায় তা মিকির ঘর না দেখলে হয়তো আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না।

বড় আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘরের কোনায় একটি টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়ে মিকি বলল, বস। কয়েক মিনিটের জন্যে ক্ষমা করো, আমি তোমার কফি নিয়ে আসি।

ব্যস্ত হচ্ছ কেন, হবে এখন, আমি মৃদু আপত্তি করলাম।

কিন্তু আমার কথা শুনে মিকি আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে বলল, কফি খেতে খেতে কথা হবে, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে যে।

সে সেই ঘরে আমাকে একা বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল। হয়তো মিকির কোনো বন্ধুবান্ধব এ বাড়িতে আসে না। তাই আমি আসবার পরমুহূর্ত থেকে অন্দরে বোধহয় প্রচুর কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। কেননা আমি ভিতরে ঢোকবার আগে বাচ্চাদের গোলমাল শুনতে পেয়েছিলাম।

মিকি চাবি ঘুরিয়ে ঘর খুললেই সব চুপ হয়ে গেল। তারপর বুঝতে পারছিলাম ছোট ছেলেমেয়েদের অনেক কৌতূহলী চোখ আড়াল থেকে আমাকে ভাল করে দেখে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

আমার চোখে চোখ পড়তেই আমি হেসে ইশারায় তাদের ঘরে আসতে বললাম। আমার ভঙ্গি দেখে তারা নিমেষে উধাও হল। আরও শুনতে পাচ্ছিলাম থেকে থেকে কে যেন আপন মনে চিৎকার করে উঠছিল। নিশ্চয়ই মিকির বাবা। একে ভদ্রলোক পঙ্গু তার ওপর ধরেছে ক্যানসার রোগ আর কদিন বাঁচবে কে জানে।

ঘরের চারপাশে আমি আর একবার ভাল করে তাকিয়ে

দেখলাম। কোথাও ঐশ্বর্যের আড়ম্বর নেই, কোথাও দারিদ্র্যের উলঙ্গ প্রকাশ নেই, সর্বত্র রয়েছে সুরুচির পরিচয়। আমার বারবার মনে হল আমি যেন কোন ভদ্র গৃহস্থের বাড়িতে বসে আছি। ভাবতেও ভাল লাগল, এ বাড়ির মালিক মিকি। সেই মিকি—যে আমার চোখকে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিল।

সে ঘরে ঢুকতেই আমি বললাম, সুন্দর তোমার ঘর।

ধন্যবাদ, কফির সরঞ্জাম টেবিলের উপর রেখে মিকি বলল, সেই শিল্পী, মানে আমি যার মডেল ছিলাম, আমাকে ভাল করে ঘর সাজাতে শিখিয়েছিল।

বেচারী শিল্পী, আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলবার ভান করে বললাম, কিন্তু যে তোমাকে ঘর সাজাতে শেখাল তাকে তুমি তোমার সাজান ঘরে চিরকালের জন্যে ধরে রাখলে না কেন?

পারলাম কই, হঠাৎ যেন মিকি বড় বেশি গম্ভীর হয়ে উঠল, আমি তো তাই চেয়েছিলাম।

তার মনের কোথাও সেই হারানো শিল্পীর জন্যে আজও ব্যথা জমে আছে মনে করে আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করে বললাম, এ কি মিকি, কফির নাম করে তুমি এত কাণ্ড করেছ কেন? রাত্তিরে দেখছি আমার আর কিছু খাবার উপায় থাকবে না—

নাই-বা খেলে একদিন। মিকি দুটো বড় বড় রুটি আর নানা রকম ফরাসী খাবার আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, খাও, তোমার খুব ক্ষিধে পেয়ে গেছে নিশ্চয়ই?

না না, আমি হেসে বললাম, কিন্তু খাবার আগে তোমার বাবা আর ভাই বোনদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই যে?

মিকি আবার সেই এক কথা বলল, ওদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে তোমার এ ব্যস্ততা কেন সত্যি আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। কী অদ্ভুত মানুষ তুমি!

ওদের ডাক মিকি।

একটু ভেবে মিকি বলল, ভাইবোনদের ডাকব বৈকি, কিন্তু বাবা।

আমাকে তার কাছে নিয়ে চল। আমারই আগে বোঝা উচিত ছিল, অসুস্থ মানুষ এ ঘরে আসবে কেমন করে?

না না সেকথা নয়, আমি অন্য কথা ভাবছিলাম—

কি?

মানে, মিকি এক মিনিট চুপ করে থেকে বলল, তোমার সঙ্গে আলাপ করে তিনি খুশী হবেন না।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

সে কথা শুনে কি হবে? নাই-বা আলাপ করলে তার সঙ্গে। আর আমার বাবা কিংবা ভাইবোন কেউই কিন্তু এক বর্ণও ইংরেজী জানেনা।

সে আমি আমার যেটুকু ফরাসী বিদ্যা তাতে ঠিক চালিয়ে নেব, পাছে বেশি বাড়াবাড়ি রকম উৎসাহ দেখালে অভদ্রতা হয় মনে করে আমি বললাম, তোমার দিক থেকে কোন রকম অসুবিধা আছে নাকি মিকি?

হ্যাঁ বাবার বেলায় আছে, শান্ত সংযত স্বরে সে বলল, আমার কোন বন্ধুবান্ধব এ বাড়িতে আসে তা তিনি চান না।

কেন? লোকজন পছন্দ করেন না বুঝি?

না, তা ঠিক নয়, শুধু আমার ছেলে-বন্ধুদের আজকাল একেবারেই পছন্দ করেন না।

কেন?

কারণ তাঁর ভয় হয় পাছে আমি হাতছাড়া হয়ে যাই।

সে কি কথা? কিছু বুঝতে না পেরে আমার স্বরে শুধু বিস্ময় ফুটে উঠল।

তুমি কিছু বুঝতে পারছ না কেন? মিকি যেন আপন মনেই বলে গেল, এই বয়সে এই অবস্থায় আমাকে নিয়ে বাবার ভয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক—

কিন্তু কেন? তোমার টাকায় যখন সংসারের সব হচ্ছে তখন তোমার ছু একজন বন্ধুবান্ধব এলে তাঁর ভয় হবে কেন?

কারণ আমার টাকায় সংসার চলছে, কফির কাপে ছোট চুমুক দিয়ে মিকি বলল, আমার কোন বন্ধু বাড়িতে এলে বুঝে নিতে হবে তার সঙ্গে আমার প্রচুর ঘনিষ্ঠতা আছে। তাই আমার বাবা ভাববে হয় তো তাকে আমি বিয়েও করতে পারি। আমি যদি বিয়ে করে চলে যাই তাহলে সংসার অচল হবে। তাই বাবা আমার বন্ধু এলে ভয় পায়।

তার কথা শুনে এতক্ষণ পর আমি সব বুঝতে পারলাম। এত তলিয়ে আমি ভাবতে পারিনি।

হঠাৎ আমার কলকাতার ভিখিরিদের কথা মনে পড়ে গেল। শুনেছি অনেক সময় ভিক্ষার সুবিধা হবে বলে তাদের পঙ্গু করে রাস্তায় বের করা হয়। মনে হল মিকিকেও যেন ঠিক তেমন করে বাইরে বের করা হয়েছে। তার কোন অঙ্গহানি করা হয়নি বটে, কিন্তু সংসারের বিরাট পাথর চাপিয়ে তার মনকে হত্যা করা হয়েছে। হাজার ইচ্ছা থাকলেও সে আর কোন দিকে চাইতে পারবে না, কারোর দিকে চোখ তুলে প্রিয়তমার মত তাকাতে পারবে না, কারোর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরিবারের এ গুরুভার নামিয়ে সে কখনও কোথাও ছুটে যেতে পারবে না। আর যখন তার বাবা থাকবে না, ভাইবোনেরা বড় হবে, মানুষ হবে তখন মিকির বয়স থাকবে না, কারোর ডাকে সাড়া দেবার মত উৎসাহ থাকবে না।

স্তিমিত স্বরে আমি বললাম, তোমার ভাইবোনদের ডাক।

মিকি উঠল না। চেয়ারে বসেই চিৎকার করে তার ভাই-বোনের নাম ধরে ডাকল। আর সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে ঘরে এল ফুলের মতো ছুটি ছোট ছোট ছেলে আর তিনটি মেয়ে। মিকির গা ঘেঁষে আমার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তারা একেবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তাদের চেহারা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ছেলে দুটির বয়স এগারো-বারোর বেশি হবে না। শান্ত নম্র চেহারা। মেয়ে তিনটি তাদের চেয়ে ছোট। কী মিষ্টি, কী সুন্দর। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। তাদের সাজ দেখে আমি ধরে নিলাম আমি আসব বলে তারা অনেকক্ষণ থেকে প্রস্তুত হয়ে আছে। হয়তো আজ তাদের সব চেয়ে ভাল পোশাক বের করে পরেছে। কিন্তু যতই সাজুক না কেন, আমি যেন তাদের শরীরের চারপাশে দারিদ্র্যের ছায়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

মিকির কোল ঘেঁষে যে ছোট মেয়েটি আমার চোখের আড়ালে থাকবার প্রবল চেষ্টা করছিল, আমি তাকেই প্রশ্ন করলাম, তোমার নাম কি ?

কিন্তু আমার কথার উত্তর দেবে কি, সে যেন দ্বিগুণ লজ্জা পেয়ে মিকির কোলের মধ্যে একেবারে মিশে যেতে চাইল।

মিকি তাকে টেনে তুলে বলল, এই নাম বল।

মেয়েটি কোন রকমে শুধু বলল, জেনিন।

বাঃ সুন্দর নাম, আমি একে একে সকলকে সেই একই প্রশ্ন করলাম। তার বেশি আর কিছু জিজ্ঞেস করবার উপায় নেই কারণ ফরাসী ভাষায় আমার বিদ্যের দৌড় খুব বেশি দূর নয়, সেকথা আগেই বলেছি।

আমি তাদের দিকে খাবারের প্লেট এগিয়ে দিয়ে আলাপ জমাতে চাইলাম। কিন্তু এবার মিকি বাধা দিয়ে জানাল ওদের রাত্তিরের খাওয়া হয়ে গেছে। এখন আর কিছু খেতে না দেওয়াই ভাল।

একটু পরে স্নেহময়ী মায়ের মতো সে তাদের আদর করে বলল, সময় হয়ে গেছে, নাও এবার শুয়ে পড়।

আমাকে ফরাসী ভাষায় শুভরাত্রি জানিয়ে একে একে ওরা চলে গেল। আমি কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে মিকির দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

শীতকাল তাই সময় খুব বেশি না হলেও মনে হয় অনেক রাত। পাশের ঘরে বাচ্চারা কোলাহল করছে, থেকে থেকে ভেসে আসছে বৃদ্ধ ক্যানসার রোগীর আর্ত চিৎকার। কোথাও আর কোন শব্দ নেই। প্যারিসের শহরতলীর এক জীর্ণ বাড়ির মধ্যে বসে আমি যেন মানুষের অন্য এক নতুন রূপ দেখতে পেলাম।

মিকি প্রশ্ন করল, কি ভাবছ? মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব অবাক হয়ে গেছ যেন?

না, আমি আস্তে বললাম, অবাক হইনি। কিন্তু তোমার সংসার দেখে কি জানি কেন অকারণে সব মানুষের জন্যে আমার বেদনাবোধ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে।

মিকি হেসে বলল, কৃপা? কিন্তু কারোর দয়া ভিক্ষা করতে আমি ভালবাসিনা যে, আর তাইতো চাকরি করি।

চাকরি! উদাস স্বরে আমি বললাম, তা করতে গিয়ে তো নিজের সব কিছু হারাতে বসেছ।

বাধা দিয়ে মিকি বলল, সে তো সকলেই হারায়। তুমি কি আরও ভালভাবে বেঁচে থাকতে চাও না? তুমি কি যা ইচ্ছে তাই করতে পার? বাধ্য হয়ে আমাদের সকলকে শুধু চাকরি বাঁচিয়ে চলতে হয় আর তার জন্যে হারাতে হয় অনেক কিছু।

উত্তেজিত হয়ে আমি বললাম, কিন্তু এমন ভাবে বেশি দিন চলতে পারে না, তাহলে মনুষ্যত্ব বলে পৃথিবীতে আর কিছু থাকবে না। এই ক্ষয়, এই অপচয় বন্ধ করতেই হবে।

সে ভাবনা তোমার। আমি তো লেখাপড়া জানি না, অত কথা ভাবব কেমন করে বল।

সে রাতে হোটেলে ফিরে অনেকক্ষণ আমার ঘুম এল না। আমার অনুভূতি যেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। আমি নিজের কথা এর আগে এমন করে আর কখনও ভাবি নি।

মিকির মতো আমারও বুকে তো এক জগদ্দল পাথর চাপান

রয়েছে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক চাকরি আমাকে করতেই হবে। আমি আমার নিজের সুখ সুবিধার কথা ভাবতে পারব না, মনের দিকে তাকাতে পারব না, চোখে ঠুলি বেঁধে সমাজের চাকায় শুধু দিনের পর দিন ঘুরে যাব। ভাল লাগুক বা না লাগুক, মতে মিলুক বা না মিলুক চাকরি আমাকে করে যেতেই হবে।

এমন তো কতবার হয়েছে যখন চাকরির খাতিরে আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে হয়েছে। এমন তো কতবার হয়েছে যখন চূড়ান্ত অপমান বোধ করেও পারিশ্রমিকের কথা মনে করে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাইনি। কঠিন শৃঙ্খলে আমার হাত পা বাঁধা। তা ছিন্ন করে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে নিশ্বাস নেবার কথা আমি আর কল্পনা করতে পারি না। তিল তিল করে দিনে দিনে আমাকে আমার মন বিকিয়ে দিতে হয়েছে আমার ওপরওয়ালাদের কাছে।

অথচ শূন্য দম্ভের মোহে আমাদের দৃষ্টি এত আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, এ সব কথা সহসা আমাদের মনে আসে না। বাইরের পাঁচ-জনের কাছে আমি তো সুখে আছি। তারা হয়তো আমাকে ঈর্ষা করে। মাসে হাজার টাকার কাছাকাছি আমার আয়। আপিসের খরচে আমি ইউরোপের দেশে বেড়াতে এসেছি—ফিরে গিয়ে আমার পদমর্যাদা আরও বেড়ে যাবে। এসব কথা মনে করে আমিও তো বুঝতে পারি না কোথায় আমার শূন্যতা—কোথায় আমার ব্যর্থতা।

আমি যদি প্যারিসে না আসতাম, আমি যদি এমন করে মিকির সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করতে না পারতাম—যদি দূর থেকে আড়ম্বর আর অজস্র আলোকমালার মাঝে তাকে দেখে ফিরে যেতাম তাহলে কোন দিনই আমার শূন্যতা আমার কাছে এমন প্রকট হয়ে ফুটে উঠত না।

প্রতিদিনের সংসারে আর্থিক দৈন্য এমনি প্রবল ভাবে আমাদের বিচলিত করে যে, এই অভাবের হিংস্র ভ্রূকুটি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমরা ব্যাপক সংবেদনশীল মনের কথা ভেবে দেখবার অবসর

পাই না। তবু মনে প্রশ্ন জাগে, শূন্যতার ধূ ধূ মরুভূমিতে আমাদের আর কতদিন বিচরণ করতে হবে?

দেশে থাকতে চাকরির কথা ভেবে আমার বহুবার মনে হয়েছে যারা আপিসে আমার মাথার ওপরে বসে আমাকে নানা আদেশ করে আর আমি নিঃশব্দে যাদের কথা পালন করি, তাদের অনেকে সব দিক থেকে হয়তো আমার চেয়ে অনেক ছোট—অনেক নিচু। তবু মুখ বুজে আমাকে তাদের সম্ভ্রম করবার ভান করতে হয়, বেদবাক্য মনে করে তাদের আদেশ শিরোধার্য করতে হয়। না করলে কি ঘটবে, আশা করি সেকথা সবিস্তারে বলবার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বলি, এমনি আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা যে, আমি প্রতিবাদ জানালে আমার উন্নতির পথ বন্ধ হবে, হয়তো চাকরিও চলে যেতে পারে। আর তাহলে আমার নিজের ছাড়া আর কারোর এতটুকু ক্ষতি হবে না। যাদের চোখ খোলবার জন্যে আমি আমার সর্বনাশ ডেকে আনব তাদের সামান্য পরিবর্তন হবে না। আমার মতো লক্ষ লোক তাদের সমর্থন করে আমার ছেড়ে-আসা চাকরি পাবার জন্যে বিনীত আবেদন জানাবে।

তাহলে মিকিকে ছোট মনে করে দূরে সরিয়ে রাখবার আমার কি অধিকার? আমি নিজে তো তার চেয়ে অনেক ছোট। সংসার চালাবার জন্যে সে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে তার দেহ, আমি বিক্রি করেছি আমার মন। সাধারণের কাছ থেকে সে পেয়েছে ঘৃণা আর অপযশ, আমি পেয়েছি অর্থ আর শ্রেষ্ঠ সামাজিক মর্যাদা।

কিন্তু যেদিন নতুন সমাজ সৃষ্টি হবে, বিশ্লেষণের স্বচ্ছ আলোয় আমাদের বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাবে সেদিন কারো বুঝতে বাকি থাকবে না, কে বেশি পেল আর কে বেশি হারালো। দেহ আর মন—আর্থিক দৈন্যের জন্যে, সামাজিক অব্যবস্থার জন্যে যারা দুই বিক্রি করতে বাধ্য হলো তাদের মধ্যে কার অপরাধ বেশি, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ অদূর ভবিষ্যতে মানুষকে একদিন করতে হবেই।

সেদিন এত দম্ভ থাকবে না, এমন বুকজোড়া শূন্যতা থাকবে না, এত ঘৃণা আর অলীক আত্মপ্রসাদের এমন স্থূল প্রকাশ থাকবে না। সেদিনের প্রতীক্ষা করা ছাড়া এই অযোজন মূঢ়তার হাত থেকে আমাদের মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই।

সে-রাতে একা বিছানায় স্থির হয়ে এমনি নানা কথা আমার মাথায় আসতে লাগল। চোখ বন্ধ করে থাকলেও আমি বুঝতে পারলাম সহজে আজ আমার ঘুম আসবে না।

মেট্রো অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় পথিকের কলরব আর শোনা যায় না। হোটেল লুক্সা একেবারে নীরব। শুধু কঠিন শীতের উন্মত্ত বাতাস জানালার সার্সিতে মাথা ঠুকে ফিরছে বার বার। আর সেই হাওয়ার হাহাকার যেন আমার সমস্ত চৈতন্যকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে।

নিস্তব্ধ রাত্রে সুদূর প্যারিসের সেই শয্যায় আমার নতুন উপলব্ধি আর গভীর বেদনাবোধ আমাকে উত্তেজনায় নিদ্রাহীন করে রাখল সারারাত। টুকরো হয়ে গেল ব্যবধানের প্রাচীর।

এই পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আমি যেন এতদিন পর এক আশ্চর্য মিল খুঁজে পেলাম। মূঢ়তার মিল—দাসত্বের মিল!

অ্যাভিনিউ ক্লেবারে ভারত সরকারের প্রতিনিধির আপিস। লণ্ডনে থাকতে শুনেছিলাম যারা প্যারিসে বেড়াতে যায় তাদের অনেককে নাকি ইণ্ডিয়ান এম্বেসিতে আসতেই হয়। না এলে ফেরবার উপায় থাকে না তাদের।

একথা শুনে হেসেছিলাম একদিন। প্যারিস এমনি জায়গা যে, আনন্দ উপভোগ করে নিঃস্ব হয়ে যেতে দেরি লাগে না মানুষের। তাই যে অর্থ নিয়ে লোকে এখানে আসে খরচের পরিমাণ হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। আর অবশেষে অবস্থা এমন হয় যে, লণ্ডনে ফিরে যাবার পাথেয় অবশিষ্ট থাকে না। তখন সেই নিঃস্ব পথিক অ্যাভিনিউ ক্লেবারে ভারত সরকারের প্যারিস দপ্তরে

আসতে বাধ্য হয়। লণ্ডনে ফিরে শোধ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেখান থেকে টাকা ধার করে সেই সব নিঃস্ব পথিক প্যারিসের মায়া কাটায়।

হেসেছিলাম কারণ সেই সব দুর্বলচিত্ত মানুষের ওপর আমার করুণা জেগেছিল। হাজার প্রলোভন থাক, তবু কি এমন আকর্ষণ প্যারিসে আছে যার জন্যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে আসা অভিজ্ঞ উচ্চশিক্ষিত কোনো লোক সব ভুলে নিঃস্ব হয়ে ভারত সরকারের আপিসে এসে হাত পাতবে!

তাই ইতস্তত করছিলাম। অ্যাভিনিউ ক্লেবারে সেই অট্টালিকার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম এখন ওপরে গিয়ে আমি নিজে কি কথা বলে ঋণ গ্রহণ করব। তীব্র সঙ্কোচে আমার সমস্ত শরীর মন যেন কেঁপে উঠছিল।

আমার মনে হচ্ছিল ওরা তো আমাকে দেখলেই ধরে নেবে আমিও তাদেরই একজন যারা এখানে আনন্দ উপভোগে মুহূর্তে নিঃস্ব হয়ে যায়। কিন্তু কেমন করে আমি তাদের বোঝাব এর আগে আর যারা তোমাদের কাছে এসেছিল, আমি তাদের মতো নই, আমি প্যারিসে এসে যে জ্ঞান লাভ করেছি সেকথা তোমাদের বলবার ভাষা আমার নেই।

তবু ওপরে এসে বলতে হল অর্থাভাবের কথা। আরও জানালাম, অন্তত আর এক সপ্তাহ আমি এখানে থাকতে চাই।

সেই অফিসারের নাম আজ আর মনে নেই। দিল্লীর লোক। চেহারা দেখে মনে হল বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বোধ হয় ভাবছিলেন আমাকে কি উপদেশ দেবেন।

যা ভেবেছিলাম তাই। সহকারীকে একটা ফাইল আনতে বলে তিনি আমাকে বললেন, কদিন আছেন এখানে?

আমি উত্তর দিলাম, প্রায় দু সপ্তাহ।

আর এক সপ্তাহ কেন থাকতে চাচ্ছেন ?

সহসা উত্তর দিতে পারলাম না। তাঁর কথার উত্তরে কি বলব তা তো জানি না। সত্যি কথা বললে আমার সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা হবে তা তো ভাল করে জানি।

আমাকে নীরব থাকতে দেখে তিনি হেসে আবার বললেন, জায়গাটা বড় খারাপ, কি বলেন ?

না, মিথ্যা কথা বলতে আমার বাধল না, আমি ফরাসী ভাষা শিখছি কি না, তাই এখানে আর কিছুদিন থাকা দরকার—

বাধা দিয়ে ভারত সরকারের কর্মচারী রসিকতা করে উত্তর দিলেন, ভাল সঙ্গিনীর কাছে শিখছেন নিশ্চয়ই ? ফরাসী ভাষা শেখাবার এমন মানুষ আর কোথাও পাবেন না, তিনি জোরে হেসে উঠলেন।

আমি বললাম, আমি ঠিক বিশেষ কারোর কাছে ভাষা শিখছি না, দোকানে বাজারে ঘুরে ঘুরে ঝালিয়ে নিচ্ছি মাত্র, কথাটা বলেই শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আমার কথা বিশ্বাস না করে তিনি যদি আমার সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করেন তাহলেই সর্বনাশ হবে।

কিন্তু হাসিমুখে তিনি ইংরেজীতে বললেন, আপনি শিক্ষিত ভদ্রলোক। আপনাকে বলবার আমার কিছু নেই। আমরা শুধু ছাত্রদের সতর্ক করে দিই। টাকা আপনাকে নিশ্চয়ই আমি দেব। শুধু এইটুকু বলে রাখি, জায়গাটা ভাল নয়, এখানে অনেক প্রলোভন। খুব সাবধানে চলাফেরা করবেন। কারণ এই ব্যাপারে আবার যদি আপনাকে আমাদের কাছে আসতে হয়—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি টাকা ধার করবার জন্যে আর কখনও আপনার কাছে আসব না—

কুড়ি হাজার ফ্রাঙ্ক ধার করে প্যারিসের ইণ্ডিয়ান এম্বেসির আপিস থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আমি অ্যাভিনিউ ক্লেবার পার হয়ে এলাম।

ভারত সরকারের প্রতিনিধির আপিসের সেই কর্মচারী আমাকে কোনো অন্যায় কথা বলেন নি। আমি যদি তাঁর জায়গায় বসতাম তাহলে আমিও অন্যকে ঠিক তেমনি উপদেশ দিতাম।

হয়তো আজ উপলব্ধির নতুন আলোয় প্যারিসে বসে মানুষকে গভীর সমবেদনায় বিচার করা আমার পক্ষে এই মুহূর্তে খুবই সহজ। কিন্তু আমি যখন দেশে ফিরে যাব, সেখানকার সংকীর্ণ পরিবেশে অন্য আর একজন সম্পর্কে এমনি গল্প শুনব, তখন তার উপলব্ধির মূল্য বুঝে তাকে বিশ্বাস করা নিঃসন্দেহে আমার পক্ষে কঠিন হবে।

মধ্যবিত্ত পরিবেশে গড়ে-ওঠা মন এত দিন মানুষের ওপর শুধু অবিচার করে এসেছে। কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ত্রুটির কথা জানতে পারলে আমরা মুখরোচক আলোচনায় সেই ত্রুটিকে এত বড় করে তুলি যে, তার অন্যান্য গুণ আমাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়। বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ জোর করে আমাদের পরিধি সংকীর্ণ করে রেখেছে, সংস্কার মুক্ত হবার পথে নিরন্তর বাধা সৃষ্টি করে চলেছে।

তাই প্রতি পদে আমাদের ভয়ে ভয়ে চলতে হয়। জীবনের পরম সত্যকে স্বীকার করবার সাহস থাকে না। যিনি স্বীকার করে অন্তরের তাগিদে সংস্কারের বেড়া ভেঙেছেন আমরা তাঁকে ব্যঙ্গ করেছি, তাঁর চরিত্র নিয়ে এখানে ওখানে নানা কথা বলেছি।

তাই আজ ভারত সরকারের প্রতিনিধির আপিসের কর্মচারী যদি আমাকে উপদেশ দেন তাহলে আমার কিছু বলবার নেই। প্যারিসের নাইট ক্লাবের মেয়ের সঙ্গে এখানে ওখানে ঘুরে আমি যে জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছি সেকথা শুনলে আমার দেশের লোক তো আমাকে ব্যঙ্গ করবেই।

আমি যদি লেখক হতাম আর মিকিকে নায়িকা করে প্যারিসের পটভূমিকায় এক দীর্ঘ উপন্যাস রচনা করতে পারতাম আর সে-লেখা যদি সার্থক হত তাহলেও আমি জানি আমার শিল্পীমনের চেয়ে, আমার জীবনের সবচেয়ে গভীর উপলব্ধির চেয়ে, সেই সব মধ্যবিত্ত

মনের সংস্কার-কণ্টকিত পাঠক পাঠিকার কাছে নাইট ক্লাবের মেয়ের সঙ্গে মিশে আমি যে প্যারিসে চরিত্র নষ্ট করেছি—এই কথাটাই বড় হয়ে উঠত।

হয়তো সেই কারণেই গভীর উপলব্ধির প্রতিফলন আমাদের দেশের সাহিত্যে খুব কম দেখা যায়। সত্য স্বীকার করবার সাহস কজন লেখকের থাকে? জীবনের গভীরে প্রবেশ করবার জন্যে সব কিছু বিসর্জন দেবার তেজ কজনের হয়? যাদের থাকে তাদের দাম স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেও ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাদের খুঁতখুঁতানি তো চিরকালের।

হয়তো আমাদের দেশে তাই মেয়ে লেখিকার একান্ত অভাব। নিজের অভিজ্ঞতা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করলে কিংবা জীবনের সত্য অবলীলাক্রমে ব্যক্ত করবার সাহস দেখালে, বিদুষী বলে তাকে স্বীকার করে নিলেও, শ্রদ্ধা করবার মতো মনের প্রসার আমাদের কিছুতেই হবে না।

ভয়ে ভয়ে পাঁচ কথা ভেবে সংস্কারে ভর করে কলম ধরলে হয়তো দেশ বিদেশের এক ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু জীবন-ভরানো উপলব্ধি অনুভূতির শেষ পর্যায়ে পৌঁছায় না।

মিকি বলেছিল আজ সন্ধ্যায় আবার আসবে। বাবার অসুখের জন্যে ও কয়েক দিনের ছুটি নিয়েছে। কিন্তু যা-ই ঘটুক না কেন, সন্ধ্যেবেলা বাড়ি বসে থাকতে হলে ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। তাই ছুটি নিলেও শহরে না এসে ও পারবে না। এখন শহরে আসা মানে আমার সঙ্গে দেখা করা।

এ প্রেরণার পেছনে কি আছে আমি বুঝতে পারলাম। তবু আমি জানি এক ধরনের যন্ত্রণা ছাড়া অবশেষে এই দেখা সাক্ষাতের পেছনে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। বরং আমার চেয়ে মিকির অনেক বেশি ক্ষতি হবে। আমার সঙ্গে দেখা না করে অন্য কোথাও

গেলে ওর আর্থিক লাভ হত। তাই ঠিক করলাম যখন আমার কিছু করবার নেই তখন অবিলম্বে প্যারিস ছেড়ে যাওয়া দরকার। না চাইতে অকস্মাৎ যা পেয়েছি আর বেশি দিন থাকলে সে পাওয়া জুড়িয়ে যাবে। দুজনের মন অসতর্ক মুহূর্তে কিসের ইঙ্গিত করবে জানি না।

সেদিন মিকির সঙ্গে দেখা হতেই বললাম, এবার আমাকে প্যারিস ছাড়তে হবে মিকি। পাথেয় ফুরিয়ে গিয়েছিল, ভারত সরকারের আপিস থেকে আজ ধার করেছি—

মিকি যেন জোর করে গলা থেকে স্বর বের করল, কবে যেতে চাও তুমি?

তার মুখ দেখে মনের অবস্থা বুঝে নিতে আমার দেরি হল না। কিন্তু সব দিক না ভেবে দেখলে আর চলবে না, নিজেকেও শাসন করতে হবে। তা না হলে ভারত সরকারের আপিসে আবার যেতে হবে টাকা ধার করতে। সেদিনের কথা কল্পনা করে সঙ্কোচ বোধ করলাম।

মিকিকে বললাম, আর দুতিন দিনের মধ্যে লণ্ডন ফিরে যাব ভাবছি।

দু—তিন দিন, শান্তির নিশ্বাস ফেলে মিকি হেসে বলল, সে তো অনেক দেরি। তুমি এমন করে বললে যে আমি ভাবলাম বোধ হয় এখনি ট্রেন ধরতে যাবে।

তা করলেই তো ভাল হত মিকি, আমার মনে হয় আমি এখানে থেকে কেবল তোমার ক্ষতি করে চলেছি।

আমার কথার অর্থ ধরতে না পেরে মিকি বলল, কি বলছ বুঝতে পারছি না। কি ক্ষতি তুমি আমার করলে?

আর্থিক ক্ষতি, আমি ইতস্তত করলাম, আমার সঙ্গে দেখা না করে অন্য কোথাও গেলে তোমার আরও বেশি লাভ হত—

জানি, মিকির ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কাঁপল, নিজেকে দেখে আমি

নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। এমন করে নিজের ক্ষতি সত্যি তো আমি কখনও করি না।

আজ মিকির দিকে তাকিয়ে তাকে যেন কেমন অন্য রকম মনে হল। ইচ্ছে হল তাকে এ সম্পর্কে আরও কয়েকটা কথা বলি। কিন্তু পরেই ভাবলাম এ ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে কারোর কোন লাভ হবে না। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে দিলাম।

মিকি বলল, এ সব কথা আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু তোমাকে পেয়ে আমার সংসারী হতে ইচ্ছে করছে। দেখছ না কেমন গৃহস্থ বধূর মতো পোশাক পরেছি? অনেক দিন আত্মীয়দের খবর নিতে পারি নি—ইচ্ছে করেই নিই নি বলতে পার। আজ বাড়ি থেকে বেরোবার সময় ঠিক করলাম তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরব।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কোন আত্মীয় আছে নাকি? বা রে, কেন থাকবে না? তবে বুঝতেই তো পার অর্থের চিন্তা ছাড়া এত দিন আমার অন্য কোন চিন্তা ছিল না বলে তাদের সঙ্গে দেখা করবার সময় পাই নি।

আমি হেসে বললাম, এখন আর তোমার অর্থের ভাবনা নেই নাকি? কথা শুনে মনে হচ্ছে রাতারাতি তুমি যেন বড় লোক হয়ে গেছ?

হয়েছি তো, আমার গা ঘেঁষে পথ চলতে চলতে মিকি বলল, দার্শনিক হয়ে সে কথা বুঝি বুঝতে পার না?

খুব পারি। তুমি বড় লোক হয়ে গেলে আর আমাকে নিঃস্ব হয়ে টাকা ধার করতে হল—

খুব জোরে হেসে মিকি গেয়ে উঠল, প্যারি তু নে পা সাঁজে—

আমি চলে গেলে বুঝবে আমার সঙ্গে ঘুরে নিজের কি ক্ষতি তুমি করেছ!

ছোট মেয়ের মতো গলার স্বর করে মিকি বলল, অত বোকা মেয়ে আমি নই। পাকাপাকি ব্যবস্থা এর মধ্যে করে রেখেছি।

আগামী সপ্তাহে আমি চলে যাচ্ছি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কোথায়?

ইটালী, সুইটজারল্যাণ্ড, আরও কত জায়গায়—

সত্যি? কই আমাকে আগে বল নি তো?

আগে আমি নিজেই জানতাম না। আজ তোমার সঙ্গে দেখা করবার আগে আমি আমার ক্লাবের ম্যানেজারের কাছে টাকা আনতে গিয়েছিলাম।

লোকটা আমার সঙ্গে আজ খুব ভাল ব্যবহার করল। আমি যেতেই বাবার খবর নিল। তারপর এক কথায় যা টাকা চাইলাম দিয়ে দিল। আর জানতে চাইল মাস খানেকের জন্যে আমি প্যারিসের বাইরে বেড়াতে যেতে পারি কিনা।

আমি কারণ জানতে চাইলে সে বলল, এক অ্যামেরিকান ভদ্রলোকের আমাকে স্টেজে দেখে খুব পছন্দ হয়েছে, তার এখন অনেক দিন ছুটি তাই আমাকে নিয়ে দেশ বিদেশ বেড়াতে চায়—

তুমি যাবে?

নিশ্চয়ই। না গিয়ে কি করি বল। এই তো আমার চাকরি। বিদেশে গিয়ে বেশি টাকা রোজগারের সুযোগ হারাব কেন, আমার গা টিপে মিকি বলল, আমি ঠিক ধরতে পারছি না, আমার ক্লাবের ম্যানেজার সবসুদ্ধ কত লাভ করল?

তার মানে?

গর্বের হাসি হেসে মিকি বলল, সাধারণত এমন বন্দোবস্ত বিদেশীরা ম্যানেজারের সঙ্গে করে। আমার ওপর ম্যানেজারের রীতিমত রাগ আছে। অন্য কাউকে পাঠালে যদি চলত তাহলে সে কখনও আমাকে পাঠাত না—

কেন? তোমার ওপর তার রাগের কারণ কি?

কারণ আমি তো আর অন্যদের মতো বোকা নই যে, যা বোঝাবে তাই বুঝব। টাকা পয়সা নিয়ে ওর সঙ্গে আমি বড় গোলমাল করি। অন্যদের বোকা বুঝিয়ে লোকটা যা লাভ করে আমার বেলায় তা পারে না। এই অ্যামেরিকান ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বিশেষ ভাবে আমার কথা ওকে বলেছে—

আমি হেসে বললাম, তোমার অমন ঝগড়াটে স্বভাব বলে বোধ-হয় ও তোমাকে দরকারের সময় ছুটি দিতে চায় না।

রসিকতা বুঝতে না পেরে ঝাঁঝাল স্বরে মিকি বলল, আর যারা ঝগড়া করে না, জান তাদের সঙ্গে লোকটা কেমন ব্যবহার করে?

আমি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, কেমন ব্যবহার?

তাদের ঠিক মতো মাইনে দেয় না, কারোর সঙ্গে বাইরে পাঠালে নিজে মোটা টাকা আগাম নিয়ে নেয়। ওদের যা পাওনা তার অর্ধেকও দিতে চায় না। কিছু বলতে গেলে বলে, বাইরে যাবার জন্যে ছুটি দিচ্ছি তার জন্যে আমার লোকসান হবে না? আরামে বেড়িয়ে আসতে পারছ বলে তোমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও!

এমন লোকের কাছে ওরা কাজ করে কেন?

না করে কি করবে? সব জায়গায় এক রকম ব্যবহার। চাকরি ছাড়া যেমন সোজা, পাওয়া তেমনি কঠিন। অজস্র রূপসী মেয়ে প্যারিসে চাকরির জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তাহলে তুমি ম্যানেজারকে চটাও কেন? যে কোন মুহূর্তে তোমার চাকরি চলে যেতে পারে তো?

আমি কিছু গ্রাহ্য করি না, মিকির মুখ কঠিন হয়ে উঠল, অনেক দেখেছি আমি। চাকরি যায় যাক। অন্য চাকরি না পাই যেমন করে হোক চালিয়ে নেব। কিন্তু নিজে যেমন কাউকে ঠকাই না, তেমনি কারোর কাছে ঠকতেও চাই না। আমার পাওনা আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে আদায় করে নেবই—

তোমার মনের জোর আছে মিকি, তোমাকে সহজে কেউ কোনো অসুবিধায় ফেলতে পারবে না।

কিন্তু অসুবিধার মধ্যেই তো আছি, মিকির চোখে জ্বালা ফুটে উঠল, এত চেষ্টা করেও সুবিধা আমার হলো না। আমাকে টাকা রোজগারের জন্যে বাইরে যেতেই হবে, অথচ বাবাকে কার কাছে রেখে যাব ভেবে পাচ্ছি না—

কার কাছে রেখে যাবে।

এখনও কিছু ঠিক করতে পারি নি। এক পিসি আমার আছে এখানে, আজ তোমাকে নিয়ে তার কাছে যাব ভাবছি; দেখি তিনি কি বলেন।

আর কোন আত্মীয় আছে তোমার এখানে?

মিকি হেসে বলল, আছে আর এক মাসতুতো ভাই। সে তোমার মতো দার্শনিক—

আমি দার্শনিক নই মিকি।

তুমি না বললে তো হবে না। যারা তোমার মতো কথাবার্তা বলে আমার মতে তারা হল দার্শনিক।

আমি হেসে বললাম, আচ্ছা না হয় আমি দার্শনিক হলাম। কিন্তু এবার ঠিক কর কোথায় যাবে—নাকি এমনি হেঁটে হেঁটেই কাটাবে সারারাত?

না না, লজ্জা পেয়ে মিকি বলল, হাঁটতে তোমার কষ্ট হচ্ছে বুঝি? চল মেট্রো নিই। পিসির কাছে নিয়ে যাব আজ তোমাকে। তোমার হোটেল লুক্সার কাছেই থাকেন তিনি।

সার্ভ লে কুর্ব্ মেট্রোর কাছাকাছি একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে, তার নাম রু ব্লোমে। এ রাস্তার ওপর আর এক জীর্ণ অট্টালিকার সামনে আমাকে নিয়ে এসে মিকি দাঁড়াল। অন্ধকার হয়ে গেছে।

অল্প অল্প বরফ পড়ছে। রাস্তায় কোন লোক নেই। আসতে আসতে মিকি আমাকে তার পিসির সম্বন্ধে দুচার কথা বলে রেখেছে।

পিসি দেখতে খারাপ নন। বয়সের কালে সুন্দরী বলে তার নাম ছিল। কিন্তু বিয়ে তিনি করেন নি। ছেলেদের কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করেন না। তাই অনেক বার নানা সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনো ছেলের সঙ্গে ঘর বাঁধবার কল্পনা করেন নি। তার আরও একটা কারণ ছিল। মিকির ঠাকুর্দার অবস্থা খুব ভাল ছিল না। দুধের ব্যবসা ছিল তাঁর। তবু তিনি যা সম্পত্তি করেছিলেন মৃত্যুর সময় পিসিকে তা দিয়ে যান।

ছেলেবেলা থেকে না পেয়ে পেয়ে পিসির মনের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, সেই টাকা পেয়ে তাঁর ধারণা হলো দেশসুদ্ধ লোক বুঝি কৌশলে তাঁকে শুধু বঞ্চিত করতে চায়। ফলে যিনি তাঁর সঙ্গে যে কোন কারণে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করতেন, পিসি সব সব সময় ভাবতেন, টাকার জন্যেই তাঁদের এই প্রচেষ্টা। অবশ্য পিসির এমন মনোভাবের জন্যে তাঁকে হয়তো খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। আর্থিক অনটনের মধ্যে মানুষ হয়ে তিনি কেবলই তাঁর অল্প পুঁজি আগলে রাখতে চাইতেন এবং এই কার্পণ্যের জন্যে সারা জীবন তাঁকে একা কাটাতে হল। বাইরের দৈন্য তাঁর অন্তরেও গিয়ে পৌঁছিল।

মিকি আমাকে আরও বলেছে, তাঁকে পিসি ভালবাসেন, কারণ যা করে হোক না কেন, সে নিজে রোজগার করে, কখনও কারোর কাছে হাত পাতে না। পিসির সব সময় ভয় পাছে তাঁর আত্মীয়রা এসে তাঁর কাছে টাকা ধার চায়! দোতালায় পিসির ফ্ল্যাট। সিঁড়ির আলো তখনও জ্বালা হয় নি। মিকি আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগল।

শুনেছি তার পিসি কিছুদিন ইংলণ্ডে বাস করে এসেছেন। অর্থাৎ আমার সঙ্গে তিনি ইংরেজীতে কথা বলতে পারবেন। কিন্তু মিকির এই ছেলেমানুষীর অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। আমার হাত ধরে পিসির সামনে দাঁড় করিয়ে কি আনন্দ পাবে সে!

ভাবলাম রাস্তায় বেরিয়ে তাকে সে কথা জিজ্ঞেস করব।

দরজা খুলে পিসি প্রথমে মিকিকে দেখে চমকে উঠলেন। তারপর উল্লাসে চিৎকার করে বললেন, এ কি! তুই কোথা থেকে? তুই কি এখনও প্যারিসে আছিস?

হ্যাঁ পিসি, আমার হাত ধরে মিকি বলল, আমার ইণ্ডিয়ান বন্ধু। এর সঙ্গে আলাপ কর। খুব পণ্ডিত লোক।

পিসি আমার দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার সঙ্গে মিকির কোথায় আলাপ হল? তোমার চেহারা দেখে তো মনে হয় না যে, তুমি নাইট ক্লাবে যাবার লোক?

আমি কিছু বলবার আগে মিকি বলল, কোথায় আলাপ হল সে কথা তোমাকে আর একদিন বলব, একটু থেমে ও আবার বলল, আজ তোমার কাছে বিশেষ দরকারে এসেছি—

আগে ভেতরে এসে বস, পিসি ঘরের বড় আলো জ্বেলে দিয়ে বললেন, আমি কালই তোর কথা ভাবছিলাম।

হয়তো তাই আমি আজ এসে পড়লাম, মিকি বলল, বেশিক্ষণ বসব না, এই ভদ্রলোক শিগগিরই ফিরে যাবে তাই ওকে প্যারিস শহর ভাল করে দেখিয়ে বেড়াচ্ছি।

বেশ বেশ, আপাদমস্তক আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে পিসি বললেন, কেমন লাগছে প্যারিস?

খুব ভাল, আমার এবার কিছু একটা জিজ্ঞেস করা উচিত মনে করে বললাম, আপনার শরীর খুব খারাপ দেখছি, মনে হয় বাইরে কোথাও ঘুরে এলে ভাল হবে।

পিসি বললেন, কে বলল আমার শরীর খারাপ ? আমি খুব ভাল আছি।

মিকি সুযোগ বুঝে তার বাবার অসুখের কথা জানিয়ে পিসিকে কিছুদিন তাদের বাড়িতে থাকবার কথা বলল। আমি লক্ষ্য করলাম কথা শুনতে শুনতে পিসির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। বোধহয় দায়িত্ব নেবার কথায় তার মন সায় দিল না।

ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। এখানে ওখানে খুব পুরোনো টেবিল চেয়ার। একটা বইএর আলমারিতে অনেক ফরাসী বই রয়েছে। কোথা থেকে ভ্যাপসা গন্ধ ভেসে আসছে। পিসির আর ঘরের বয়সের যেন একটা আশ্চর্য মিল আছে।

ওরা দুজনে এবার ফরাসী ভাষায় কথা আরম্ভ করল। আমি তার খুব সামান্য বুঝতে পারছিলাম। লক্ষ্য করছিলাম মিকির মুখে হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

হঠাৎ এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে মিকি আমাকে বলল, চল। আমার কাজ শেষ হয়েছে।

পিসি বললেন, বস তোমার বন্ধুকে একটু কফি খাইয়ে দিই।

আমি ভেবেছিলাম মিকি প্রতিবাদ করবে। কিন্তু কোন কথা না বলে সে আবার বসে পড়ল।

পিসি পাশের ঘরে বোধ হয় কফি তৈরী করতে গেলেন। মিকি যেন বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছে। হয় তো ভেবে ঠিক করতে পারছে না তার শয্যাশায়ী বাবা ছোট ছোট ভাই বোনদের দেখবার জন্যে কাকে রেখে নিজের উপরি উপার্জনের জন্যে বাইরে যাবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ এত ক্লান্ত হয়ে পড়লে কেন মিকি ?

কি জানি, এমন ক্লান্ত আমি শিগগির হয়েছি বলে মনে পড়ে না। দিন কয়েক ধরে শুধু বিশ্রাম করতে ইচ্ছে করছে।

যথাসময়ে পিসি ফিরে এলেন। হাতে তাঁর কফির সরঞ্জাম।

কফির কাপ টেবিলের উপর রেখে পিসি আমার সঙ্গে নানা গল্প করতে লাগলেন। অবশ্য নিজের কথাই তিনি বেশি বললেন। তাঁকে সব কাজ নিজে করতে হয়। বাজার করা থেকে আরম্ভ করে কাপড় কাচা অবধি। ছেলেবেলা থেকে কেউ তাঁর দিকে দেখেনি, তাই আজ কারুর জন্যে কিছু করতে হলে তিনি প্রাণের সাড়া পান না।

আমার মনে হয় মিকির কথায় রাজী না হওয়ার কৈফিয়ৎ হিসাবে তিনি এত কথা আমাকে বললেন। দেশ থেকে প্রথম লণ্ডনে এসে এই ধরনের অনেক বুড়ী দেখে আর তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমি অবাক হয়ে যেতাম। বলা অবান্তর, দেশের স্নেহশীলা মহিলাদের কথা আমার মনে পড়ত। যারা নিজের কথা না ভেবে পরের জন্যে একের পর এক অনেক কিছু উৎসর্গ করে।

বিলেতে এসে প্রথম দেখি কোন বিধবা কিংবা অনেক বয়স অবধি বিয়ে হয়নি এমন মহিলা সর্বক্ষণ শুধু নিজের কথা ভাবে। খাবার সময় তাদের চোখে ক্ষুধা ফুটে ওঠে—নিজের যেন স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু তারা চিন্তা করে না।

মিকির পিসি ঠিক সেই রকম এক স্বার্থপর মহিলা হলেও তাঁকে দেখে আজ কিন্তু আমার অন্য কথা মনে হল। আমি আজ তাঁর ব্যবহারে অবাক হলাম না, তাঁকে স্বার্থপর মনে করতে পারলাম না।

মিকির মুখ থেকে সংক্ষেপে তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে মনে হল এমনি স্বার্থপর হয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে মোটেই বিচিত্র নয়। ছেলেবেলা থেকে তিনি অভাবের মধ্যে মানুষ হয়েছেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর এমন কেউ ছিল না, যার ওপর তিনি নির্ভর করতে পারেন। আত্মীয় আত্মীয়াদের মধ্যে যারা তার কাছে এসেছে তারা হয়তো শুধু অর্থ সাহায্য চেয়েছে কিংবা নির্ভর করবার কথা বলেছে। আজ তিনি বাধ্য হয়ে একথা স্পষ্ট বুঝেছেন যে, জীবনের শেষ দিন

অবধি নিজেকে নিজে না দেখলে আর কেউ দেখবে না—নিজের ভাবনা না ভাবলে আর কেউ ভাববে না। প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশের জন্যে আজ তিনি সাধারণের চোখে এমনি স্বার্থপর হয়ে উঠেছেন।

আমাদের দেশেও এমন অনেক মহিলা আছে, যারা না পেয়ে পেয়ে অনেক কষ্টের মধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের স্বভাব মিকির পিসির মতোই। আজ তাদের কথা আমার মনে পড়ল। কিন্তু একদিন যাদের নিন্দে করেছি, আজ মনে মনে তাদের প্রশংসা করলাম।

আজ কাউকেই আমার খারাপ লাগছে না। সাধারণের চোখে যে মন্দ, সেও আমার চোখে ভাল হয়ে উঠেছে। বস্তুত বোধ হয় কোন মানুষই খারাপ নয়, সামাজিক পরিবেশ কাউকে ভালো আর কাউকে মন্দ করে পাঁচজনের কাছে তুলে ধরে।

বাইরে বেরিয়ে মিকি বলল, পিসিকে কেমন দেখলে ?

ভাল। এখানকার কিছু আমার খারাপ লাগছে না মিকি।

কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগছে, আমার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে মিকি বলল, কেন যে শুধু শুধু পিসির কাছে এসে সময় নষ্ট করলাম—এভাবে আমি কখনও কোথাও যাই না—

ভালই হল। তোমার পিসিকে আমি দেখে গেলাম।

যেন আপন মনে মিকি বলল, তাইতো এসেছিলাম।

কি যে ছেলেমানুষীতে পেয়েছে আমাকে! তোমাকে শুধু আমার চেনা শোনা সব ঘরে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

তাই চল মিকি।

মিকি হেসে বলল, আজ নয়, কাল। আমার মাসতুত ভাই ড্যানিয়েলের কাছে তোমাকে নিয়ে যাব। ওকে আগে টেলিফোনে জানিয়ে দেব, তা না হলে তার দেখা পাওয়া মুশকিল।

কিন্তু আজ কি করবে ? তুমি কি এখুনি বাড়ি ফিরে যাবে ?

না না, আজ তোমাকে ম'মার্টে নিয়ে যাই। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে ক্ষিধে পেলে কোন হোটেলে খেয়ে নেব। তারপর ইচ্ছে হলে কোথাও নাচ দেখব কিংবা গান শুনব।

তুমি কতক্ষণ থাকবে আজ ?

হেসে মিকি বলল, বল তো সারা রাত ?

আমি উত্তর দিলাম না। শুধু হাসলাম।

তারপর মেট্রোয় নেমে ট্রেন ধরে ম'মার্টের দিকে রওনা হলাম।

চারপাশে তীব্র আলো। সর্বত্র আনন্দ কোলাহল। আর ভেসে আসে দ্রুত সঙ্গীত ঝঙ্কার। মিকির সঙ্গে প্যারিসের প্রাণকেন্দ্র ম'মার্টে দাঁড়িয়ে আমি সব কিছু বিস্মৃত হলাম।

দেশে থাকতে এই ম'মার্ট সম্বন্ধে নানা কথা শুনেছিলাম। এখানে শুধু নাচ গান হয় তা নয়, কত লেখক, কত শিল্পী, কত সমালোচক এখানকার অলিতে গলিতে বাসা বেঁধে আছে। এক দিকে জ্ঞানী গুণী—অন্য দিকে রূপের পসারিণীর দল আসর সাজিয়ে বসেছে।

সেই সন্ধ্যায় আমার চোখে পড়ল কোলাহল মুখরিত পথের ধারে নিজের আঁকা অজস্র ছবি সাজিয়ে করুণ মুখে বসে আছে কোন শিল্পী। আর একটু দূরে মদের দোকান, সেখানে ভিড় করেছে অনেক ছেলেমেয়ে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী তরুণীর দল।

তার কাছাকাছি কোন প্রেক্ষাগৃহ থেকে ঐকতান ভেসে আসছে।

আমার হাত ধরে মিকি বলল, ওখানে যাবে ? ক্যান ক্যান নাচ হচ্ছে।

কোন প্রেক্ষাগৃহে মুখ বুজে বসে থাকবার আমার ইচ্ছে ছিল না। আর কদিনই-বা এখানে। তাই শুধু তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এমনি বেপরোয়া ভাবে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করছিল আমার। তবু জিজ্ঞেস করলাম, ক্যান ক্যান নাচ কি ?

মিকি আমার হাতে জোরে চাপ দিয়ে হেসে বলল, তোমার খুব ভাল লাগবে দেখতে। প্যারিসে খুব প্রসিদ্ধ এই নাচ। সুন্দরী না হলে ক্যান ক্যানে যোগ দিতে পারে না—

আমি বললাম, শুধু সুন্দরীদের নাচ? আর কিছু নয়?

না, মিকি আবার হাসল, তবে ক্যান ক্যান দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। অনেক সুন্দরী মেয়ে বাজনার তালে তালে এই নাচ নাচে—অভ্যাস না থাকলে এ নাচ নাচা যায় না। ম'মার্টে ক্যান ক্যান সব চেয়ে ভাল হয়—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, শিগগিরই চলে যাব, তাই আজ আর কোথাও গিয়ে চুপ করে বসে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না। তোমার সঙ্গে শুধু গল্প করতে ইচ্ছে করছে—

তবে তাই কর, মৃদু স্বরে মিকি যেন আপন মনে বলে উঠল, তোমার মতো আশ্চর্য মানুষ আমি আর কখনও দেখি নি।

মিকির কথা কানে গেলেও আমি কোনো উত্তর দিলাম না। যে শিল্পী ফুটপাথে অজস্র ছবি সাজিয়ে করুণ মুখে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে সিগার টানছিল, আমি মিকির হাত ধরে তার পাশে এসে দাঁড়ালাম।

দেখ মিকি, কী সুন্দর ছবি!

আমার কথার উত্তর না দিয়ে মিকি বলল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। চল অন্য দিকে যাই।

আমি তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, ছবি দেখতে তোমার ভাল লাগে না বুঝি? তা হলে ক্যান ক্যান দেখতে যাই।

না না, আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না, হঠাৎ থেমে পড়ে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও বলল, আজ শুধু তোমার জন্যে আমি ম'মার্টে এলাম। এদিকে আমি কখনও আসি না—

কেন মিকি? এমন চমৎকার জায়গা—

এদিকে এলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়।

কেন?

অনেকক্ষণ মিকি কথা বলতে পারল না। মন্থর গতিতে আমরা চলতে লাগলাম। ম'মার্টের অজস্র আলোর উজ্জ্বল রেখা পড়েছে আমাদের দুজনের শরীরে। সেই আলোয় লক্ষ্য করলাম মিকির মুখ হঠাৎ যেন করুণ হয়ে উঠল।

আমি ফরাসী ভাষায় খুব আস্তে মিকির কানে কানে বললাম, কথা বল মিকি—

আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে মিকি বলল, আমার কি হল বল তো হঠাৎ? তোমার সঙ্গে মিশে এমন ভাবপ্রবণ হয়ে উঠলাম কেন? কোন কারণ নেই, অথচ শুধু শুধু মন দুঃখে ভরে যাচ্ছে। আমাকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে ও নিজেই উক্তি করল, ফরাসীদের স্বভাব এমনি।

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, তুমিও দেখছি দার্শনিক হয়ে উঠলে!

দূর। আমি মূর্খ মেয়ে, কি বুঝি আমি, যে দার্শনিক হয়ে উঠব। থেকে থেকে শীতের কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। একটু দূরে সিঁড়ি দিয়ে বেশ অনেকটা পথ ওপরে উঠে পাহাড়ের মতো নির্জন জায়গায় এসে এক বেঞ্চে আমরা বসে পড়লাম। আশে পাশে আর কেউ কোথাও নেই। এমন শীতের রাত্রে খোলা জায়গায় এমনি করে বসে থাকবার কথা হয়তো কল্পনা করতে পারে না কেউ। অনেকক্ষণ মিকি কোন কথা বলল না।

হঠাৎ এক সময় ওপরে তাকিয়ে দেখি আকাশের এক প্রান্তে যেন আগুন ধরে গেছে। এত রাতে আর কখনও কোথাও আমি তেমন লাল আকাশ দেখি নি। সেই আগুন-ধরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

মিকি আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ!

মিকি বলল, ম'মার্টের অমন লাল আকাশ আগেও আমি অনেক বার দেখেছি।

আশ্চর্য, আমি কিন্তু জীবনে এ দৃশ্য এই প্রথম দেখলাম!

কিন্তু তুমি নতুন লোক। এখানে এ ভাবে আর বেশিক্ষণ বসে থেক না—অসুখ করে যেতে পারে—

করুক, হেসে আমি বললাম, আমি মরতে ভয় করি না। আর যদি প্যারিসে মরি সে তো আমার সৌভাগ্য!

আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মিকি জিজ্ঞেস করল, ঠিক করে বল তুমি কে?

তার গলার স্বর শুনে আমিও বেশ অবাক হয়ে বললাম, তুমি হঠাৎ এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন মিকি? এই দেখ তোমার শরীর কাঁপছে—

নিজেকে সামলে নিয়ে আমার কাঁধে মাথা রেখে মিকি বলল, এইজন্যে ম'মার্টে আমি আসতে চাই না। এখানে এলে বার বার আমার সব কিছু গোলমাল হয়ে যায়—

একথা মিকি একটু আগে আমাকে আর একবার বলেছিল। তাই বাধা দিয়ে আমি এবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু ম'মার্ট তুমি এড়িয়ে যেতে চাও কেন?

সেকথা বলবার জন্যেই তো আজ তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম, আমার কাঁধ থেকে মাথা তুলে মিকি সেই লাল আকাশের দিকে তাকাল, কখনও কাউকে যে কথা বলি নি, আজ কেন সেকথা তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে! আমার মনের মধ্যে যে দুঃখ জমে আছে, তোমার সঙ্গে আলাপ করবার আগে আমি তো সেকথা জানতাম না—

আমি শুধু আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, বল কি তোমার দুঃখ?

আমার কথা শুনে কয়েক মিনিট সে চুপ করে রইল। কোন কথা বলতে পারল না। আমি বুঝতে পারলাম, আমার কাছ

থেকে আশাতিরিক্ত সমবেদনা পেয়ে তার মন অপরিমেয় দুঃখে ভরে উঠেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ছাড়া এতদিন সে নিজের সংসারের কথা মনে করে অন্য কোন কথা ভাববার সময় পায় নি।

কিন্তু আমাকে দেখে সে আবার নতুন করে বুঝতে পেরেছে হয়তো এই পৃথিবীতে এখনও এমন অনেক মানুষ আছে যারা স্থূল লাভ লোকসানের হিসেব মাঝে মাঝে ভুলিয়ে দিতে পারে। তা না হলে এতদিন পর তার মতো মেয়ের চোখে আবার নতুন করে জল জমে উঠবে কেন!

রাতের আকাশ হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার জোর বেড়ে গেছে হঠাৎ। তবু আমার একটুও শীত লাগছে না। দূরে কোথায় এক সুরে নাচের বাজনা বেজে চলেছে আর থেকে থেকে ভেসে আসছে নর নারীর উল্লাসের রেশ!

কথা বল মিকি?

একদিন তোমাকে বলেছিলাম, আমার কথা শুনে, যেন লক্ষ্মী মেয়ের মতো সে কথা বলতে আরম্ভ করল, এক শিল্পীকে আমি ভাল বেসেছিলাম। সেকথা মনে আছে তোমার?

আছে।

আজ তার কথা তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে, শুনবে?

নিশ্চয়ই শুনব! বল মিকি?

কয়েক মিনিট তার মুখ থেকে কোন কথা বার হল না। আমাকে শক্ত করে ধরে সে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। আমি বুঝতে পারলাম, তার সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। আজ, মিকি বলতে আরম্ভ করল, রাস্তার ধারে এক শিল্পীকে দেখে তুমি দাঁড়িয়ে-ছিলে আর আমি সেখান থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে ছটফট করছিলাম, সেকথা বোধহয় তুমি বুঝতে পার নি?

ওই শিল্পী কি তোমার বন্ধু?

না, কিন্তু সেও অমনি ছবি এঁকে পথের ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা

দাঁড়িয়ে থেকে পয়সা পাবার আশায় সিগার টানত। আর আমিও তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতাম—

তারপর?

আমি জানতাম আমাকে সুখে রাখবার জন্যে তার চিন্তার শেষ ছিল না। আমি বুঝেছিলাম আমাকে বাদ দিয়ে তার চলবে না। আর সত্যি, আমাকে বাদ দিয়ে তার চলত না—সে আমার ওপর এত বেশি নির্ভর করত যে, একদিন আমার সঙ্গে দেখা না হলে কোন কাজে মন দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হত না। সব বুঝতে পেরেছিলাম আমি। কিন্তু সেদিন তার সঙ্গে অমন ব্যবহার করবার অর্থ আমি খুঁজে পাইনি—শূন্য দৃষ্টিতে লাল আকাশের দিকে তাকিয়ে মিকি চুপ করে বসে রইল। আর কথা বলতে পারল না।

আমি বললাম, যদি তোমার কষ্ট হয় তাহলে আজ থাক মিকি, এ প্রসঙ্গ বাদ দাও, আর বলবার দরকার নেই—

না না, সজোরে আমার কথার প্রতিবাদ করে মিকি বলে উঠল, আমাকে বলতে দাও। আমার বুকে যে গ্লানি জমে আছে তার কিছু লাঘব হোক। এমন করে কে শুনবে আমার কথা! তোমার মতো মানুষের দেখা আর তো পাব না আমি!

আমি যদি বড় লোক হতাম, মিকি আবার বলতে আরম্ভ করল, তাহলে তার সঙ্গে হয় তো আমি অমন ব্যবহার করতে পারতাম না—

কেমন ব্যবহার?

ভয়ে আমি তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।

কিসের ভয়? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সে তোমাকে গভীর ভাবে ভালবাসত?

হ্যাঁ, আর আমারও মনে হতো আমি যেন তার জন্যে সব করতে পারি। তারপর যথাসময় দেখলাম, না তার জন্যে অনিশ্চিত জীবনকে বরণ করে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, একটু চুপ করে

থেকে সে বলল, তুমি দার্শনিক, আমি জানি আমাকে তুমি অবিচার করবে না। তাই হয়তো তোমার সঙ্গে এমন করে আমি কথা বলতে পারছি।

অনেকবার আমি নিজে ঠকেছি, কিন্তু যে আমাকে সব চেয়ে বেশি ভালবাসল, আমি শুধু তাকেই ঠকিয়েছি—নির্মম আঘাত দিয়ে বিদায় করে দিয়েছি। ভেবেছিলাম জীবনের সে-অধ্যায় চুকে গেছে, ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু কে জানত, সেকথা ভেবে আমার সমস্ত মন জ্বলে পুড়ে যাবে। সে তো কোন অন্যায় করেনি—কোন অপরাধ করেনি—শুধু আমাকে ভালবেসেছিল। তাহলে কেন আমি তাকে অমন মর্মান্তিক আঘাত দিলাম? কেন প্রেমের চেয়ে আমার লোভ বড় হয়ে উঠল?

তার কথা বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিসের লোভ মিকি?

বলছি। আজ সব বলব তোমায়। কিছুই বাকি রাখব না। তার ভাবনা থেকে থেকে আমার সব গোলমাল করে দেয়, আমাকে ক্ষত বিক্ষত করে। তাই এই ম'মার্টের দিকে আমি কখনও আসি না—

সেই শিল্পী এখানে থাকত বুঝি?

হ্যাঁ, এই ম'মার্টের অলিগলি আমার চেনা। যৌবনের আরম্ভে আমি এদিকে রোজ আসতাম। প্রথমে আমি এসেছিলাম তার মডেল হয়ে। তোমাকে বলেছি আমাদের সংসারের অবস্থা ভাল ছিল না, তাই খুব ছেলেবেলা থেকেই আমাকে টাকা রোজগারের কথা ভাবতে হয়। পাওনা টাকা সে আমাকে প্রথম থেকেই নিয়মিত দিতে পারে নি। তারও টাকা ছিল না। তাই আমি প্রায়ই ভাবতাম, ফিরে যাই, অন্য কোথাও গিয়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করি। এভাবে সময় নষ্ট করে আমার লাভ নেই। কিন্তু যাই যাই করে শেষ অবধি কিছুতেই অন্য কোথাও যেতে পারলাম না—

তারপর—

আমি জানি তুমি বুঝতে পারবে কিসের জোরে সে আমাকে বেঁধে ফেলেছিল। তার অসহায় ছন্নছাড়া ভাব অসীম সমবেদনায় আমার মন ভরে তুলেছিল। আমি যেন মূর্ত যৌবনকে পেয়েছিলাম। তাকে চোখের সামনে দেখলে আমি সব কিছু ভুলে যেতাম।

তখন আমার প্রথম যৌবন। প্রেমের চেয়ে বড় আমার কাছে আর কিছুই ছিল না। তাই তার দারিদ্র্য আমাকে মুহূর্তের জন্যে বিচলিত করতে পারে নি। আমাদের দুজনের প্রথম যৌবনের প্রেম দারিদ্র্যকেও জয় করে নিয়েছিল। হঠাৎ থেমে আস্তে আমার গালে হাত বুলিয়ে মিকি জিজ্ঞেস করল, এই তুমি শুনছ?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই। তোমার কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগছে। যদি বলতে তোমার কোন বাধা না থাকে তাহলে সব কথা অসঙ্কোচে বলে যাও।

ভারী স্বরে মিকি আবার বলতে লাগল, ম'মার্টের খুশী, আলো আর নাচের বাজনা শুনে তোমার মতো কত বিদেশী অবাক হয়ে গেছে। তারা আরও অবাক হবে যদি আমার সঙ্গে, ওই যেখানে ক্যান ক্যান হচ্ছে, তারই পাশ দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে সেটা ধরে সামান্য এগিয়ে গিয়ে যে কোন ছোট বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়—

আমি বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি আছে সেখানে?

সেখানে আলো নেই, শুধু আছে অভাব আর অফুরন্ত প্রাণ। একটু চুপ করে থেকে মিকি বলল, অমনি বাড়ির এক ঘরে আঁদ্রে থাকত। আমি সেই ঘরে রোজ তার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। আমি ছিলাম বলে তুচ্ছ সাংসারিক অভাব তার কাছে বড় হয়ে ওঠেনি। কত রাত হাসিমুখে সে না খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। আজ আঁদ্রের কথা তোমাকে বলতে গিয়ে আমার আরও অনেক কথা মনে পড়ছে। কিন্তু আশ্চর্য, তখনও তো আমি দারিদ্র্যকে এতটুকু ভয় করি নি!

কেন ভয় করবে মিকি, আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, যৌবনের কাছে সব কিছু হার মানে।

জানি, কিন্তু মুহূর্তের ভুলে চিরকালের জন্যে আমার যৌবন শেষ হয়ে গেল, অকাল বার্ধক্য আচ্ছন্ন করল আমার সারা মন। এবার তোমাকে সেই কথা বলি।

শুধু আঁদ্রে নয়, ওই রাস্তায় যে বাড়িগুলি আছে তার ঘরে ঘরে অসংখ্য দরিদ্র শিল্পী থাকত তখন। তারা প্রত্যেকে জীবনের সব কিছু শিল্প সাধনার জন্যে তুচ্ছ করেছিল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অভাবের সঙ্গে নিদারুণ সংগ্রাম করেও মুহূর্তের জন্যে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে নি। আমার বন্ধু আঁদ্রেও ছিল তাদেরই একজন। তার ধরনধারন চালচলন জীবনযাত্রার রীতিনীতি আমার মনের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তার হাত ধরে সব ভাসিয়ে দিয়ে আমার শুধু পথে পথে ঘুরতে ইচ্ছে করত। ঘরে বসে থাকতে আমার ভাল লাগত না। প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা মজার ব্যাপার হত। যেদিন সকাল থেকে রাত্তির অবধি পেভমেন্টে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা ধরে গেলেও একটি ছবি বিক্রি হত না, সেদিন শূন্য পকেটে আমাদের বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে আসতে হত। কিন্তু সামনে দিয়ে নয়, আমরা ঢুকতাম পেছনের দরজা দিয়ে চোরের মতো—

তার কথা বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

মিকি হেসে বলল, পাছে বাড়িওলা টের পায়।

আমিও হাসলাম, এখানেও এ রকম হয় নাকি?

উপায় কি, আমার ঘাড়ে হাত রেখে মিকি বলল, আমরা যে বাড়ি ফিরেছি সেকথা যেন কেউ বুঝতে না পারে, তাই আলো জ্বালা হত না। অন্ধকারে বসে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতাম। আঁদ্রের সঙ্গ ঘরের সব অন্ধকার দূর করে আলোর বিপুল বন্যা বইয়ে দিত। বাইরে থেকে ডেকে ডেকে বাড়িওলা সাড়া পেত না। ঘরে কেউ নেই মনে করে বিরক্ত হয়ে ফিরে

যেত। লজ্জা পেয়ে আঁদ্রে আমাকে বলত, ছি ছি কী লজ্জার কথা বলত মিকি! বেচারী আমার কাছ থেকে কতদিন যে ভাড়া পায় নি! এবার ছবি বিক্রি হলেই কিছু না ভেবে সব টাকা আগে ওর হাতে তুলে দেব।

মিকি একটু চুপ করে থেকে বলল, কি দরকার দেবার? কি দরকার ঘরে থাকবার? চলো তোমার রঙ তুলি নিয়ে আমরা পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে বেড়াই।

এমন ক'রে পথে বেরিয়ে পড়বার কথা আমি তাকে প্রায়ই বলতাম। জানতাম ঘর তার জন্যে নয়। ঘরে বসে থাকলে চিরদিন এমনি অন্ধকারেই থাকতে হবে। কারণ সে ছিল ঘরছাড়া ছন্নছাড়া এক ভবঘুরে। দেয়ালঘেরা গণ্ডিতে সে কিছুতেই বাঁচতে পারবে না। আর সে কোনদিন ঘর গড়বার কল্পনাও করতে পারত না। যা পেত তখুনি খরচ করে ফেলত। এক হাজার ফ্রাঙ্ক পাবার আশা থাকলে ধর আমার জন্যে দু'হাজার ফ্রাঙ্ক ধার করে জিনিস কিনত। সঞ্চয় করবার কথা তার বোধহয় কখনও মনে হয় নি।

আমি জানি না আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে কিনা, মিকি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল, এই ধরনের পুরুষের জন্যে ফ্রান্সের মেয়েরা সব ছাড়তে পারে। না দিক ঘর, না থাক ঐশ্বর্য, এমন লোকের থাকে অফুরাণ প্রাণ, আর তারই জোরে মেয়েদের ঘর বাঁধবার চিরকালের স্বপ্ন চুরমার করে দিয়ে এরা তাদের করে তোলে মহাপথিক। তাই আমিও তাকে নিয়ে নীড় রচনার স্বপ্ন কখনও দেখি নি—আঁদ্রের চোখের তারায় আমি শুধু দেখেছিলাম সুদূর বিস্তৃত পথ। মিকির মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আমি বললাম, মিকি তুমি জানো না, তুমি কত সুন্দর করে কথা বলতে পার!

না না, আমি অমন করে কথা বলতে আজকাল ভুলে গেছি। তোমাকে পেয়ে আমার মনের মধ্যে সেই হারানো সুর আবার নতুন করে ফিরে ফিরে বেজে উঠছে, আর কে যেন আমাকে দিয়ে

এত কথা বলাচ্ছে। তুমি বিশ্বাস কর, আমি কিছু বলছি না। আমি পথের মূর্খ নগণ্য মেয়ে। আমি কেমন করে এসব কথা বলব।

ম'মার্টের লাল আকাশ যেন আরও লাল হয়ে উঠল। শীতের এলোমেলো বাতাস ওড়াল মিকির সোনালী চুল। আবার নতুন করে ক্যান ক্যানের বাজনা বেজে উঠেছে। কতো রাত হলো কে জানে।

নিজেকে ধনবান মনে হল আমার। আমি কি দিয়েছি মিকিকে? কিছুই না। তার প্রতিদিনের প্রাপ্য থেকে শুধু বঞ্চিত করেছি তাকে, কিন্তু নিঃসন্দেহে সে আমার কাছ থেকে এমন কিছু পেয়েছে, যা ভুলিয়ে দিয়েছে তার আর্থিক লাভ লোকসানের কথা। তার মনের অতল থেকে আমি তুলেছি বহু মূল্য মণিহার। আমি তাকে উজ্জ্বল করে তুলেছি লোকাতীত মহিমায়। জীবনের সব চেয়ে সেরা সম্পদে আমি বিত্তবান। গভীর সমবেদনায় যে অঙ্গার হীরকখণ্ড হয়ে ওঠে, সেখথা আমি আগে বুঝতে পারি নি কেন।

ধরা গলায় বললাম, তারপর কি হল বল মিকি?

তারপর! মিকি বেশ জোরে হাসল এবার, তারপর এক সন্ধ্যায় আমার ক্ষণিকের যৌবন ফুরিয়ে গেল, আমি বুড়ী হয়ে গেলাম। আঁদ্রেকে তখন খুঁজে পেলাম না।

বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

কয়েক মিনিট চুপ করে রইল। তারপর আবার খুব আস্তে আস্তে বলতে লাগল, এমনি এক শীতের রাত্তিরে আঁদ্রের ঘরে বসে আমি তার সঙ্গে গল্প করছিলাম। বাড়িওলার ভয়ে সেদিনও আলো জ্বালা হয় নি। কিন্তু সতর্ক হবার কথা আমাদের খেয়াল ছিল না, আমরা বেশ জোরে জোরে কথা বলছিলাম। আঁদ্রে এক সময় আমাকে বলল, মিকি চল আমরা দূরে কোথাও চলে যাই—

কোথায় যাবে?

যেখানে হয়, আঁদ্রে বলল, নিসে, পিরনিজে কিংবা ব্রিটেনিতে।

প্যারিস ছাড়বার কথা আমি ভাবতে পারি না, মিকি, কিন্তু এখানে থেকে তো কিছুই করতে পারছি না। তোমার কথা মতো পথে পথে ঘুরে দেখি কিছু করতে পারি কি না!

আমি হেসে বললাম, আমি তো তাই চাই গো। ঘর আমাদের কারোর জন্যেই নয়। আমার মনে হয়, উত্তর ফ্রান্সে কিংবা দক্ষিণ ফ্রান্সে ঘুরে বেড়ালে তোমার আনন্দ হবে আর পরিশ্রম সার্থক হবে। বল কবে যাবে?

চোখে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে আঁদ্রে খুশীতে প্রায় চীৎকার করে বলে উঠল, এক্ষুনি!

আর ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন খুব জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে আঁদ্রের নাম ধরে ডাকতে লাগল। সে উত্তর দিল না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে শুধু বলল, কি হবে মিকি।

চুপ, উত্তর দিও না।

আজ আর রক্ষে নেই, ফিসফিস করে আঁদ্রে বলল, অনেক দিন বাড়িওলাকে ফাঁকি দিয়েছি। আজ ও কিছুতেই ছাড়বে না। আমাদের গলার স্বর শুনতে পেয়েছে—

আঁদ্রের কথা শেষ হল না। পিছনের দরজা দিয়ে বাড়িওলা ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিয়েছে।

আঁদ্রেকে কঠিন স্বরে সে শুধু বলল, জোচ্চোর!

তারপর তাকে কোনো কথা বলবার অবসর না দিয়ে ঘরে তার যা কিছু জিনিসপত্র ছিল, টান মেরে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। রঙ তুলি ছবি—সব কিছু। অবশেষে কঠিন দৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, বেরোও! যদি কোনো কথা বল তা হলে আমি পুলিস ডাকব।

আমি ভেবেছিলাম আঁদ্রে বাধা দেবে, প্রতিবাদ করবে। কিন্তু আশ্চর্য সে একটি কথাও বলল না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছড়ান জিনিসপত্রের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি লক্ষ্য

করলাম, তার মুখ করুণ হয়ে উঠেছে, চোখে ফুটে উঠেছে অসহায় ভাব। আমার সমস্ত শরীর অদ্ভুত উত্তেজনায় কাঁপছিল। আমি কথা বলতে পারছিলাম না। এ আমি কখনও ভাবতে পারি নি। আঁদ্রের এমন দীন মূর্তি কল্পনা করা আমার অসাধ্য ছিল। এমন লোকের সঙ্গে আমি কোথায় যাব। এ কেমন করে রক্ষা করবে আমাকে। এর ওপর আমি কোন সাহসে নির্ভর করবার কথা ভাবব। আঁদ্রের করুণ মুখের দিকে তাকাতে আমার ভয় করছিল।

এক সময় সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, মিকি তুমি প্রস্তুত! আমি উত্তর দিলাম না—উত্তর দিতে পারলাম না বলতে পারো।

বুঝতে পারছিলাম কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার সব কল্পনা শূন্যে মিলিয়ে গেছে, যৌবন যেন আমাকে ছেড়ে চলে গেছে—আমি অত্যন্ত আত্মসচেতন হয়ে উঠেছি। আঁদ্রের হাত ধরে পথে পথে ঘুরে বেড়াবার সাহস আর আমার নেই।

তুমি ক্ষমা কর, আমি বোধহয় কিছুতেই তোমাকে বোঝাতে পারব না, মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমার অমন সাংঘাতিক পরিবর্তন হল কেমন করে। পাছে আঁদ্রে আমাকে আবার তার সঙ্গে যেতে অনুরোধ করে, তাই আমি ভীষণ ভয় পেয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেলাম।

তারপর যথাসম্ভব আমি ম'মার্টকে এড়িয়ে গেছি। ওদিকে আমি আর কখনও যাই নি—যতক্ষণ জ্ঞান থাকবে ততক্ষণ যাব না।

আঁদ্রের কথা ভেবে আজও থেকে থেকে আমার চোখে জল জমে ওঠে। তার সেদিনের ব্যথা দ্বিগুণ হয়ে আমার বুকে বেজে ওঠে—

মিকিকে বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর আঁদ্রের সঙ্গে তোমার আর দেখা হয় নি?

না, কখনো না। আমি জানি না সে কোথায় চলে গেল।

যদি প্যারিসে থাকতো, তাহলে হয় তো কোথাও না কোথাও দেখা হত।

অনেকক্ষণ মিকি কথা বলল না। আমি বুঝতে পারছিলাম তার বুকের ভেতর কান্নার তরঙ্গ ফুলে উঠছে। এখুনি সে হয়তো ভেঙে পড়বে ভারী কান্নায়। মানুষের এমন কোন জায়গা আছে, যেখানে আঘাত লাগলে মনের যত লুকানো ব্যথা বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়।

আমি বললাম, আর কিছু বলবে?

হ্যাঁ, এখনো আসল কথাই তোমায় বলা হয়নি যে, আমার কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে মিকি বলল, ঘর থেকে প্রায় গলা ধাক্কা দিয়ে আঁদ্রেকে যখন বাড়িওলা রাস্তায় বের করে দিল, তখন তার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল সে কথা আমি আজ বুঝতে পারি, সোজা হয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে সে আস্তে আস্তে বলল, তার নীরব দৃষ্টিতে যে আবেদন ফুটে উঠেছিল, আমার স্বার্থপর মন সেদিন তার মূল্য বুঝতে পারে নি। যে অসহায়, যে নির্ভর করতে চায়, যে মনে মনে চিরকিশোর, মেয়েদের সব কিছু তো তাদেরই জন্যে।

যদি আমি সেদিন আঁদ্রের সঙ্গে থাকতে পারতাম, পথের সঙ্গী হয়ে তাকে সাহস দিতাম, তাহলে আমি জানি শিল্প-জগতে চিরদিন তার নাম অক্ষয় হয়ে থাকত। দেশ থেকে, সমাজ থেকে, কর্মজগত থেকে সে এমন করে কিছুতেই উধাও হয়ে যেতে পারত না—

মিকিকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে আমি বললাম, নিজেকে অকারণে দোষ দিও না মিকি। আমার মনে হয় না তুমি খুব বড় অন্যায় করেছো। তোমার কথা শুনে আমি তোমার কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না। তুমি তো আঁদ্রেকে প্রবঞ্চনা কর নি, শুধু—

আমাকে বাধা দিয়ে মিকি বলল, না। কিন্তু আমি নিজেকে প্রবঞ্চনা করেছি। ঘর না থাকবার জ্বালা আজ মনে প্রাণে বুঝতে পারছি। বেচারী আঁদ্রে! তাকে অমন করে হারাবার পর নিজের

ওপর আমার কেমন যেন ঘৃণা হল। ঠিক করলাম ঘর বাঁধবার কল্পনা আর করব না। যে অর্থের প্রলোভন আমার মনের অবচেতনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, আমার সমস্ত দেহ দিয়ে আমি সেই অর্থেরই সাধনা করবো। কিন্তু কি হল? আমি কি করতে পারলাম?

যদি কোনদিন শেষ নিশ্বাস পড়বার আগেও আমার সঙ্গে আঁদ্রের দেখা হয়, তাহলে তাকে শুধু বলব, তোমাকে অসহায় অবস্থায় রাস্তায় ফেলে আমি পালাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নিজের কাছ থেকে আমি পালাতে পারি নি আঁদ্রে। সমাজ আমাকেও গলা ধাক্কা দিয়ে পথে ঠেলে দিয়েছে। আমার ঘর নেই, প্রিয়জন নেই, বিশ্রাম নেই। তোমার সঙ্গে সেদিন যদি যেতে পারতাম তাহলে আর কিছু না থাকলেও তোমার তুলি থাকত, রং থাকত,—আর তোমার রঙে আমার সমস্ত জীবন ভরে উঠত। কিন্তু আজ।

গভীর স্বরে আমি শুধু ডাকলাম, মিকি!

ডাক শুনে মিকির ঠোঁট কাঁপল বারবার, তুমি কোথাকার মানুষ জানি না। কিন্তু আমি প্রথম দিন থেকেই আমার হারানো প্রিয়তমকে তোমার মধ্যে দেখতে পেয়েছি। কী আশ্চর্য মিল তোমাদের দুজনের! ঠিক তোমার মত ছিল সে। কোন কিছু ভাবত না। তুমি যেমন অকারণে প্যারিসে থেকে গেলে, তুষার মাথায় করে আমাকে দেখবার জন্যে স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলে, সব ভুলে যৌবনের ডাকে সাড়া দিলে—সেও ছিল ঠিক তেমনি। কিন্তু কেন তুমি আমাকে দিয়ে এত কথা বলালে? এখন কি হবে আমার—

বাধা দেবার আগেই আমার কোলের ওপর পড়ে মিকি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি তাকে সান্ত্বনার একটি কথাও বলতে পারলাম না। আর মিকির সোনালী চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভাবলাম, তার সমস্ত মন জুড়ে বেদনার যে মেঘ জমে আছে, উপলব্ধির

আলোয় তা যদি সহসা পুঞ্জীভূত হয়ে কান্নার প্লাবন আনে—তাকে থামাবার সাধ্য আমার নেই।

ম'মার্টের মতো প্যারিসের আর এক প্রসিদ্ধ অঞ্চলের নাম মোপারনাস। এখানেও শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের বাস। পথে মিকি বলছিল তার মাসতুতো ভাই ড্যানিয়েল মোপারনাসে থাকে। তার সঙ্গে আলাপ হলেই আমার সাধ মিটে যাবে।

আলাপ করবার মতো মিকির আর কোনো আত্মীয় নেই প্যারিসে। ড্যানিয়েলকে সে আগেই ফোনে জানিয়েছিল তার এক ভারতীয় বন্ধুকে নিয়ে আজ সন্ধ্যায় মোপারনাসে আসছে। আমি ভারতীয় শুনে নাকি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল ড্যানিয়েল। মিকিকে বলেছিল কিছুতেই যেন ভুল না হয়, আজ সন্ধ্যায় সে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।

মেট্রোয় মোপারনাসে আসতে আসতে আমি মিকিকে জিজ্ঞেস করলাম, ড্যানিয়েল বিয়ে করেছে?

পাগল, মিকি হেসে বলল, ওকে কে বিয়ে করবে? থাকা, খাওয়া, কথা—ওর কিছুরই ঠিক নেই।

বা তাহলে দেখছি ড্যানিয়েল খাঁটি ফরাসী—

খুব জোরে হেসে মিকি বলল, ফরাসীদের ওপর তোমার তো খুব ভাল ধারণা দেখছি!

তোমাকে দেখে সে ধারণা আরও ভাল হয়ে গেছে।

আঃ, লজ্জা পেয়ে মিকি বলল, বারবার তুমি আমাকে অমন করে বল না। আমাকে দেখে এখানকার কিছু বিচার কর না। আমি কে? কেউ নই, কিছু নই—

আমি আর কথা বললাম না। কিছুক্ষণ পর মিকির সঙ্গে মোপারনাসে মেট্রোয় নেমে পড়লাম।

মেট্রো থেকে ড্যানিয়েলের বাড়ি খুব বেশি দূরে নয়। স্টেশনের বাইরে এসে আমরা হেঁটে পথ চলতে লাগলাম। আজ তেমন ঠাণ্ডা নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ড্যানিয়েল কি করে মিকি ?

ও আবার করবে কি ? মিকি হাসল, বলে তো খবরের কাগজের আপিসে কাজ করে। কি কাজ ঈশ্বর জানে।

আমি উৎসাহ প্রকাশ করে বললাম, খবরের কাগজের আপিসে চাকরি করে নাকি ড্যানিয়েল ? তাহলে তো ও সাংবাদিক ?

কে জানে! চলো না, ও এমন ভাবে থাকে যে, দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, পয়সা কড়ি কিছু পায়—

সাংবাদিকের অবস্থা সব দেশেই সমান।

মিকি বলল, ওর নাম সহ্য করতে পারে না পিসি। কোন দায়িত্বজ্ঞান নেই ড্যানিয়েলের।

আমি হেসে বললাম, তেমন লোকের ভরসায় তুমি তোমার অসুস্থ বাবা আর ভাই-বোনদের কোন সাহসে রেখে যেতে চাও ? কি করব বল ? আর কেউ যে নেই আমার। তবে কেন জানি না, আমাকে কোন কথা দিলে ড্যানিয়েল সব সময় তা রাখে!

তোমার কথা অনেকেই রাখে মিকি। তাদের সকলের খবর হয়তো তুমি রাখ না—

মিকি শুধু বলল, কি জানি। আমি তো কিছুই জানি না।

হাল্কা সুরে আমি বললাম, আমাকে রেখে যাও না তোমার বাড়িতে।

রসিকতা বুঝতে না পেরে আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মিকি বলল, কি যে বল। ভয়ংকর দারিদ্র্যের মধ্যে তোমাকে কেমন করে রেখে যাব আমি ? তুমি বিদেশী, তুমি বড়লোক, দেশে ফিরে প্যারিসের কথা মনে করে তোমার দুঃখের শেষ থাকবে না যে—

তবু প্যারিসকে মনে থাকবে। আনন্দের কথা মানুষ ভুলে যায়, কিন্তু দুঃখের কথা কেউ ভোলে না মিকি।

আমি কিছু বুঝি না, কিন্তু তোমার কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। তুমি যদি আমাদের ভাষা জানতে তাহলে আরও কত ভাল করে তোমাকে আমার সব কথা বলতে পারতাম।

ভাষা না জেনেও আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না মিকি। তুমি যেটুকু বলেছ, আমি তার চেয়ে অনেক বেশি বুঝে নিয়েছি। তুমি ভাবনা কর না।

আমি জানি। তাই তো তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার এত ভাল লাগে। আমি জানি না কেমন করে তুমি মানুষের মনের কথা স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পার।

আমি বললাম, মনে অনেক সময় অনেক কথা জমা হয়ে ওঠে, যেকথা কোন দিনও স্পষ্ট করে বলা যায় না। তেমন মানুষের দেখা পেলে কিছু না বলতেই সে সব কথা আপনি বুঝে নেয়।

মিকি সায় দিয়ে বলল, ঠিক। তোমার মতো করে কথা বলতে পারি না, কিন্তু তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারি। আর কয়েক পা এগিয়ে একটা বেশ বড়ো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে মিকি বলল, এই যে ড্যানিয়েলের বাড়ি!

বাঃ, বেশ চমৎকার বাড়ি তো! তোমার ভাই বুঝি খুব বড় লোক?

দূর, এখানে অনেক ভাড়াটে। সব চেয়ে বিশ্রী ঘরটায় ড্যানিয়েল থাকে।

দোতালায় ছোট একটা ঘর। বইএ ঠাসা। আমাদের দেখে যে সরল মানুষটি হাসিমুখে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলে বুঝে নিলাম সেই মিকির মাসতুতো ভাই ড্যানিয়েল। চেহারা দেখেই বোঝা যায় খাঁটি ফরাসী।

মিকি আলাপ করিয়ে দেবার পর আমাকে ড্যানিয়েল বলল, সহজে ছাড়ছি না তোমায়, অনেক প্রশ্ন আছে আমার, কোনো তাড়া নেই তো তোমার? আমি বাজার করে রেখেছি, একটু পরে রান্না আরম্ভ করব—

ধন্যবাদ, একটু বিচলিত হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি প্রশ্ন তোমার ড্যানিয়েল?

এই তোমাদের দেশের বিষয়। জান তো আমি খবরের কাগজের লোক?

আমি বললাম, জানি। তাই আমার ভয়।

ড্যানিয়েল বলল, ভয় কিসের? আমি ত ইংরেজ নই।

কথা ঘুরিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি তোমার প্রশ্ন বল?

আমার কথা শুনে মিকি বলে উঠল, সর্বনাশ। ড্যানিয়েলের সঙ্গে যা-তা বকো না। একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে ওর আর কিছু খেয়াল থাকে না। রাত ভোর হয়ে যাবে তাহলে—

তুই চুপ কর, বেশ গম্ভীর হবার চেষ্টা করে ড্যানিয়েল বলল, দেশবিদেশের রাজনীতি নিয়ে আমার কারবার। এসব ব্যাপার আলোচনা করলে কত রাত ভোর হয়ে যায়—

মিকি হেসে বলল, রাতই শুধু ভোর হয়। পয়সা আসে না একটাও—

শুনছ? আমার দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ড্যানিয়েল বলল, যুদ্ধের পর কি যে অধঃপতন হয়েছে ফ্রান্সের! ইংরেজ আর আমেরিকানদের মতো শুধু টাকা টাকা করে এখানকার ছেলেমেয়েরা!

তুমি তো তা কর না ড্যানিয়েল।

আমি সাংবাদিক—সব তুচ্ছ করে তবে আমার ধর্ম বজায় রাখতে হয়।

আমি হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, তুমি বিয়ে কর নি কেন?

সময় কোথায়। আর আমাকে কে বিয়ে করবে বল? দেখছ তো ঘরের অবস্থা?

আমি বললাম, কিন্তু এতো সুন্দর চেহারা তোমার—এমন অগাধ পাণ্ডিত্য—

আমার মুখে নিজের প্রশংসা শুনে খুশী হয়ে ড্যানিয়েল বিনয় প্রকাশ করে বলল, না না, পাণ্ডিত্য আর কোথায়?

যাকগে, প্যারিস কেমন লাগল বল?

খুব ভাল। সম্ভব হলে চিরকাল থেকে যেতাম!

যুদ্ধের আগে এলে আরও অনেক বেশি ভাল লাগত তোমার। এখন আর সে প্যারিস নেই। অভাবের তাড়নায় স্বার্থপরতা বেড়ে যাচ্ছে ফরাসীদের—

আমি বললাম, তবু অন্যান্য দেশের চেয়ে তোমরা অনেক কম স্বার্থপর, মিকির দিকে তাকিয়ে বললাম, দেনাপাওনার হিসাব তোমরা কড়ায় গণ্ডায় আজও করতে পার না বলে ঠকে মর।

অবাক হয়ে ড্যানিয়েল বলল, আমাদের সম্বন্ধে তুমি এত জান।

মিকি বলল, খুব বড় দার্শনিক যে, জান না?

তাই নাকি? ভারতবর্ষের লোক বড় দার্শনিক না হলে আর কোন দেশের লোক হবে বল?

তোমাদের দেশেও অনেক দার্শনিক আছে, ভুলে যেও না ড্যানিয়েল। তাই তোমাদের সঙ্গে আমাদের অনেক মিলও আছে, একটু ভেবে আমি বললাম, এতদিন লণ্ডনে বাস করলাম, কিন্তু এই অল্প কয়েকদিনে প্যারিসে যে আতিথেয়তার পরিচয় পেয়েছি সেখানে একদিনের জন্যেও তা পাই নি—

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ড্যানিয়েল বলল, এইবার তোমার খাবার ব্যবস্থা করি—

সেই ঘরেই মিকি আর ড্যানিয়েল স্টোভ ধরিয়ে মাংস আর

নানা রকম ফরাসী খাবার রান্না করতে লাগল। আর ওদের দুজনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলাম।

এই অল্প কয়েকদিন প্যারিসে থেকে সে-দেশ সম্বন্ধে কোন উক্তি করতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, আর মাত্র দুতিনটি লোক দেখে দেশসুদ্ধ লোককে বিচার করতে যাওয়া হয়তো সমীচীন নয়, কিন্তু একথা না বলে পারছি না যে, দেশের সব মানুষের সঙ্গে পরিচয় কারোর কোনদিন হয় না। কোনো দেশের কথা যখন আমাদের মনে পড়ে, তখন মাত্র কয়েকটি মানুষ চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়, আর সেই দেশকে আমরা বিচার করি তাদের দিয়েই। তাই বলতে বাধা নেই, প্যারিসের কথা ভাবলে আমার মনে হয় সেখানে লৌকিকতার চেয়ে আন্তরিকতা প্রবল। অপরিচয়ের বেড়া এরা নিমেষে ভেঙ্গে দেয়। ড্যানিয়েলের ব্যবহার দেখলে কে বলবে আমি এই প্রথম বার এখানে এসেছি।

খেতে খেতে তার সঙ্গে আরও অনেক গল্প হল। বুঝলাম সাংবাদিকের অবস্থা সব দেশেই সমান। অথচ আশ্চর্য, মিকির সম্পর্কে তার কোন দুঃখ নেই, কোন ভাবনা নেই। সে যে কারোর ওপর নির্ভর না করে চাকরি করে স্বাধীন ভাবে আছে তাতেই ড্যানিয়েল খুশী। উপায় কি। চাইলেই তো আর সব কিছু এক সঙ্গে পাওয়া যায় না। আদর্শবাদের মোহে শুকিয়ে না মরে মিকি যে উপার্জন করছে, সমাজকে শিক্ষা দেবার পক্ষে তাই তো যথেষ্ট। কেন এমন হল সে ভাবনা মিকির নয়, আর পাঁচজনের।

যার জন্যে তোমার কাছে এসেছিলাম, খেতে খেতে মিকি ড্যানিয়েলকে বলল, পরশু বাইরে যেতে হচ্ছে—

আমাকে ড্যানিয়েল জিজ্ঞাসা করল, তোমার সঙ্গে নাকি?

না, আমি পরশু দেশে ফিরে যাচ্ছি।

মিকি বলল, তোমাকে কিছুদিন, এই ধর প্রায় মাসখানেক, আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে।

বেশ বেশ, এক কথায় রাজী হয়ে ড্যানিয়েল বলল, আমারও একটা চেঞ্জ দরকার—

মিকি হেসে বলল, কাচ্চাবাচ্চাদের সঙ্গে থাকলে খুব ভাল চেঞ্জ হবে তোমার, তবে বাবা মাঝে মাঝে বিরক্ত করবে তোমায়।

কিছু না। কথায় কথায় বিরক্ত যারা হয়, তারা কোন কালেও সাংবাদিক হতে পারে না।

দেখো আবার ভুলে যেও না, পরশু খুব সকালে তোমাকে আমাদের বাড়ি গিয়ে উঠতে হবে।

ড্যানিয়েল হেসে বলল, ঠিক যাব, তারপর আমাকে বলল, ভারতবর্ষে যাবার ভয়ানক ইচ্ছে আমার। যদি কোনদিন যাই তাহলে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই। আর আমি যদি আবার প্যারিসে আসি তাহলে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

সেদিন সারা রাত আমি, মিকি আর ড্যানিয়েল প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম।

কিন্তু ড্যানিয়েলকে শেষ অবধি মিকির বাড়ি গিয়ে থাকতে হয় নি। মিকি যথাসময় আমাকে জানাল, পিসি চিঠি লিখেছেন যে তিনিই থাকবেন।

কথা শেষ করে মিকি বলেছিল, ফরাসীদের স্বভাবই এমনি।

সেই শেষবার।

তারপর মিকির সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। হয়তো এ জীবনে আর দেখা হবে না।

আমি পরদিন প্যারিস ছেড়ে এলাম।

সেই ছেড়ে আসার সময় থেকে আবার আরম্ভ করি।

আজ নতুন বছর। শীতের নতুন সূর্যের ম্লান আলোয় ভরে উঠেছে চারপাশ।

প্যারিসের সঁা লেজার রেলওয়ে স্টেশন। আর একটু পরেই ট্রেন ছাড়বে। তারপর ফ্রান্স থেকে বিদায়। হয়তো আর কোন দিনও এখানে আসবার সময় হবে না। তাই ট্রেনের কামরা থেকে মুখ বাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে কাকে যেন খুঁজছিলাম। প্যারিসের সকল কিছু ছাড়িয়ে আমার মনের আনাচে কানাচে শুধু মিকির ভাবনা ঘুরে ফিরছিল। ট্রেন থেকে বুকিং অফিস স্পষ্ট দেখা যায়। আমি দেখছিলাম একটির পর একটি লোক আসছে, টাকা দিচ্ছে তারপর টিকিট নিয়ে হন হন করে প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে এসে ট্রেনে উঠছে। যে লোকটি টাকা নিয়ে টিকিট দিচ্ছিল তারও চেহারা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

কিন্তু কি আশ্চর্য, কেন আমার চোখে এমন ঘোর লাগছে? সেই বুকিং ক্লার্কের মুখ দেখতে দেখতে কেন বার বার আমার মনে হচ্ছে এ যেন মিকিরই মুখ। অন্য পরিবেশে সে সেই একই চাকরি করছে।

চাকরি! ফিরে ফিরে কথাটা আমার মনে পড়ল। মিকি, আমি, ওই বুকিং ক্লার্ক, আপনি—আপনার বন্ধু বান্ধব, সকলেই তো সেই মিকির ছাঁচে ঢালা। আমি নিজের মধ্যে মিকিকে অনুভব করলাম।

এই অল্প কদিনে আমার সঙ্গে অনেক গল্প করেছে মিকি। আর এত অল্প আলাপে তার পক্ষে যা বলা একান্ত অস্বাভাবিক, সে আমাকে সেই প্রাণের কথা বলেছে। কিন্তু প্রেমের কথা নয়, সে তো রোজ সন্ধ্যায় টাকার জন্য কাউকে না কাউকে বলতে হয়। সেই তো হলো তার চাকরি। আমাকে সে তার দৈন্যের কথা বলেছে, পরম বিশ্বাস আর সহানুভূতিতে বলেছে তার দায়িত্ব আর সংসারের অভাবের ইতিহাস। তার কথায় আমি যেন সকল মানুষের যন্ত্রণার

কথা শুনেছিলাম। তার মধ্যে আমি যেন আমার মতো সকল মানুষকে দেখতে পেয়েছিলাম।

তাই আমি আজও তাকে ভুলতে পারি নি। কোন দিনও ভুলতে পারব না। ৩১শে ডিসেম্বর অর্থাৎ গতকাল সন্ধ্যায় মিকি আমাকে সঙ্গে নিয়ে নোতরড্যাম গির্জেয় গিয়েছিল। বোধহয় কোন উৎসব ছিল সেখানে। মোমবাতি জ্বালান হয়েছিল অনেক। নর-নারীর ভিড়ও ছিল। একটানা ঘণ্টা বেজে চলেছিল ঢং ঢং ঢং।

মিকি আমাকে নিয়ে ওপরে চলে এল। তারপর পিছনের দিকে ছোট বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সেইন নদীর জলে চির যৌবনা প্যারীর লক্ষ আলোক মালার ছায়া পড়েছে। অপূর্ব মনে হচ্ছে চারপাশ। আর কোন কোলাহল কানে আসে না, শুধু গির্জের ঘণ্টাধ্বনি কানে এসে লাগছে।

আমার আরও কাছে সরে এসে মিকি বলল, এই তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

ওকথা বল না মিকি, আবার নিশ্চয়ই কোনদিন না কোনদিন আমাদের দেখা হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিকি বলল, কেন তুমি আমাকে এত দিলে?

কি দিলাম তোমাকে? তুমি তো আমার কাছ থেকে কিছুই নাও নি—তোমার পাওনাও নয়।

পাওনার চেয়ে তুমি যে আমাকে অনেক বেশি দিলে। তাই আজ হঠাৎ আমার সমস্ত কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না মনে করে ছোট মেয়ের মতো আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে—

আমি কথা বলতে পারলাম না।

মিকি বলল, আমি যাদের দেখি, শুধু সঙ্গ পেয়ে তারা খুশী হয়

না। তারা পাওনা আদায় করে নেয় কড়ায় গণ্ডায়। তুমি যেন একমাত্র ব্যতিক্রম।

আমি বললাম, তুমি যে এমন করে আমাকে এত কথা শোনালে, তোমার যে অভিজ্ঞতা তারও একটা মূল্য আছে, তার দাম দেয় কে?

আমার কথার আবার দাম!

নিজেকে ছোট ভেব না মিকি, একটু থেমে আবার বললাম, তুমি টাকা দিয়ে সব কিছুর বিচার করছ কেন? জীবনে অনেক সময় অনেক কিছু এসে পড়ে, যার দাম দেয়া যায় না।

জানি। এতদিন পর সে কথা বুঝতে পারলাম। কারণ তোমার সঙ্গে মিশে আমি উপলব্ধি করলাম তোমাকে আমার দাম দিতে হবে। তুমি আমার কাছে অনেক কিছু পাবে। কিন্তু এই ভেবে দুঃখ হচ্ছে যে, তোমাকে দেবার আমার আর কিছু নেই। আমার হাত পা বাঁধা—আমার বাবা ভাই বোন—

আমাকে তুমি দাম দেবে কেন মিকি?

তুমি আমাকে যা দিলে সে-ঋণ শোধ করতে হলে আমাকে যা দিতে হয়, তা দেবার আমার উপায় নেই। আর তোমার গ্রহণ করবারও সময় নেই।

আরও সহজ করে বল মিকি, তোমার ভাষা আমি বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছি না।

তুমি আমাকে দিয়েছ সমবেদনা। তোমার সঙ্গে এমনি করে রোজ যদি আমি গল্প করতে পারতাম তাহলে পৃথিবীর আর কিছুই আমি চাইতাম না। কিন্তু কেমন করে তা পারব বল?

আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিকি বলল, অসংখ্য বাঁধা চারিদিকে, তা ছাড়িয়ে বার হবার আমার উপায় নেই। বাস্তবের কঠিন বন্ধনে আমার সমস্ত দেহমন বাঁধা পড়ে আছে। আমাকে চাকরি করতে হবেই। উপার্জনের কথা ভুলে তোমার সঙ্গে গল্প করা অসম্ভব।

আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে বললাম, তুমি আমাকে নতুন কথা শোনালে মিকি। তুমিও আমাকে নতুন করে জীবনকে দেখতে শেখালে—

এত কথা তুমিই যে আমাকে বলতে শেখালে গো! এমন করে কোনদিন কারোর সঙ্গে আমি কথা বলি নি। আমি শুধু চাকরি করে গেছি।

হাল্কা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, চাকরি করতে তোমার ভাল লাগে না মিকি?

খুব ভাল লাগে। আর এখন এ ছাড়া অন্য কোন চাকরি বোধহয় আমি করতে পারবো না—

আমি উক্তি করলাম, সব চাকরি সমান।

জানি না। আমি কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও অন্য কোন কাজ পাই নি। ছেলেবেলা থেকে নাচে ঝোঁক ছিল। এখন এভাবে তা কাজে লাগল। আর এ কাজ ছাড়া অন্য কিছু করবার মতো বিদ্যে বুদ্ধিও আমার নেই।

আমার আর কিছু বলবার নেই মিকিকে। ও বলে যাক যা খুশী। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম আজ ওর মনের মধ্যে তরঙ্গ ফেনিয়ে উঠেছে—বিপুল তোড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে ব্যথার বিক্ষুব্ধ ঝরনা। আসুক। আমি বাধা দেব না। আমি শুধু শুনে যাব। এমন করে কথা বলবার অবসর আর হয়তো জীবনে ওর হবে না! এমন মুহূর্ত বার বার আসে না।

মিকি বলে চলল, প্রথম প্রথম এ চাকরি করলে আমার খুব খারাপ লাগত। লোকে নিন্দে করত, যা-তা ভাবত। কিন্তু আমি শুধু আমার বাবা ভাই বোন—তাদের বাঁচিয়ে রাখবার কথা ভেবেছিলাম—

থেমো না মিকি, তোমার যা খুশী বলে যাও।

আমি লেখাপড়া জানি না, অথচ অবিলম্বে অর্থের প্রয়োজন হল। তাই এ কাজ নিতে বাধ্য হলাম।

আর তোমার জন্যে একটা সংসার রক্ষা পেল।

হ্যাঁ, আমার কথায় সায় দিয়ে মিকি বলল, এর চেয়ে বেশি টাকার চাকরি পৃথিবীর কোথাও অন্য কেউ আমাকে দিতে পারত না; তা ছাড়া এ চাকরিতে খুব ভাল উপরি আয়ের ব্যবস্থা থাকে, জান তো?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, জানি।

মিকি হঠাৎ শক্ত করে আমার দুই হাত চেপে ধরে বলল, তুমি বিশ্বাস কর, এখনও কাউকে ঠকাই না, ঠিক যতটুকু পাওনা ততটুকু নিই—এক পয়সাও বেশি আদায় করবার চেষ্টা করি না—

আমি জানি মিকি। আমার হোটেলে সে-সকালে তোমার বলা কথাগুলি আমি এত শিগগির ভুলে যাই নি—

অথচ মনে মনে তাদের ওপর আমার কোন আকর্ষণ নেই!

তাও আমি জানি।

তোমরা যেমন আপিস কর, সমস্ত ভুলে চাকরিতে উন্নতি করবার চেষ্টা কর, আমিও ঠিক তাই করি। আমার মন একেবারে মরে গেছে—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, না। মানুষের মন কখনও মরে যায় না। এ তোমার ভুল কথা।

কি ভেবে মিকি বলল, আজ যদি আঁদ্রে ফিরে আসে তাহলে বোধ হয় আমি তাকে আবার সেদিনের মতো ফিরিয়ে দেব!

হয়ত—দেবে না, ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে। তার জন্যে তোমাকে কেউ দোষ দেবে না।

কেন? আমাকে সে কথা বুঝিয়ে দাও।

আমি বললাম, বুঝিয়ে দেবার দরকার নেই। তোমার কথা শুনে আমার বার বার মনে হয়েছে তুমি নিজেই সব ভাল করে বুঝে

নিয়েছ, দু এক মিনিট চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কেন তুমি এতদিন সঙ্গ দিলে? কেন আমাকে দাম দেবার জন্যে ব্যস্ত হলে?

অনেকক্ষণ ভেবে শূন্য দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, জানি না।

আমি বললাম, আমি যখন থাকব না তখন যদি তোমার আমার কথা মনে পড়ে তাহলে আবার চেষ্টা করে দেখ, উত্তর খুঁজে পাবে। সেদিন সহজেই বুঝতে পারবে তোমার মন মরে যায় নি—দরদী মন নিয়ে তুমি ঠিক আগের মতোই বেঁচে আছো।

কিন্তু কি লাভ আমার বেঁচে থেকে? এমন করে আর আমি বাঁচতে চাই না।

লক্ষ লোক ঠিক তোমার মতো করে বেঁচে আছে মিকি। এর চেয়ে ভাল ভাবে হয়তো আজকের সমাজে বেঁচে থাকা যায় না।

আমি কিছু বুঝি না। আমি কিছু জানি না। এ যন্ত্রণা থেকে আমি শুধু মুক্তি চাই।

সকলেই চাই। আজ তুমি আমি যেমন হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলাম—যেদিন আমাদের মতো সব মানুষ এমনি করে নিজেদের শূন্যতা উপলব্ধি করবে, সেদিন তারা জোর করে মুক্তি নিয়ে আসবে।

কবে—কবে আসবে সেদিন?

কবে জানি না। কিন্তু সেদিন আসবেই। অবিচল নিষ্ঠায় আর অকম্পিত বিশ্বাসে আমাদের আজ থেকে শুধু সেদিনের প্রতীক্ষা করতে হবে।

আর কোন শব্দ নেই। শীতের এলোমেলো হাওয়ায় অসংখ্য মোমবাতির শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর নিরন্তর নোতরড্যাম গির্জের সেই ঘণ্টা বেজে চলেছে। হাওয়ায় সহসা আমি যেন ক্লান্ত হাঞ্চ ব্যাকের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম।

মিকিকে যেদিন প্রথম দেখি সেদিন কল্পনা করতে পারি নি

তাকে আমি এসব কথা এমন করে শোনাব। আমি নিজেই জানতাম না যে, আমি জানি—এমন করে সব কিছু বিচার করবার ক্ষমতা আমার আছে। মিকিকে আর পাঁচজন যেমন করে চায়, আমিও ঠিক তেমনি করেই চেয়েছিলাম। অন্য লোক যেমন করে তার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, আমিও ঠিক তেমনি করেই তাকিয়েছিলাম। শুধু আমার মনে ভয় ছিল, দ্বিধা ছিল, দৈন্য ছিল বলে আমি আর পাঁচজনের মতো ব্যবহার তার সঙ্গে করতে পারি নি—আমি পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম।

কিন্তু সেই পশ্চাৎ অপসরণ আমার অজ্ঞাতে সার্থক হয়ে উঠেছে। সেদিন আমি পিছিয়ে এসেছিলাম বলে আজ বোধ হয় সমস্ত উজাড় করে দেবার জন্যে মিকি এমন করে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পাওয়া যে এত সহজ, সে কথা আমি দেশে থাকতে কোনদিন জানতে পারি নি। কিন্তু আজ এই বিলাস নগরীতে দাঁড়িয়ে বাস্তবের প্রখর আলোয় আমি নিজেকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমি বুঝতে পেরেছি, প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে এমন এক মন্ত্র লুকোন আছে যা উচ্চারণ করতে পারলে দুর্লভ বস্তুও পেতে বিলম্ব হয় না। কেন, সেকথা আমরা বুঝতে পারি না। কেন কারণে-অকারণে ক্ষণে ক্ষণে স্বার্থপর হয়ে উঠে কাঙালের মতো বৃথাই দ্বারে দ্বারে ঘুরে ফিরি? কেন হিংস্র হয়ে উঠে লুব্ধ হাত বাড়াই? তাই পরিশেষে পাই না কিছুই, স্বার্থপর মন নিয়ে শুধু পাওনা আদায়ের চেষ্টায় ঘুরে ফিরি। বুঝতে পারি না আমার যে পাওনা তার চেয়ে অনেক বেশি পাবার মন্ত্র মনের নিভৃতে লুকিয়ে আছে।

অনেকক্ষণ পর মিকি আবার কথা বলল, তোমাকে কাল আর দেখতে পাব না মনে করে আমার খুব খারাপ লাগছে—

তুমিও তো কাল চলে যাবে?

হ্যাঁ, খুব সকালে সেই অ্যামেরিকান ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

আবার কবে ফিরবে প্যারিসে ?

জানি না, ম্লান হেসে মিকি বলল, যতো বেশিদিন তার সঙ্গে বাইরে থাকতে পারি ততই তো আমার লাভ।

আমি বললাম, পিসি থাকছেন তোমাদের বাড়িতে ?

হ্যাঁ, আমি বেরোবার আগে দেখে এলাম তিনি এসে গেছেন।

আমিও ম্লান হাসলাম, যদি আবার প্যারিসে আসি তাহলে আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে দেখা করব মিকি—

তুমি যেও না, স্তিমিত গলায় মিকি বলল, আমি ফিরে এসে আমার সব টাকা তোমায় দিয়ে দেব, তুমি আর কিছুদিন প্যারিসে থেকে যাও—

মিকির মাথায় হাত বুলিয়ে মৃদুস্বরে আমি বললাম, তা হয় না মিকি, একটু থেমে বললাম, আমাকেও যে চাকরি করতে হয়! যথাসময়ে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত না হতে পারলে খাব কি ? কাল আমাকে যেতেই হবে।

কিন্তু ফিরে এসে আমি কার সঙ্গে এমনি করে মনের কথা বলব ?

দুঃখ কর না মিকি।

কি যন্ত্রণা তুমি আমায় দিয়ে গেলে। এখন আমি কি করব। এত ক্লান্তি আগে আমার কখনও আসে নি—না না আমি কাল কিছুতেই কারোর সঙ্গে কোথাও যেতে পারব না—

মিকি!

তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে চল ?

কোথায় যাবে।

তোমার সঙ্গে যেখানে হয় পালিয়ে যাব—এই যন্ত্রণা থেকে, এই দায়িত্ব থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও—কেন, কেন তুমি আমাকে এসব কথা শোনালে—

মিকি, আমি তাকে কাছে টেনে বললাম, আজও পরিপূর্ণ মন নিয়ে তুমি বেঁচে আছো। কে বলে তোমার মন মরে গেছে ?

ওসব কথা তুমি আর আমাকে শুনিও না। আমাকে যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাও—আমার সব কিছু তোমাকে দিয়ে দেব আমি—

কোথায় নিয়ে যাব তোমাকে ? সর্বত্র এক অবস্থা মিকি ! আমারও মাঝে মাঝে ঠিক তোমার মত সব ছেড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কোথায় পালাব ? পালিয়ে গিয়ে মুক্তি পাওয়া যায় না—

একটা কথা রাখবে আমার ?

কি কথা বল ?

আগে বল রাখবে ?

কিছু বুঝতে না পেরে তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে আমি বললাম, রাখব।

মিকি বলল, আমাকে আজ তোমার হোটেলে নিয়ে চল। আপত্তি কর না। শুধু একটি রাত তুমি আমাকে দিয়ে যাও।

নিশ্চয়ই দেব মিকি। তুমি এমন ভয়ে ভয়ে কথা বলছ কেন ?

কি জানি, যদি রাজী না হও।

আমি হেসে বললাম, না মিকি, প্রথম বারের মতো আজ আমার কোন দ্বিধা নেই। আজ আমরা পরস্পরকে ভাল করে চিনি—

সত্যি তুমি আমাকে তোমার হোটেলে নিয়ে যাবে ?

যাব, কি ভেবে বললাম, কাল দুজনকেই দুদিকে চাকরি করতে যেতে হবে। চল আজ আমরা প্রাণ ভরে ছুটি ভোগ করি।

আমার কথা শুনে মিকি খুশী হয়ে বলল, ঠিক বলেছ, আজ আমাদের ছুটি। তোমার সঙ্গে অনেক দিন আমি ছুটি ভোগ করলাম —এত অবসর আমি আর কখনও পাই নি।

আমি বললাম, মাঝে মাঝে ছুটি না পেলে চলে না মিকি, কাজের চাপে দম বন্ধ হয়ে যায় তাহলে।

চল এবার এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি, বড় শীত লাগছে আমার ?

আমার কিন্তু একটুও শীত লাগছে না মিকি, হেসে বললাম, বরং বেশ গরম লাগছে।

এতক্ষণ পর মিকির মুখে হাসি ফুটে উঠল, তুমি কে আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। হয় তুমি কোন দেবতা, নয় যাদুকর।

আমি বললাম, দুই-ই। চল।

আমার হাত ধরে খুব সাবধানে প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে মিকি বলল, আমার আরও একটা কথা তোমাকে রাখতে হবে?

রাখব। নির্ভয়ে বল।

বাইরে খাওয়া হবে না আজ।

তাহলে? না খেয়ে থাকবে নাকি?

আমার আপত্তি নেই। কতদিন না খেয়ে থেকেছি, কে তার হিসেব রাখে। আর আজ তুমি সঙ্গে আছ, তোমার সঙ্গে গল্প করতে পেলে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা মরে যায়।

আমার কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বললেই ক্ষিধে পায়।

মিকি জোরে হাসল, ভয় নেই। না খাইয়ে রাখব না তোমায়। তোমার ঘরে গিয়ে আজ রান্না করব।

হঠাৎ তোমার কেন এ খেয়াল হল?

জানি না। দেখি না এক রাত্রের জন্যে সত্যিকার গৃহস্থ বধূ সাজতে পারি কিনা!

তা না হয় সাজলে, আমি মিকির হাত টিপে বললাম, কিন্তু আমার ঘরে রান্না করবার ব্যবস্থা নেই।

তোমার হোটেল থেকে স্টোভ জোগাড় করে নিতে আমার দেরি হবে না। রান্নার সব ব্যবস্থা আমি করব, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

নোতরড্যামে তখন আর কোন লোক নেই। বাইরেও কেউ নেই। কিন্তু তখনও সেই একটানা ঘণ্টা বেজে চলেছে—ঢং ঢং ঢং।

বোধ হয় আমাকে নিয়ে হোটেলে ফিরে আসবার জন্যে মিকি খুব তাড়াতাড়ি বাজার সেরে নিল। আমি যতবার দাম দিতে গেছি ততবার ও বাধা দিয়েছে। বলেছে, না, আর কোন দাম তোমাকে দিতে হবে না। এবার সব আমার দেবার পালা। খরচ করবার সময় তুমি আমাকে বাধা দিও না। তুমি আমার কাছ থেকে কখনও কিছু চাও নি। তাই তোমাকে আমার সব কিছু উজাড় করে দেবার জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে উঠেছি, সে কথা বুঝতে পার না কেন ?

আমরা দুজন যখন হোটেল লুক্সায় এলাম, তখন রাত বেশি হয় নি। সবে আটটা বেজেছে। আজ মিকিকে নিয়ে হোটেলে ঢুকতে আমার একটুও লজ্জা করল না! কেউ দেখে ফেলবে এই ভয়ে সামান্য অস্বস্তিও হল না। ভাবলাম পৃথিবীতে যত চোখ আছে তার দৃষ্টি পড়ুক আমাদের দিকে।

অসঙ্কোচে নিচে গিয়ে মিকি ঠিক স্টোভ গ্লাস প্লেট কাঁটা চামচ যাবতীয় সরঞ্জাম খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিয়ে এল। আমাকে অনুরোধ করল, প্লেট ধুয়ে টেবিলের ওপর খবরের কাগজ পেতে ওগুলো সাজিয়ে রাখতে।

নিঃশব্দে আদেশ পালন করে আমি চুপ করে চেয়ারে বসে মিকির রান্না দেখছিলাম। তার চোখে মুখে কাজ করবার আগ্রহ ফুটে উঠেছে।

রান্না করতে বেশি দেরি লাগল না। খাওয়া শেষ হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। আবার আমরা দুজনে মিলে থালা বাসন ধুয়ে ফেললাম। মিকি নিচে চলে গেল সেগুলি ফিরিয়ে দিয়ে আসতে।

তারপর ফিরে এসে মিকি হেসে বলল, আজও কি তুমি চেয়ারে বসে ঘুমবে নাকি ?

আজ বোধ হয় আমার ঘুম আসবে না মিকি।

আমারও ঘুম পায় নি, জুতো খুলে ফেল, এস এই খাটে বসে

গল্প করা যাক। যদি ঘুম পায় তাহলে ঘুমিয়ে পড়ো। ভুল না, কাল খুব সকালে দুজনকে বেরিয়ে পড়তে হবে। চলে এস। আলোটা নিবিয়ে দাও। বড় চোখে লাগছে আমার।

বোধ হয় ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মিকির ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল। চমকে চোখ চেয়ে দেখলাম বিরক্ত হয়ে ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

লাফিয়ে খাট থেকে নেমে ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, একি ভোর হয়ে গেছে ?

হ্যাঁ, নীরস স্বরে মিকি বলল, কি যে ঘুম তোমার! কাল বললে ঘুম পায় নি, সেই ভরসায় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কোন্ ভোরে আমার ক্লাবের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে পৌঁছবার কথা ছিল! অ্যামেরিকান ভদ্রলোক বসে থাকবে।

তাই তো, আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, কি করবে এখন ?

মিকি বলল, যা খুশী কর তুমি! আমি বেরিয়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেব।

আমি যাব তোমার সঙ্গে ?

কোন দরকার নেই, তুমি তোমার রাস্তায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হও। সময় হয়ে গেছে। আমি চললাম, মিকি ঘরের দরজা খুলল। যা পাড়া তোমার, এখন ট্যাক্সি পেলে হয়—

একটু দাঁড়াও মিকি, আমি কোটের পকেটে হাত চালিয়ে হাজার ফ্রাঙ্কের পাঁচটা নোট তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, এটা নাও!

আমার হাত থেকে নোটগুলি নিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে কি যেন ভাবল মিকি। না, সেগুলি আর আমাকে ফিরিয়ে দিল না। ব্যাগে ভরে বলল, অ রেভোয়া!

তারপর বাইরে বেরিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে নিচে নেমে গেল। আমি তার ব্যস্ত পায়ের খট খট শব্দ শুনতে পেলাম শুধু। কিছুক্ষণ সেখানে ঠিক একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সাঁ লেজার স্টেশন থেকে একটু পরে ট্রেন ছেড়ে দেবে। সেই বুকিং ক্লার্কের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি মিকির বলা কথাগুলি নানাভাবে ভাববার চেষ্টা করছিলাম।

চাকরি মিকিকে করতে হবে—চাকরি সকলকে করতে হবে। আজকের সমাজে গতির সঙ্গে যে তাল রাখতে পারবে না তাকে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।

তবু মাঝে মাঝে ক্ষণিকের অবসরে মনে হয় বেঁচে আছি—বেঁচে থাকব। সব ক্লান্তির বোঝা যেন মুহূর্তে নেমে যায়। আমার আবার মনে হল, সেই বুকিং ক্লার্কের চেহারা যেন ঠিক মিকির মতো। একটির পর একটি লোক টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটে আসছে। ঘচাং ঘচাং টিকিট কাটার শব্দ হচ্ছে। যে টাকা দিচ্ছে তার দিকে ও নিঃশব্দে টিকিট বাড়াচ্ছে। আর কোন কথা নয়, আর কিছু নয়, শুধু টাকা আর টিকিট!

কেউ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে না, ও কারোর দিকে চাইছে না। ও তাকালে কেউ দেখছে না, ওকে দেখলে ও খেয়াল করছে না, ও চাকরি করে যাচ্ছে। আর কিছু করবার সময় নেই, উপায় ত নেই। শুকনো পৃথিবীতে শুধু অর্থের ঝঙ্কার শোনবার জন্যে দুই কান খাড়া হয়ে আছে।

আমারও যেন দুই কান খাড়া। আমাকেও চাকরি করতে হয়। চাকরির ওপর আর কেউ নেই—আর কিছু নেই। আমার কানে অন্য আওয়াজ আসবে না, আমার প্রাণে অন্য সুর বাজবে না।

তবু আজ প্যারিস ছেড়ে যাবার বেলায় শুধু মিকিরই সুর বাজছিল। ব্যবসায়ী পৃথিবীতে কে যেন নিরন্তর বিচ্ছেদের যবনিকা টানে। মৃত্যুর মতো কঠোর—পাষাণের মতো নির্মম তার নিত্য কর্মভার।

কিন্তু কেন তার কাছে আমার নিশ্চিত পরাজয়! সমস্ত শক্তি

দিয়ে তাকে বাধা দিতে যাই। হার মানব না—কিছুতেই না। হাহাকারের এই কঠিন আবরণ ছিন্নভিন্ন হোক! বঞ্চনার পুঞ্জীভূত মেঘ বিপ্লবের বজ্র হানুক বঞ্চিতের মিলিত উদ্যমে। অগণিত অন্ধ মূঢ়জনের একতায় মূক দিগন্ত চমকে উঠুক বিক্ষোভের গর্জনে।

নতুন সমাজ সৃষ্টি হোক!

আর শুধু তখনই যেন নিজেকে খুঁজে পাই।

সবই যেন ভুলে গিয়েছিলাম।

হাল্কা রোদ্দুরে ঝলমল করা আইফেল টাওয়ারের চূড়া, নোতরড্যাম গির্জের বড় বড় থাম, আর্চ দ্যু ট্রায়াম্প, সেইনের জলকল্লোল, মোনালিসার হাসি—প্যারিস ছেড়ে আসবার ঠিক আগের মুহূর্তে তেমন করে আমার কিছু মনে পড়ে নি।

কিন্তু শুধু তাকে ভুলতে পারি নি।